

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা--১
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবুল বারক আলভী

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা---১
বাংলাদেশ।

বঙ্গ–বিবেক

অধ্যাপক আবুল ফজল

বন্ধুবরেষু—

ভবদীয়

অকিঞ্চন

মুহম্মদ এনামুল হক

ভূমিকা

বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়া "মনীষা-মঞ্জুষা," দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশিত হইল। ইহা আমার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ভাষাসম্পৃক্ত প্রবন্ধের সমাহার। বাংলাভাষাকে আমি ভালবাসি; কেননা ইহা আমার মাতৃভাষা। আমার দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অধিকাংশ সময় আমি এই ভাষার চর্চা ও আলাপ-আলোচনায় কাটাইয়াছি। এখনও ভাষা-চর্চায়, বিশেষ করিয়া বাংলা-ভাষার চর্চা ও অনুশীলনে আমার আগ্রহ ও উৎসাহ কমে নাই। 'মনীষা-মঞ্জুষা'-র এই খণ্ডে তাহার প্রমাণ মিলিবে।

ইহাতে কাহারও কোন উপকার হয় কিনা, বলিতে পারি না। বর্তমানে দেশের সর্বত্র বাংলা-ভাষার প্রতি যেরূপ ঔদাসীন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহার কোন প্রতিকার বিধান আমার দ্বারা সম্ভবপর না হইলেও, আমি এই ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশাবাদী (passimist) নহি। ইহাতে তাহারও প্রমাণ-পাওয়া যাইবে। 'মনীষা-মঞ্জুষা'-র এই খণ্ড প্রকাশে ইহাই আমার মৌলিক সন্তুষ্টি।

ইহাতে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলির সঞ্চয়ন, সঙ্কলন ও মুদ্রণের কাজে আমার কন্যা মুসম্মাৎ উম্মু মুসলিমা, এম. এ., বি. এড্. আমাকে অকাতরে সাহায্য না করিলে, গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশও আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। দোয়া করি, আল্লাহ্ ত'আলা তাঁহার মঙ্গল করুন।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশে ঢাকার 'মুক্তধারা' নামক প্রকাশন-সংস্থা (৭৪, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা—১) যে-বহু স্বীকার ও আর্থিক ঝুঁকি মাথায় লইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া খাটো করিতে চাহি না। তবে, জ্ঞানগর্ভ বাংলা পুস্তক প্রকাশের যে মহান-ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সংস্থা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া আমি আমার নিজের এবং আমার দেশের পক্ষ হইতে সংস্থাটিকে গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সংস্থাটির নাম অক্ষয় হইয়া থাকুক,—ইহাই কামনা করি। ইতি

"সেঁজুতি"
৮৯, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম

মুহম্মদ এনামুল হক
(গ্রন্থকার)

সূচীপত্র

বাঙ্‌লা-ভাষার ক্রমবিকাশ

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইনের (১৮০৯—১৮৭০) 'বিবর্তন-বাদ' (Theory of Evolution) একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। ভাষার ক্রমবিকাশের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করলে সহজেই বুঝ্‌তে পাবা যায়, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি যে শুধু জীব-জগতের প্রতি প্রযোজ্য তা নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও এই সত্য সমভাবে প্রয়োজ্য, অর্থাৎ ভাষাও বিবর্তিত হয়। এই বিবর্তনের ফলে প্রাণিজগতের মতো ভাষা-জগতেও 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the fittest) নামক নীতি সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত। পারিপার্শ্বিকতার সাথে যুদ্ধ ক'রে কোন-কোন দুর্বল ভাষা, যেমন সুমেরীয়, ইলামীয়, মিতন্নীয়, ক্রিটীয়, এক্রস্কান, হিট্টাইট, তোখারীয়, মহেঞ্জোদরো প্রভৃতি লুপ্ত হ'য়ে গেছে, আর কোন-কোন যোগ্যতম ভাষা, যেমন সেমীয়, হেমীয়, বাণ্টু-আলতাই, তিব্বতী-চৈনিক, অস্ট্রিক, দ্রবিড়, ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভৃতি গোষ্ঠিভুক্ত ভাষাসমূহ আজও সগর্বে বেঁচে আছে। পৃথিবীর এ-ভাষাগুলোকে প্রায়ই 'জীবিত-ভাষা'ও বলা হয়।

ভাষার আবার 'গোষ্ঠী' বা 'বংশ' কি? কথাটা যেন কেমন-কেমন শোনায়। কেননা, ভাষার 'মেলে' শব্দটি নতুন। এখানে মনে ক'রে দেখা আবশ্যক, খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পৃথিবীর জীবিত ভাষাগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি পৃথক্ ভাষা হিসাবে গণ্য না ক'রে এগুলোর সবগুলো না হোক, অন্তত তার কতকগুলোকে এমন একটি মাত্র ভাষা থেকে উদ্ভূত ব'লে মনে করা হ'ল, যে-ভাষাটির কোন অস্তিত্ব এখন আর পৃথিবীতে নেই। যাঁর মনে সর্বপ্রথম এ-ধারণা দানা বাঁধে, তাঁর নাম স্যার উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬—১৭৯৪)। তিনি আগে থেকেই 'গ্রীক', 'লাতিন', 'ফার্‌সী' ও আরবী' ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। 'ইংরেজী' ভাষা ছিল তাঁর মাতৃভাষা। চাকরি উপলক্ষে কোলকাতা এসে তিনি 'সংস্কৃত' ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করলেন। অল্প দিনের মধ্যে এ-ভাষায় তিনি এতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন যে, তাঁর মনে হ'ল, "সংস্কৃত

একটি বিস্ময়কর ভাষা। এ-ভাষা গ্রীক ভাষা থেকেও পূর্ণতর, লাতিন ভাষা থেকেও অধিক সম্পৎশালী, এ দু'ভাষার চাইতেও বিস্ময়করভাবে পরিমার্জিত; অথচ তাদের সাথে এক নিবিড় সগোত্রতায় আবদ্ধ।"* এখানে তাঁর ধারণা শেষ হ'ল না,—বরং আরও একটু এগিয়ে গেল। তিনি ভাবলেন, গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃত—এ তিন ভাষা যখন ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দ-সম্ভার ও ব্যাকরণে অনেকখানি একরূপ, তখন এ-ভাষাগুলো নিশ্চয় এমন একটা মূলভাষা থেকে উৎপন্ন, যা প্রাগৈতিহাসিক যুগে অবলুপ্ত অতিকায় তৃণভোজী জীব ডাইনোসেরাস্ (Dinoceras)-এর মত এখন ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পেয়েছে। তিনি আরও আঁচ করলেন, 'জর্মন', 'গথিক', 'কেল্টিক', এবং 'আবেস্তিক' বা প্রাচীন পারসিক ভাষাও ঐ অবলুপ্ত মূল-ভাষা থেকে উৎপন্ন হ'য়ে থাকবে; নইলে কক্‌খনো এইভাষাগুলোর সাথে অর্থাৎ জর্মন, গথিক, কেল্টিক ও আবেস্তিক ভাষার সাথে উক্ত ভাষাতাত্ত্বিক সূত্রের এতটা মিল দেখা যেত না। এ-সমস্ত মিল জন্মগত বিশ্বাস, ব্যক্তি-গত সম্বন্ধ, সংখ্যা, শরীর প্রভৃতি সভ্যতার গোড়ার স্তরে যে-সমস্ত ভাষায় ঘটে, সে-ভাষাগুলোর মূল এক ব'লে মনে করা সহজ। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক,—

১। বিশ্বাস:	২। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ:	
(ক) সং—দেব	সং—পিতৃ=পিতর,	(খ) সং—মাতৃ=মাতর
লা.—Deus	লা.—Pater (পতের)	লা.—Mater (মতের)
গ্রী.—Theos	গ্রী.—Pater (পতির)	গ্রী.—Meter (মিতির)
জর্ম.—Gott	জর্ম.—Vater (ফতের)	জর্ম.—Mutter (মুতের)
ফা.—দেও	ফা. پدر (পিদর)	ফা.—مادر (মাদর)
বাং—দেবা	বাং—পিতা	বাং—মাতা

*"It (Sanskrit) was a language of most wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a strong affinity."—The Science of Language, vol. I. New Impression, 1899, Chapt. Vi, p. 224, by F. Max Muller.

৩। সংখ্যা :

Ten—সং—দশ	Two—সং—দ্বি
লা.—Decem	লা.—Duo (দুও)
গ্রী.—Deka	গ্রী.—Dyo (দ্যো)
জর্ম—Zehu	জর্ম—Zwei (জোই)=দ্য=জ
ফা.—د ۵ (দহ্)	ফা.—د وم (দোয়ম) দ্যোতি=জ্যোতি
বাং—দশ	বাং—দুই

৪। শরীর সম্বন্ধীয় শব্দ :

সং—পদ, পাদ	সং—হৃৎ
লা. Pedis, pes (পেদিস)	লা—Cordis (কর্দিস্)
গ্রী—Podos (পোদস)	গ্রী—Kardia (কর্দিয়)
জর্ম—Fuss	জ—Hrz
ফা—پا (پا بند) (পা)	
বাং—পা	

উপরে দেখানো এই যে ইউরোপ ও এশিয়ার এতগুলো ভাষার মধ্যে এতখানি নিবিড় মিল দেখা যাচেছ, এ মিলের ব্যাখ্যা কি ? স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬—১৭৯৪) কর্তৃক এ মিলের আবিষ্কারে "জনগণ সম্পূর্ণরূপে বোকা বনে গেলেন ; ধর্মযাজকগণ তাঁদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনার্থে মাথা নাড়লেন ; প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষার পণ্ডিতগণের মুখে কালোছায়া নেমে এল ; তাঁদের সামনে উপস্থিত করা তথ্যাদি থেকে কেবলমাত্র যে একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা যেত, অথচ তাকে মেনে নিলে তাঁদের অকিঞ্চিৎকর বিশ্ব-ইতিহাসের ধারা পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তটিকে এড়িয়ে যাবার জন্য দার্শনিকগণ উদ্ভটতম অনুমানকে প্রশ্রয় দিলেন।"* বলাবাহুল্য, স্যার উইলিয়ম জোন্সের এমন

*People were completely taken by surprise. Theologians shook their heads : classical scholars looked sceptical : philosophers indulged in the wildest conjectures in order to escape from the only possible conclusion which could be drawn from the facts placed before them, but which threatened to upset their little systems of the history of the world.—প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫।

বিজ্ঞান-সম্মত ভাষাতাত্ত্বিক কল্পনা Family of Languages বা 'ভাষাগোষ্ঠি' অথবা 'ভাষা-বংশ' নামে পরিচিত আধুনিক চিন্তাধারার জন্মদান করেছে। ভাষা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে 'ভাষাগোষ্ঠির' ধারণা শুধু বৈপ্লবিক নয়, বৈজ্ঞানিকও বটে।

এতে প্রাচীন ভূয়োদর্শিতাজাত ভাষাতত্ত্বের অবসান সূচিত হ'ল এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তি প্রোথিত হ'ল। "চারদিককার পারিপার্শ্বিকতায় মানুষের বিবর্তন ও যাবতীয় কৃতিত্ব অর্জনের কথা মনে রে'খে ভাবতে গেলে দেখা যাবে, মানুষের আধুনিক চিন্তাজগতে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান ধারণা উদ্ভূত হয়েছে, তন্মধ্যে 'ভাষাগোষ্ঠির' ধারণা অন্যতম"।* অতঃপর, তুলনামূলকভাবে বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাসমূহের আলোচনা আরম্ভ হ'ল, তৎসংক্রান্ত নানাবিধ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাদির সাহায্যে 'আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান' (Modern Science of Language) জন্মলাভ করল।

২

পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভাষা বর্তমান আছে। এখনও মানুষ এই ভাষাগুলোর সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ক'রে থাকে। এ-গুলোর মধ্যে প্রধান-প্রধান 'উপভাষা'-কে ধরা হ'লেও, সবগুলোকে মিলিয়ে এক সাথে 'জীবিত-ভাষা' নামে চিহ্নিত করা হয়। এখন প্রশ্ন হ'ল,—বিশ্বের এই সাড়ে তিন হাজার 'জীবিত' ভাষার প্রত্যেকটিই পৃথক্ পৃথক্ ভাষা, না, এগুলো এক বা একাধিক মূল ভাষার অন্তর্গত? এটি ভাষা নির্ণয়ের একটা জটিল প্রশ্ন। এ-প্রশ্নের প্রাচীনতম উত্তর

*"The idea of Language Families is one of the greatest discoveries in modern thought with reference to the evolution of man in all his environments and his accomplishments." —Indo Aryan and Hindi by Dr. S. K. Chatterji, (Reprinted Copy), 1969, p. 4.

খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের 'টাওয়ার্-অব্-ব্যাবেল্' নামক কাহিনীর ঈশ্বর কর্তৃক 'ভাষা-বিভ্রম' ঘটিয়ে দেওয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।* স্যার উইলিয়ম জোন্সের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর, আধুনিক ভাষা-তাত্ত্বিকগণ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব প্রয়োগ ক'রে দেখতে পেলেন যে, পৃথিবীর জীবিত ভাষাগুলি একটিমাত্র ভাষা থেকে উদ্ভূত নয়; বরং একাধিক মূলভাষা থেকেই এগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। এই মূল-ভাষাগুলো 'ভাষা-বংশ' বা Family of Languages নামে পরিচিত। এ-'ভাষা-বংশ' খুঁজে বার করার জন্য আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণ যে একটি বৈজ্ঞানিক ভাষা-সূত্র আবিষ্কার করলেন, তা হচ্ছে এই :—

> একই স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে গঠন-প্রণালী (Structure), শব্দসম্পৎ, ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ প্রভৃতির মতো বাক্সামগ্রীগত (জর্মন ভাষায় যাকে Sprachgut=স্প্রেচগুথ্ বলে) এবং ব্যাকরণগত সাদৃশ্য যদি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই ভাষাগুলির মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ অর্থাৎ বংশগত সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা বিশেষভাবে বর্তমান ব'লে মনে করতে হবে।

পৃথিবীর সুপরিচিত ভাষাগুলোর বেলায় উক্ত সূত্র প্রয়োগ ক'রে ভাষাতাত্ত্বিকগণ দেখতে পেলেন, পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার প্রত্যেকটি পৃথক্ ভাষা নয়। তাদের অনেকগুলো এক এক বংশের অন্তর্গত। সংক্ষেপে এই 'ভাষা-বংশ' এইরূপ :—

১। সেমীয় ভাষা-বংশ (আসিরী-বাবিলেনীয়, হিব্রু, ফিনিসীয়, সিরীয়, আরবী, সেবীয়, ইথোপীয়, আবিসিনীয় ইত্যাদি)

২। হেমীয় ভাষা-বংশ (প্রাচীন মিসরীয়, কপটিক, তুয়ারেগ, কবাইল, অপরাপর বারবার ভাষা, সোমালী, ফুলনী ইত্যাদি)

৩। চৈনিক-তিব্বতী ভাষা-বংশ (চৈনিক বা হ্যান্, থাই বা দাই=শ্যামীভাষা, বর্মী বা ম্রন্মা, বোদ বা তিব্বতী, ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত ভাষা ইত্যাদি)

৪। উরলীয় ভাষা-বংশ (মগ্যর, ফিন্, এস্থ, লপ্প্, ভোগুল, ওস্ত্যক প্রভৃতি)

*For details see The Bible, Genesis XI.

৫। আল্‌তাই ভাষা-বংশ (তুর্কী, মোঙ্গল, মঞ্চু ইত্যাদি)

৬। দ্রবিড় ভাষা-বংশ (তামিল, তেলুগু, কন্নাড়, গোণ্ডী, মালয়ালম ইত্যাদি)

৭। অস্ট্রিক ভাষা-বংশ (কোল-মুণ্ডা উপভাষাসমূহ, খাসী, মন-খেমের নিকোবরী, অস্ট্রো-এশীয় ভাষাসমূহ ইত্যাদি)

৮। ইন্দোনেশীয় ভাষা-বংশ (মালয়ী, সুন্দনী, যাবনী, বালিনী, তোরজা, বিষয়া, তগলগ, মালাগাছী প্রভৃতি)

৯। পলিনেশীয় ভাষা-বংশ (সেমোয়ানীয়, তাহিতীয়, মাওরী, মার্কিসান, হাওয়াইয়ান প্রভৃতি)

১০। বাণ্টু ভাষা-বংশ (সুহাইলী, লুগাণ্ডা, কঙ্গো ভাষাসমূহ, সেচুয়ানা, জুলু প্রভৃতি)

১১। সুদানী ভাষা-বংশ (পশ্চিম আফ্রিকার ভাষাসমূহ—য়ুরুবা, ইবো, ইযোহে, আকন, মন্দিঙ্গো ইত্যাদি)

১২। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ভাষা-বংশ সমূহ

১৩। **ইন্দো-ইউরোপীয়** ভাষা-বংশ (ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশের এবং ইরান ও ভারতসহ এশিয়ারও বহুদেশের ভাষা)

১৪। বিবিধ (এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর জীবিত ভাষার মধ্যে এমন ভাষাও আছে, আজও যার কোন হদিস পাওয়া যায়নি এবং যাকে এখনও কোন ভাষা-বংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি)।

এই যে ভাষার বংশভুক্তি, ভাষাতত্ত্ব-জগতে এটা একটা প্রায় অসাধ্য সাধনের মতো অদ্ভুত কাজ। এর ফলে, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের এবং অতলান্তিক, প্রশান্ত, ভারতীয়, উত্তর ও দক্ষিণমেরু মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপ অথবা দ্বীপপুঞ্জের ভাষাগুলো উক্ত কোন-না-কোন ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

এর ফলে দেখা গেল, পৃথিবীর ভাষা-বংশগুলোর মধ্যে **'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বংশই'** সর্বাধিক বিশিষ্ট। কারণ, জগতের অধিকাংশ মানুষ এই ভাষাবংশের কোন-না-কোন ভাষায় অথবা উপভাষায় কথা ব'লে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে; পৃথিবীতে বিগত প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর

ধ'রে মানব-সভ্যতায় ভাষার সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে যে-সব উন্নতি সংসাধিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তা এই ভাষা-বংশভুক্ত মানুষেরাই করেছে ও ক'রে যাচ্ছে; এমন কি গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন এবং ফরাসী, জর্মন, ইংরেজী ও রুশ প্রভৃতি আধুনিক বিশ্বের প্রভাবশালী ভাষাগুলোরও জন্ম দিয়েছে এই ভাষবা-ংশটি। আরও একটু ভাব্‌লে দেখতে পাই, এই ভাষা-বংশ পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাবংশ থেকে স্বকীয় অন্তর্নিহিত ক্ষমতায় শক্তিশালী। কেননা, বর্তমান পৃথিবীর আর-আর ভাষা-বংশোদ্ভূত ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ভাষাগুলো এরই মধ্যে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছে, বাহুবলে নয়,—বরং একান্ত মানসিক শক্তির বলে। এমন কি, ইন্দো-ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ভাষাগুলো অপর বংশোদ্ভূত ভাষাগুলোকে দিনে দিনে তিলে তিলে প্রভাবিত করেছে ও এখনও প্রভাবিত করে চলেছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইন্দো-ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ইংরেজী ভাষার কথা ধরা যে'তে পারে। ইংরেজী এখন আর ইংরেজ জাতির ভাষা নেই। এ-ভাষা এখন একটা আন্তর্জাতিক অন্তর্দেশীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। ইংরেজী ভাষা অদূর ভবিষ্যতে তার এই গৌরবময় আসন থেকে নেমে আস্‌বে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

আমাদের 'বাঙলা-ভাষা' পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ভাষা-বংশ 'ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী' থেকে উৎপন্ন একটি আধুনিকতম ভাষা। আধুনিক বাঙলা-ভাষার মতো ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ আধুনিক ভাষা যে মূলে এক ছিল তা দীর্ঘ ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে নির্ণীত হয়েছে। উদাহরণরূপ আমরা ইউরোপ ও এশিয়ার তিনটি প্রধান বর্তমান ভাষার প্রত্যেকটি থেকে একটি ক'রে প্রতিনিধিত্বমূলক শব্দ নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি; যথা—

১। সং—দুহিতৃ=দুহিতর্‌	২। সং—নামন্‌
গ্রী.—Thygater (থ্যগতের)	লা.—Nomen
ইং.—Daughter (দওতর)	জর্ম—Name
	ইং—Name
ফা.—دختر (দোখ্‌তর্‌)	ফা.—نام (নাম)
বাং—দুহিতা	বাং—নাম

৩। সং—মধু
গ্রী.—Methu (মেথু)
লিথু—Medhu (মেধু)
রুশ—*Medhu* (*মেধু*)
বাং—মধু

৪। সং—রুধির
গ্রী.—e-rythros(এ-রিথ্রোস)
লা.—Ruber (রুবের)
ইং—*Red*
বাং—লহু (সং লোহিত)

৫। উপসর্গের ব্যবহার
সং—প্রবাদ (প্র+বাদ)
লা—Proverbium (Pro+verbium=a word)
ফ্রেঞ্চ—Proverbe (Pro+verbe)
ইং—Proverb (Pro+verb)
বাং—প্রবাদ (প্র+বাদ)

৬। problem—Gr. problema=pro (before)+ballein =to throw.
programme—Gr. L. progremma=pro (before)+graphein=to write.

৭। সং—অন=অনাবশ্যক
un-necessary
অ—অসমর্থ—un-able

একই ধরনের—অ, অন=un-শব্দের আগে নঞর্থক ধ্বনিরূপে ব্যবহৃত।

এরূপ আরও বহু শব্দে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও গঠনমূলক সামঞ্জস্য দেখা যায়। এ-সামঞ্জস্যের প্রতি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করলে বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পারা যায় শব্দগুলোর রূপ আধুনিক হওয়া এবং প্রধানত সে-কারণেই কিঞ্চিৎ ধ্বনিগত অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হ'লেও এগুলো এক কালে একেবারেই এক ছিল। তার সময়, সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচ শত) বৎসর।

এ-সময় যারা এই ভাষাটি অর্থাৎ আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাটি বল্‌ত, তারা কারা?—এমন একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, এই আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাই বৈদিক, প্রাচীন পারসিক, গ্রীক, লাতিন, গথিক, জর্মন, কেল্টিক, আর্মেনীয়, আলবেনীয় এবং অধুনালুপ্ত হিট্টাইট ও তোখারী প্রভৃতি ইউরোপ ও এশীয় ভাষাসমূহের জননী। এই আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী লোককে কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক

নাম দিয়েছেন * Wiros=বীরোস ;—এর অর্থ 'মানুষ'। এই শব্দ থেকেই সংস্কৃত 'বীর'=Vira; লাতীন 'উঈর'=Uir ; জর্মন 'ওয়ের'=wer ; এবং প্রাচীন আইরিশ ভাষায় 'ফের'=fer শব্দ উৎপন্ন হয়েছে। এই "বীরোস্"-গণকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষের পূর্বপুরুষ ব'লে ধ'রে নিলেও, এরা কারা, এরা এক না একাধিক বংশ-সম্ভূত ছিল, তার কিছুই বল্‌তে পারা যাচেছ্ না।

প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক 'এস্কোলি' (Ascoli) ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় দু'টি 'বর্গ' বা 'শ্রেণী' আবিষ্কার করেন। এস্কোলির এ-আবিষ্কার তখনকার দিনের ভাষাতত্ত্ব-জগতে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে, তখনকার যাবতীয় ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর এ-আবিষ্কারটির একবাক্যে স্বীকৃতি দেন। এতে ক'রে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যে-দুটি 'বর্গ' বা শ্রেণী স্বীকৃতি পে'ল, তার একটির নাম 'কেন্তুম্' (Centum) এবং অপরটির নাম 'সতেম্' (Satem) বা 'শতম্' (Satam). এ দুই 'বর্গের' বৈশিষ্ট্য এত সুস্পষ্ট যে, একটির বৈশিষ্ট্য অন্যটির বৈশিষ্ট্যকে ঢেকে ফেলে না। এমন কি এই 'সতেম্' ও 'কেন্তুম্' বর্গের মধ্যে এমন কোন নিরপেক্ষ অঞ্চলও নেই যাতে উভয় বর্গের বৈশিষ্ট্যের কোন একটিও পাওয়া যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'কেন্তুম্' ও 'সতেম্' বর্গ-দুটো একই ভাষার দু'টি 'উপভাষা' বা Dialect ব'লে মনে করাই সঙ্গত। আগেভাগেই ব'লে রাখা ভালো, আমাদের বাঙ্‌লা-ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বংশের 'সতেম্' বা 'শতম্' বর্গের অন্তর্গত।

৩

সে যাই হোক, আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাটির আঞ্চলিক অবস্থান কোথায় ছিল, সে প্রশ্নটিও স্বাভাবিক ভাবে মনে জাগে। বিষয়টি এত বিতর্কিত যে, এখানে সে প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো। তবে, বাধ্য হয়েই অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিক যে-মতটি গ্রহণ করেছেন এবং ব্রেস্‌লো (Breslau) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক স্ক্রেদার (Prof. Schrader)

যে-শব্দের আগে * এই চিহ্নটি দেওয়া হয়, তাকে পুনর্গঠিত শব্দ ব'লে ধ'রে নিতে হবে।

যে-মতটি প্রচার করেছিলেন, তার কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনান্তে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে অধ্যাপক 'স্ক্রদার' বল্‌লেন,—ইউরোপের ভল্‌গা (Valga) নদীর মোহনার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানসহ ক্যাস্পিয়ান সমুদ্রের (Caspian Sea) উত্তর-তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই ইন্দো-ইউবোপীয় মূল ভাষা-বংশের আদি বাসভূমি ছিল।* এ-ভাষা তখন নতুন বাসস্থানের অনুসন্ধানে ছড়িয়ে-পড়া 'বীরোস্'দের সাথে এশিয়া ও ইউরোপেব নানা ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করে এবং কালক্রমে বিবর্তিত হ'য়ে এই দুই মহাদেশের অনেকগুলো আধুনিক ভাষায় পরিণত হয়। এই আধুনিক ভাষাগুলোর মধ্যে 'বাঙলা'-ও একটি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী 'বীরোস্'-গণ কবে, কেন, কোথায় ও কিভাবে চারিদিকে ছড়িযে পড়ে তার কোন প্রকাবের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। একথা বল্‌লে যথেষ্ট হবে যে,—খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ৩০০০ বছর থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে বীরোস্-গণের এক বা একাধিক দল মূলগোষ্ঠী ত্যাগ ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে এশিয়ামাইনর হ'যে ইরান মালভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। 'আর্য' [ঋ (গমন করা)+ঘ্যণ+র্তৃবাচ্য (ঋ-ধাতু 'গমনার্থক' বলে 'জ্ঞানার্থক')=যাঁরা শাস্ত্রসীমায় গমন করেন অর্থাৎ জ্ঞানী] নামে নিজেদের পরিচয় দিতেন। এই 'আর্য' শব্দেব অর্থ জ্ঞানশীল, শ্রেষ্ঠ, পূজ্য, সম্ভ্রান্ত প্রভৃতি। এব থেকে বোঝা যায়, এঁরা যাদের মধ্যে বা যাদের দেশে বাস কর্‌তেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী ছিলেন। আর্যেরা ইরানের মালভূমিতে বহুদিন বাস করেন। এ-সময়ে তাঁদের 'সতেম্' বা 'শতম্' উপভাষা বেশ ভালরূপে বিকশিত হয়। পণ্ডিতগণ এ উন্নত অর্থাৎ পূর্ণবিকশিত ভাষার নাম দিয়েছেন 'ইন্দো-ইরানী' অথবা আর্যভাষা। এই 'আর্য' ভাষাই বাঙলা-ভাষার পূর্বপুরুষ।

*The latest and the most widely accepted opinion however, is that of Professor Schrader of Breslau who places the home (of the Indo-Europeans) in the region about the mouths of the Volga and the northern shores of the Caspian Sea,"—Elements of the Science of Language, by I. J. S. Taraporewala, Third Edition (Cal. Uni), 1962, p. 204.

ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যেই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে বিভিন্ন সময়ে 'আর্যজাতি' পূর্বদিকে কাবুল নদীর তীর ধ'রে কাবুল উপত্যকা বে'য়ে ভারতে প্রবেশ করে। এ-সময়ে যে-সমস্ত আর্যদল কাবুল উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে, তারা 'গান্ধার-সভ্যতার' পত্তন করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে এই 'গান্ধার-সভ্যতার' বহুনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। স্মরণ রাখা উচিত—ইরানে অবস্থান কালে আর্যদের ভাষা একরূপ ছিল। তার প্রধান প্রমাণ 'আবেস্তা' ও 'ঋক্‌বেদে'র ভাষার মধ্যে অত্যধিক মিল। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত আবেস্তীয় শ্লোকটির পাশাপাশি তার সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হল :—

আবেস্তা			সংস্কৃত অনুবাদ		
তম্‌	অমবন্তম্‌	যজতম্‌ ।	তম্‌	অমবন্তম্‌	যজতম্‌ ।
সূরম্‌	দামোহু	সবিশ্‌তম্‌ ।	সূরম্‌	ধামসু	শবিষ্ঠম্‌ ।
মিথ্রম্‌	যজই	জওথাব্যো ।।	মিত্রং	যজৈ	হোত্রাভ্যঃ ।।*

আবেস্তা ও ঋক্‌বেদের ভাষায় ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দসম্ভার, রূপতত্ত্ব ও ব্যাকরণে এত মিল থাকা সত্ত্বেও স্বীকার কর্‌তে হ'বে যে, ভারতীয় আর্যদের কথ্যবুলি ও ধর্মানুষ্ঠান সর্বত্র একরূপ ছিল না। অন্য কথায়, ইরানে অবস্থান কলেও আর্যদের মধ্যে কয়েক প্রকারের উপভাষার প্রচলন ছিল, এমন কি, ধর্মবিশ্বাসেও তাঁদের সকলে বৈদিক অনুষ্ঠানাদি মানতো না। তাদেরকে বলা হ'ত 'ব্রাত্য'। এই উপভাষার অস্তিত্ব পরবর্তী ভারতীয় আর্যদের ভাষাবিশ্লেষণ থেকে এবং বৈদিক অনুষ্ঠানাদি বহির্ভূত আর্যদের অস্তিত্ব তাদের শাস্ত্রালোচনা থেকে বুঝতে পারা যায়।

মোটের উপর, বিভিন্ন সময়ে পৃথক্‌-পৃথক্‌ দলে আবদ্ধ হ'য়ে পূর্ব-ইরান থেকে আর্যেরা আফগানিস্তান পার হ'যে কাবুল উপত্যকা ধ'রে খাইবার ও বোলান গিরিবর্ত্ম দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। মনে হয় এ-সময় ভারতে দু'টি আর্যকেন্দ্র স্থাপিত হয় ; তার একটি হ'ল 'গান্ধার অঞ্চলে' অর্থাৎ প্রাচীন পুরুষপুর বা বর্তমান পেশাওয়ারে এবং অপরটি হ'ল 'ব্রহ্মাবর্ত অঞ্চলে' অর্থাৎ পাতিয়ালা, অম্বলা, কর্ণাল প্রভৃতি এলাকায়। তখনও বৈদিক ধর্ম পুরাপুরি ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি। ঋগ্বেদের অধিকাংশ 'সূক্ত' পাঞ্জাবে রচিত

*ভাষার ইতিবৃত্ত,—শ্রীসুকুমার সেন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ৬৬।

হ'লেও, কিছু কিছু 'সূক্ত' ইরানেও রচিত হয়েছিল এবং তাকে স্মৃতিতে ধ'রে রে'খে কণ্ঠে গাইতে গাইতে ভারতে বৈদিক আর্যেরা যে প্রবেশ করেন নি, তা আজ কে বলবে?

এঁরা পশ্চিম-উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ-অঞ্চলেই প্রাচীন আর্যেরা বৈদিক অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা-পদ্ধতির, হোম ও বলির ব্রাহ্মণ্য ধারণার প্রচলন এবং আর্য রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের মধ্য থেকে একটি ক্ষুদ্র দল অথবা বৈদিক আর্যের আর এক পৃথক দল পাঞ্জাব অঞ্চলের পূর্বদিকে চ'লে এসে মধ্যদেশে অর্থাৎ গঙ্গার উপরের দিককার 'দোয়াব'-অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং এরাই ধর্ম-সাহিত্য ও অনুষ্ঠানাদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তথায় চতুর্বর্ণাশ্রমসহ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করেন। বৈদিক আর্যেরা ভারতে এসে শুধু যে অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তা নয়; তাঁরা ভিন্নমতাবলম্বী আর্যদের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বেদেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।*

এখন থেকে আর্যেরা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁরা যে সবাই বৈদিক আর্য অথবা ব্রাহ্মণ্য মতবাদী আর্য ছিলেন এমন নয়। বৈদিক ধর্ম বহির্ভূত আর্যদের কোন কোন দল গঙ্গার তীরভূমি ধরে পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে থাকবেন। এঁরা 'ব্রাত্য' বা বৈদিক ধর্ম বহির্ভূত আর্য নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে 'ব্রাত্য' শব্দের অর্থ আচারভ্রষ্ট বা পতিত। পতিত আর্য হ'লেও এদেরকে 'ব্রাত্য-স্তোম' নামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা বৈদিক আর্য সম্প্রদায়ে গ্রহণ করা যেত। 'মগধ-রাজ্য'ই ব্রাত্যদের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল এবং প্রতিভাশালী চারণ কবিগণই তাদের পুরোহিতের কাজ সমাধা করত।* এই 'মগধ'-রাজ্য থেকেই প্রাচীন আর্যেরা বঙ্গে এসেছিলেন। বলা একান্তই বাহুল্য যে, খ্রীস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে আর্যেরা ভারতের নানা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, 'উদীচ্য' অর্থাৎ গান্ধার, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ; 'প্রতীচ্য' অর্থাৎ গুজরাট, সিন্ধু প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল; 'মধ্যদেশীয়' অর্থাৎ কুরু, পঞ্চাল, কান্যকুব্জ, পশ্চিম

*O.D.B.L. Dr. S.K. Chatterji, part, I, 1926, (Cal Uni), pp. 39-41.

*Ibid, pp. 46-48.

দোয়াব এলাকা ; 'প্রাচ্য' অর্থাৎ কোশল ও মগধ অঞ্চল ; এবং 'দাক্ষিণাত্য' অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের মহারাষ্ট্র অঞ্চল প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এ-ভাবে ভারতের নানা স্থানে আর্যেরা ছড়িয়ে পড়ার ফলে, আর্যভাষায় নানান ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। সুতরাং, ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রচেষ্টাও ক্রমাগত চলতে থাকে। ফলে, খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ চারিশত (মতান্তরে ২৫০ আড়াই শত) বৎসরে শুচিতাবাদীদের মধ্য থেকে 'পাণিনি' নামক এক মহাবৈয়াকরণের আবির্ভাব ঘটে। তিনি সমস্ত আর্যভাষাব সংস্কার ক'রে 'সংস্কৃত-ভাষার' জন্মদান করেন। এ-ভাষা কতিপয় শিষ্ট ব্যতীত অন্য কেউ কখনও কথ্য ভাষারূপে মৌখিকভাবে ব্যবহার করেনি। এ-ভাষা আর্যসংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের ভাষারূপে ভারতীয় আর্যদের ভাষায় পরিণত হয়। এতে আর্যদের মুখের ভাষার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আর্যভাষার এই মৌখিক ধারা থেকেই উত্তর ভারতীয় বর্তমান ভাষাগুলোর মত বাঙলা-ভাষাও বিবর্তিত হয়েছে। সে-কাহিনী পরে সংক্ষেপে বিবৃত হবে।

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে গুপ্ত-বংশের রাজত্ব কালে 'মগধ'-সহ বঙ্গদেশ আর্যসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমতট, কামরূপ ও ডবাক (Davaka) দেশের লোক সম্রাটকে করদান করত ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 'ডবাক' কি ঢাকা ? গুপ্ত বংশীয় রাজারা অত্যুৎসাহী ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা মধ্যদেশ থেকে পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মোত্তব, দেবোত্তর দিয়ে ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে দিতেন,—বোধহয় বঙ্গদেশীয় আচারভ্রষ্ট 'ব্রাত্যদের' বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য। বঙ্গদেশ থেকে এরূপ কয়েকখানি প্রাচীন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁরা এ-দেশে হিন্দু মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর থেকে বুঝতে পারা যায় খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধসহ পূর্বাঞ্চল আর্যায়িত হচ্ছিল। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ (Hiuen Tsang) যখন বাঙলাদেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি 'পুণ্ড্রবর্ধন' নগরে ঘন বসতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং তথায় নাগরিকগণকে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল দেখতে পান ; এবং এই নগরে মহাযান-হীনযানবাদী বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ও ব্রাহ্মণ্য-জৈনমতবাদিগণ তাঁদের নিজ-নিজ মত অনুসারে আনন্দ সহকারে বাস করছিলেন।

হিউয়েন সাঙের সাক্ষ্য থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আর্যভাষা ও সভ্যতা বাঙলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশে আর্য ধর্ম, আর্যসভ্যতা ও আর্যভাষা পালবংশের (৭৪০—১১০০ খ্রীঃ) রাজত্বকালেই সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল। এ-সময়ে এই দেশে বৌদ্ধ দর্শন, হীনযান, মহাযান ও সহজযান প্রভৃতি বৌদ্ধমত প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সময়ে ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত-ভাষার চর্চাও নির্বিঘ্নে করছিলেন। সমসময়ে জনসাধারণ নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা, ধর্মানুভূতির উপলব্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচনা করত। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচনা 'চর্যাপদ' এবং সরহ প্রভৃতির 'দোহাকোষ' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৪

৯০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বাঙলা-ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল, এমন চিন্তা আর যা কিছুই হোক, অন্ততঃ অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক ব্যাপার।* খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর (?) দণ্ডীর কাব্যাদর্শের বরাতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাঙলা-ভাষার উৎপত্তি-কাল নির্ণয় করেছেন খ্রীস্টীয় ৬৫০ অব্দে।* এই কাল ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ঘষে দেখ্‌লে টিকে না। তাই, বাঙলা ভাষার উদ্ভব-কাল সম্বন্ধে তাঁর মত গ্রহণ সম্ভব নয়। তখন অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ৯০০ অব্দে ভারতীয় আর্য ভাষা 'মধ্য ভারতীয় আর্য' কাল অথাৎ 'প্রাকৃত'-কাল (খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ) অতিক্রম করেনি এই মধ্যভারতীয় আর্য-ভাষা অর্থাৎ 'প্রাকৃত' স্তর কয়েকটা উপস্তরে বিস্তৃত। আদি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাস্তরে অশোক অনুশাসনের ভাষার, বিশেষ ক'রে 'পালি'-ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। পরিবর্তনোন্মুখ মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষাস্তর খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত;

*The History of Bengal, volume I, Edited by Dr. R. C. Majumder, published by the Dacca University, vide pp. 374—393 and pp. 563—565, (Second impression, 1963).

*বাংলা-ভাষার ইতিবৃত্ত. পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৮, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লা, পঃ ৯।

আর 'সৌরসেনী প্রাকৃত'কে এই সময়ের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যায়। মধ্যম মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার কাল ২০০ হইতে ৬০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন মহারাষ্ট্রীর মতো সাহিত্যিক প্রাকৃতই দেশে প্রচলিত ছিল। তাই, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকেই এ-যুগের প্রতিনিধি হিসেবে ধরতে হবে। অন্ত্য বা শেষ মধ্য ভারতীয় ভাষার স্তরটি ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত, আর 'অপভ্রংশই' হচ্ছে এ-যুগের প্রতিনিধি। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসে অপভ্রংশের আবির্ভাবে আর্যভাষার 'প্রাকৃত'-অবস্থার অবসান ঘট্‌ল এবং 'নব্য ভারতীয় আর্যভাষার' সূত্রপাত হ'ল, অর্থাৎ 'দেশীভাষা'-গুলো আপন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলো। সিন্ধী, গুজরাটী মারাঠী, পাঞ্জাবী, হিন্দী, অবধী, মগহী, ভোজপুরিয়া, মৈথিলী প্রভৃতি 'দেশীভাষা'-গুলোর মতো আমাদের 'বাঙলা-ভাষা'ও জন্মলাভ করল।

প্রকৃতপক্ষে, 'বাঙলা-ভাষা' নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষার পূর্বাঞ্চলীয় বিবর্তিত রূপগুলোর মধ্যে অন্যতম। মগধ এবং মাগধী-প্রাকৃত এই অঞ্চলে অবস্থিত। ভৌগোলিক-অবস্থান, সুপ্রচলিত কিংবদন্তি, প্রত্নতত্ত্ব-নির্ভর ইতিহাস এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ,—সবকিছু মিলে সুস্পষ্টরূপে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে যে, 'বিহার' থেকেই আর্যজাতি ও তাদের ভাষা বাঙলাদেশে (বর্তমান স্বাধীন 'বাংলাদেশ' নয়—সাবেক বাঙলাদেশ) প্রবেশ করেছিল। কিন্তু, আর্যেরা কখন বাঙলাদেশে প্রবেশ করে, তার কোন হদিস নেই। এ-ব্যাপারটি ঘটেছিল মৌর্যযুগের পরে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ২০০ অব্দের দিকে এবং জারী ছিল ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। মনে রাখা আবশ্যক যে, 'মিথিলা' উত্তর-বিহারে এবং 'মগধ' বা 'অঙ্গ' দক্ষিণ--বিহারেই অবস্থিত। আর্য-দের সাথে তাদের ভাষা 'মিথিলা' থেকে উত্তর-বঙ্গে এবং 'মগধ' বা 'অঙ্গ' অঞ্চল থেকে মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রবেশ করেছিল ব'লে সহজেই ধ'রে নেওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে 'মগধ' দেশ আর্যরাজ্যভুক্ত হ'য়ে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। এখান থেকেই আয উপনিবেশ, আর্য-ভাষা ও আর্য-সংস্কৃতি পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গদেশে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে। তখন ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যযুগের অর্থাৎ 'প্রাকৃত'-যুগের শেষ দিক। আদিম প্রাকৃত হিসেবে 'পালি'-ভাষার কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, 'মহা-রাষ্ট্রী', 'সৌরসেনী' ও 'মাগধী' প্রাকৃত তখন 'অপভ্রংশ', 'অপভ্রষ্ট' বা 'অবহট্টের' দিকে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত প্রাকৃতের সাথে যেসব সাধারণ

বৈশিষ্ট্যে 'মাগধী'-প্রাকৃত একরূপ ছিল, তার কথা বাদ দিয়েও দেখা যায়, 'মাগধী-প্রাকৃতে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা 'মাগধী'-প্রাকৃতকে অন্যান্য প্রাকৃত থেকে পৃথক্ ক'রে দিয়েছিল।* সংক্ষেপে তা মগধের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছোটনাগপুরের সরগুজা রাজ্যের রামগড় পাহাড়ের যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত প্রাকৃত-শিলালিপিতে দেখতে পাই। শিলা-লিপিটি এরূপ :—

১। "সুতনুক নম দেবদশিকি
২। তং কময়িথ বলনশেয়ে
৩। দেবদিনে নম লুপদখে।"

বাঙলা

১। সুতনুকা নামে দেবদাসী;
২। তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী
৩। দেবদত্ত নামে রূপদক্ষ [=ভাস্কর]।

এখানে 'মাগধী' প্রাকৃতের বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর মধ্যে এ কয়টিই প্রধান :—সংস্কৃতের 'স', 'ষ'=মাগধীর 'শ'—সবিশেষ > শবিশেশ

বারাণসেয়হ > বালানশেয়ে

র = ,, 'ল'—গলুড় < গরুড়

চালুদত্ত < চারুদত্ত

লুপদখ < রূপদক্ষ

মাগধীতে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কর্তৃকারকের একবচনে—'এ' বিভক্তির ব্যবহার, যেমন দেবদত্ত > দেবদিনে।

পরবর্তী যুগে এই মাগধী বৈশিষ্ট্যগুলি বাঙলা-ভাষায় ব্যবহৃত হ'য়েছিল বাঙলার ধ্বনিতত্ত্বে ও রূপতত্ত্বে। এর থেকে বুঝতে পারা যায় 'মাগধী' ভাষা 'বাঙলা-ভাষা'র সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। কেননা, অন্যান্য প্রাকৃতের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব 'মাগধী' প্রাকৃতে যেমন দেখা যাচেছ, তেমন তার প্রভাব

*Vide "Introduction to Prakrit. 3rd Revised Edition. Dr. A. C. Woolner 1939, chapter X, pp. 61—82.

'বাঙলা'-ভাষায়ও মিলছে বটে, তার 'মাগধী'-প্রাকৃতের বিশিষ্ট প্রভাবও 'বাঙলা'-ভাষায় সরাসরি ফুটে উঠেছে। তাই, বলতে হয়, 'মাগধী'-প্রাকৃতের মাধ্যমেই 'বাঙলা'-ভাষা এসব বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিল। বাঙলা-ভাষা 'মাগধী'-প্রাকৃতের উত্তরাধিকারী নয়,—বরং 'গৌড়ী'-প্রাকৃতের উত্তরাকারী*—মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এ-যুক্তি ভাষাতাত্ত্বিক ধোপে টেকে না। কারণ, কোথাও অদ্যাবধি 'গৌড়ী'-প্রাকৃতের কোন নমুনা পাওয়া যায়নি এবং যেহেতু নিদর্শনবিহীন 'ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা' ভাষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা পুনর্গঠিত ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেহেতু কোন প্রকারের নমুনাহীন 'গৌড়ী'-প্রাকৃতও ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা পুনর্গঠিত হওয়া ও স্বীকৃতি লাভ করা উচিত, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই যুক্তি মেনে নিলে ভারতীয় ভাষার মাটি থেকে কেঁচো উঠাতে গিয়ে সাপ বেবিয়ে আসার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং এ-প্রসঙ্গ এখানে রে'খে দেওয়াই ভালো।

সে যাই হোক, 'অপভ্রংশ'-যুগের শেষ এবং নব্য-ভারতীয়-যুগের প্রথম দিকে অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ৯০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে বাঙলা-ভাষা স্বকীয় রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এ-সময়কার সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হচ্ছে '**চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়**', সংক্ষেপে চর্যাগীতি' বা 'চর্যাপদ'। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ-গীতিকাগুলোর আবিষ্কর্তা। তিনি এর সম্পাদনা ক'রে বাঙলা-ভাষার আদি নিদর্শন পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে তু'লে ধরেছিলেন। এর ভাষা আলোচনা ক'বে দেখা গেল, এতে অপভ্রংশের চিহ্ন বিদ্যমান: যেমন বাঙলা সর্বনাম 'যে' স্থলে 'জো', 'সে' স্থলে 'সো' এবং বাঙলা অতীত কাল বোধক-'ইল' তিঙের পরিবর্তে-'ইউ' অথবা '-উ' যেমন 'জাইউ' 'করউ' প্রভৃতি কিছু কিছু সৌরসেনী অপভ্রংশের রূপ থেকে গেছে।

অধিকন্তু, তার সাথে 'দেখিল', 'উভিল', 'ভইলি', 'সুতেলি' প্রভৃতি বাঙলা রূপও ফুটে উঠেছে। 'বেগেঁ', 'আলিএঁ-কালিএঁ' প্রভৃতিতে প্রাচীন 'এন'-এর ভগ্নাংশ যেমন দেখা গেল, তেমন 'জোইর', 'পাটের', 'ডোম্বী-এর প্রভৃতিতে খাঁটি বাঙলার সম্বন্ধের রূপ 'র'-ও দেখা দিয়েছে।

এসব দিক বিবেচনা ক'রে, কারও মনে 'চর্যাপদ'গুলোর ভাষা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকল না যে, এ-ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষা। কারণ,

*বাংলা-ভাষাব ইতিবৃত্ত, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৮, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, "গৌড়ী প্রাকৃত ও বাংলা", পৃ: ৩০—৩২।

এই ভাষায় মধ্য-ভারতীয় আর্য-ভাষার দ্বিত্বব্যঞ্জন-ধ্বনিগুলি পূর্বস্বরকে দীর্ঘ ক'রে দিয়ে লোপ পেয়েছে, যেমন—

সং-বৃক্ষ > রুক্‌খ > রূখ [চর্যা-২]
সং-ভক্ত > ভত্ত > ভাত [চর্যা-৩৩]
সং-বর্ণ > বন্‌ণ > বান [চর্যা-২১]
সং-ধর্ম > ধম্ম > ধাম [চর্যা-২২]

সম্বন্ধের বিভক্তি -'র', '-এর'; কর্মের অনুসর্গযুক্ত বিভক্তি '-অন্তরে' [তোহোর **অন্তরে** ছাড়ি নড়এড়া—১০]; করণের অনুসর্গযুক্ত বিভক্তি '-লই' [মোহভণ্ডার **লই** সঅলা অহারী—৩৬]; অধিকরণের আধুনিক বিভক্তি '-এ' [এক সে শুণ্ডিনী দুই **ঘরে** সান্ধঅ—৩, এ তৈলো**এ** এতবি ষারা-৩০] থাকা সত্বেও অনুসর্গযুক্ত বিভক্তি '-অন্ত>-ত [সাঙ্কমত চড়িলে দাহিণ বাম মা হোহী--৫]; অতীত কালের তিঙ্‌-'ইল' [**চলিল** কাহ মহাসুহ সাঙ্গে—১৩, নানা তরুবর **মৌলিল** রে গঅনত লাগেলী ডালী—২৮], কর্মভাববাচ্যে ভবিষ্যৎ কালের তিঙ্‌-'ইব' [জই তুম্‌হে লোঅ হে **হোইব** পারগামী—৫। গিরিবর সিহর-সন্ধি সইসন্তে সবরো **লোড়িব** কইসে—২৮]; নিষ্ঠান্ত অতীত কালের পদ অতীত কালের অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত-'ইআ' [মণিকুলে **বহিয়া** ওড়িআণে সমাঅ--৪, ডোম্বী **বিবহিআ** অহারিউ জাম--২৯]; ভাবার্থক অসমাপিকা রূপে ব্যবহৃত তিঙ '-ইলে' [মাঙ্গত **চড়িলে** চউদিস চাহঅ—৮] ইত্যাদি, ইত্যাদি একমাত্র বাঙলা-ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি এদের পূর্বযুগের বৈশিষ্ট্য-গুলিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের স্থান ক'রে নিয়েছে। অধিকন্তু, চর্যাগীতির বহু বাগ্বিধিও যে খাঁটি বাঙলা তার মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছি "ধরণ ন জাই" [দুলি দুহি পিটা **ধরণ ন জাই**—২], "কহণ ন জাই" [মোহোর বিগোআ **কহণ ন জাই** --২০]; এতদ্ব্যতীত, "গুণিআ লেহু" [চ·১২] "উঠি গেল" [চ.৪৭] "নিদ গেল" [চ,২] ইত্যাদি ইত্যাদি,। তা ছাড়া খাঁটি বাঙলা প্রবাদও এতে রয়েছে, যেমন—"অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী" [চ,৬], হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী" (চ,৩৩--বাঙলা প্রবাদ—হাড়িতে ভাত নাই, নাঙ্গে ঢেলাচেছ,' আবেশিক>আবেশী—বেশ্যার প্রণয়ী], "সুণ গোহালী কিমো দুটঠ বলন্দেঁ" [চ,৩৯] ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ ছাড়া, চর্যাগীতিগুলিতে নদীমাতৃক বাঙলা দেশের একটা সুন্দর ছবিও ফুটে উঠেছে। নানাবিধ নৌকার নাম, যেমন—'নাব', নাবী',

'নাবড়ি', 'ভেলা' প্রভৃতি ; নৌকার অংশ, গড়ন ইত্যাদির নাম, যেমন 'কেড়ু-আল', 'খুন্টি', 'কাচ্ছি', 'মাঙ্গ' (পাছা), 'পতবাল', 'নাহী' (নাভী নৌকার হাল), দাঁড় ফেলে গুণ টেনে নৌকা চালানোর উপমা ইত্যাধি নানা চর্যায় দেখা যায় ; খেয়াঘাট ও পারানির কথাও কোন-কোন চযায় আছে। গান-গুলোতে বাঙলাদেশের একটা সুন্দর আবহও বর্তমান রয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা যে বাঙলা, এখন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এ-বাঙলা যে বাঙলা-ভাষার প্রাথমিক অবস্থা, তাও সর্বস্বীকৃত সত্য। এতৎ-সত্ত্বেও, হিন্দীভাষী ও মৈথিলীভাষী, উড়িয়াভাষী ও অহমিয়া ভাষীদের কেউ কেউ চর্যাপদকে তাঁদের ভাষার আদি নিদর্শন ব'লে দাবি তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দীভাষী ও মৈথিলীভাষীদের দাবি একান্তই অযৌক্তিক। তবে, উড়িয়া ও অহমিয়া ভাষীদের দাবী সম্পূর্ণ না হোক, অন্ততঃ আংশিক ভাবে স্বীকার করতে হয় এ জন্য যে, বাঙলা, উড়িয়া ও অহমিয়া-ভাষা গোড়ায় এক ভাষা ছিল। এখন থেকে প্রায় ৮০০ আট শত বছর আগে 'উড়িয়া'-ভাষা এবং প্রায় ৬০০ ছয়শত বছর আগে অহমিয়া ভাষা বাঙলা-ভাষা থেকে পৃথক্ হ'য়ে ভিন্ন রূপে বিকশিত হয়। সুতরাং, চর্যাপদে উড়িয়া ও অহমিয়াদের দাবি উভয়ের সাধারণ উত্তরাধিকার হিসাবে স্বীকার্য। তা হ'লেও, উড়িয়া-ভাষা চর্যাপদের সূত্র ধ'রে এগোয়নি পরবর্তী কালের উড়িয়া-ভাষাই তার প্রমাণ। অহমিয়া ভাষার অবস্থাও কতকটা তাই।

চর্যাপদের ভাষা, ছন্দ, ভাবও সুর ---সবই অনুসৃত হয়েছে বাঙলা দেশে। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অথবা মধ্যভাগে রচিত অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'' পরবর্তী যুগের সহজিয়া গীতি, বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল গান, শ্যামা সঙ্গীত প্রভৃতি আজও এই উক্তির সাক্ষ্য বহন করছে। 'চর্যাপদে' যে-বঙ্গ ভাষার শৈশব কাল কেটেছে, 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' তা কৈশোরে পদাপণ করেছে এবং শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জলিখায়' তা যৌবনোন্মুখ হয়েছে। অতঃপর, 'মনসামঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'রামায়ণ-মহাভারত' প্রভৃতির ভাষায় বাঙলা-ভাষা যৌবন প্রাপ্ত হয়েছে। বাঙলা-ভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় তার কাহিনী অন্যরূপ ; সে আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়।

বুলগেরিয়ার ভাষা

[বাংলা-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে]

সম্প্রতি আমি বুলগেরিয়া ঘুরে এলাম। ওদেশে যাওয়া ঠিক হয়েছিল যাওয়ার প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে। যাওয়ার তারিখ ছিল ৮ই সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৭৫ ইংরেজী।

এবার বিদেশে যাচ্ছি একান্ত একা-একা, বয়সও বেড়ে গেছে বিস্তর,—সত্তরের উপরে তো বটেই। ইউরোপের একটা দেশে যাচ্ছি ব'লে গোড়ায় মনে যে-উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, তা উবে গেল একা যাওয়ার কথাটা ভে'বে। যে-কথা মনে এল, তা হচ্ছে—এ-যাত্রা 'অগস্ত্য-যাত্রা' নয় তো? মরলেও তো কেউ দেখ্‌বার নেই। যে-দেশে যাচ্ছি তার ভাষাও তো জানি নে। যে-দেশে যাওয়া হয়, সে-দেশের ভাষা জানা না থাকলে এবং বুঝতে না পারলে কি যে বিপৎ, ভুক্তভোগী ছাড়া তা আর কাউকে বুঝানো যাবে না। মনটা হঠাৎ আঁৎকে উঠ্‌ল। একটা দোভাষী-ফোভাষী যোগাড় করা যাবে,—এই ভে'বে মনকে প্রবোধ দেওয়া হ'ল।

ভাষার প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে ছোট বেলা থেকে, যার ফলে ইংরেজী, বাংলা, আরবী ও ফারসী ভাষায় কিছু-কিছু জ্ঞান ছাড়া, আরও প্রায় আধ ডজনখানি ভাষার (যেমন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া, আসামী প্রভৃতির) সাথে ভাসাভাসা পরিচয়ও যে নেই, তা নয়। এবার বুলগেরীয়-ভাষার সাথেও নতুন ক'রে পরিচয় হবে,—সে পরিচয় যতই সামান্য হোক,—এটাও আমার আতঙ্কগ্রস্ত মনে একটা সান্ত্বনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। চট্ ক'রে মনে পড়ল ১৯৬৬ সালের জুন মাসে চীন ভ্রমণের কথা। তখনও চীনা-ভাষাটা অল্প-স্বল্প শেখার ইচ্ছা ছিল,—চেষ্টাও যে ছিল না, তা নয়। তবু, ২৭ দিন ওদেশে থেকেও তার দু-চারটা বাক্য ছাড়া আর কিছু শিখতে পারি নি। এমনি অদ্ভুত সে-ভাষা। কি জানি, এবার বুলগেরীয়-ভাষা কেমন হয়। মনে মনে তৈরী হ'য়ে রইলাম,—ভাষাটার খোঁজ-খবর নিতে হবে।

বুলগেরিয়া পৌঁছে কেবল উৎকর্ণ হয়েই ছিলাম। ও-ভাষার কিছু বুঝি কি না, তার চেষ্টা চলল; কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না। প্রথম দিনে বোঝার মতো কেবল একটা কথাই কানে এল। তা হচ্ছে "বখ্‌শীশ্‌ যার মানে হচ্ছে ইংরেজীতে 'টিপ্‌' (tip)। বুলগেরিয়ার রাজধানী সফিয়া শহরের বিমান-বন্দর থেকে এ-নগরীর সর্বোত্তম এলাকায় (posh area) অবস্থিত 'সফিয়া হোটেলে' পৌঁছে দোভাষিণী (Interpreter) গৃহিণী এ্যান্ন (Mrs. Ann) আমায় ইংরেজীতে বল্লেন, আমি যেন হোটেলের কাউকেও 'বখ্‌শীশ্‌' না দি। কারণ, বুলগেরিয়ায় কাউকেও 'বখ্‌শীশ' দেওয়ার রেওয়াজ নেই। আমি বল্লাম, "আপনি কি 'বখ্‌শীশ, অর্থে ইংরেজী 'টিপ্‌' বোঝাচেছন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ"। আমি বল্লাম, "তা হ'লে কি ফার্‌সী ভাষার এই শব্দটি বুলগেরীয়-ভাষায় ব্যবহৃত হয়?" বল্লেন, "হাঁ" আর একদিন হঠাৎ আর এক শব্দ শুনতে পেলাম 'শাতানা'। মনে হ'ল আমরা যে অর্থে 'শয়তান' বলি সে-অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। জেনে নিলাম আমার আন্দাজ ঠিক। তৃতীয় শব্দ 'মাসা' বার বার কানে এল। বুঝতে পারলাম, আমরা বাংলায় যাকে 'টেবিল' বলি, তাই বুল-গেরীয়-ভাষায় 'মাসা' হ'য়ে আমার কাছে দুর্বোধ্য হয়েছে। আসলে শব্দটি ফার্‌সী 'মেজ', যাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার করছি দেদার।

শব্দ তিনটি শুনে ভাবলাম,---'বখ্‌শীশ্‌', ও 'মাসা' খাস ফার্‌সী এবং 'শাতানা' খাস আরবী 'শয়তান' শব্দের বিকৃতি, যার মূলে হচ্চে হিব্রু 'সাতান'। এ-সমস্ত শব্দ বুলগেরীয়-ভাষায় ঢুক্‌ল কি করে? আশ্চর্য হবারই কথা। আসলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বুলগেরিয়া পাঁচ শতাব্দী ধ'রে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। আরবী, ফার্‌সী ও তুর্কী-দের মধ্যস্থতায় ওদের ভাষায় প্রবেশ করা খুবই প্রত্যাশিত, যেমন আমরা বাঙালীরা পেয়েছি ও-রকম বেশ কিছু শব্দ তুর্কী, মুঘল ও পাঠানদের মধ্যস্থতায়।

এর একটা মৌল-কারণ রয়েছে: বিজয়ীরা বিজিতের ভাষা খুব সহজে গ্রহণ করে না; বরং বিজিতের উপর বিজয়ীদের ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ-কথা আমরা হাড়ে হাড়েই বুঝেছি। তাইতে, এখনও আমাদেরকে ইংরেজীর জোরেই বিদেশে কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে, আর দেশেও ইংরেজী শব্দ ও বুলির সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার নানা কথা প্রকাশ ক'রতে হচ্ছে।

'সম্রাজ্যবাদ' শুধু একটা রাজনৈতিক বুলি নয়, ভাষিক কথাও বটে। কেননা, ভাষার জগতেও 'সাম্রাজ্যবাদ' ছিল এবং এখনও আছে, যদিও তা এখন বিলুপ্তির পথে। স্বদেশ-প্রেমই এই উভয় প্রকার সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাচ্ছে। সুখের বিষয়, রাজনৈতিক-সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটলেই তা ধু'য়ে-মু'ছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়; আর দুঃখের বিষয়, ভাষিক-সাম্রাজ্যবাদের সময় ফুরিয়ে গেলেও ফুরোয় না। বুঝতে পারলাম,—বুলগেরীয়রা আমাদের মতই স্বদেশ-প্রেমিক,—রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ কাটিয়ে উঠেছেন বটে, ভাষিক-সাম্রাজ্যবাদ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবে, মাত্র বিগত ৩১ একত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁরা যেভাবে ভাষিক-সাম্রাজ্যবাদ কাটিয়ে উঠেছেন, আগামী ৫০ পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও আমরা বিদেশী ভাষার সাম্রাজ্যবাদ ও তার প্রভাব তেমনভাবে কাটিয়ে উঠতে পারব কি না, তা শুধু 'আলেমুল গায়েব'-ই জানেন।

বুলগেরিয়ায় এখন শিক্ষার সর্বস্তরে বুলগেরীয়-ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। বুলগেরীয়-ভাষা এখন যে-বর্ণমালায় লিখা হয়, তা হচ্ছে রোমান বর্ণমালারই সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কার সাধিত রূপ। রুশ-ভাষার বর্ণমালাও এইরূপ। বুলগেরিযার শিক্ষিত সমাজ বলেন, তাঁদের বর্ণমালাই রুশ ভাষার জন্য গৃহীত হয়েছিল। তা হ'লে বুঝতে হবে ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে বুলগেরীয় ও রুশীয়—এই দুই ভাষা এক, নতুবা খুব কাছাকাছি। তবে এই দুই জাতি কে কার বর্ণমালা গ্রহণ করেছে, এ-কথা আমি হলফ ক'রে বলতে পারব না। বুলগেরিয়ার লোক রুশ-ভাষা স্কুল-কলেজে দ্বিতীয় ভাষা-রূপে পড়েন। তাই শিক্ষিত বুলগেরীযরা রুশ-ভাষা সহজেই বলতে পারেন। শুনলে মনে হয, এই দুই ভাষা প্রায় এক। ভাষা দু'টির কোনটিতেই আমাদের ভাষার মূর্ধন্য ধ্বনি নেই। সুতরাং, বর্ণমালায় আমাদের 'ট'-বর্গীয় ট, ঠ, ড, ঢ, ণ যেমন নেই, ষ, ড়, ঢ় মূর্ধন্য ধ্বনিও নেই। এঁরা দন্ত্য-বর্ণ ত, থ, দ, ধ, ন দিয়েই 'ট'-বর্গীয় বর্ণের কাজ সেরে ফেলেন। ইংরেজী 'টু'-ধ্বনি যখন এঁদেব মুখে 'তু' হয, তখন শুনতে বড় মিষ্টি লাগে।

ভাষাতত্ত্বের ছাত্র (মার্কিন মুলুক অথবা ঐ জাতীয় অন্য দেশ থেকে আমদানিকৃত নতুন বিদ্যা 'লিঙ্গুইস্টিক্স্' (Linguistics) নামক ভাষাতত্ত্বের নয়) হিসেবে জানতাম, রুশ-ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর 'শতম্'

বর্গভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম। তবে কি বুলগেরীয়-ভাষা রুশ-ভাষার সহোদরা ? 'শত' শব্দকে বুলগেরীয়-ভাষায় কি বলে জানতে চাইলে যখন বলা হ'ল 'স্তো' (Sto), তখন মনে পড়ে গেল 'শত' শব্দের রুশীয় প্রতিশব্দ সেই 'স্তো' (Sto) এর কথা। আগেকার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হ'ল— বুলগেরীয় ও রুশীয় ভাষা দু'টি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর 'শতম্' বর্গের ভাষা। তবে, দুই একটি শব্দে ঐ-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়া যায় না। বুঝলাম, আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

প্রথমে এই পরীক্ষা সংখ্যা শব্দের দ্বারা আরম্ভ করা যাক। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী লোকগুলি এক শত পর্যন্ত যে গুণতে পারতেন, তাতে এখন কারো সন্দেহ নেই।---নইলে আমরা **'শত'** শব্দটির এ-সমস্ত রূপ নিম্নলিখিত ভাষায় পেতাম না, যেমন—

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় 'কম্‌তোম্' (Komtom)

১। লাতিন্ ভাষায় 'কেন্তুম্' (Centum)

২। গ্রীক ভাষায় 'হে-কতোন্' (he-Katon)

৩। গথিক ভাষায় 'খুন্দ' (Khund)

৪। প্রাচীন আইরিশ ভাষায় 'কেৎ' (Cet)

৫। তোখারী ভাষায় 'কন্ধ' (Kandh)

৬। (ক) আর্য (সংস্কৃত) ভাষায় (শতম্) (Satam)
(খ) আর্য (আবেস্তা) ভাষায় (সতোম্) (Satom)

৭। লিথুনীয় ভাষায় 'স্যিম্‌তস্' (Szimtas)

৮। রুশ ভাষায় 'স্তো' (Sto)

৯। বুলগেরীয় ভাষায় 'স্তো' (Sto)

উক্ত 'শত' শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ১ এক থেকে ৫ পাঁচ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার ভাষাগুলিতে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'ক'-ধ্বনিটি উচ্চারণে ঠিকই আছে, অথচ ৬ ছয় থেকে ৯ পযন্ত ক্রমিক সংখ্যার ভাষায় এই 'ক'-ধ্বনিটি 'শ' বা 'স' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এ-ভাবেই মূল ভাষা থেকে অন্য ভাষাগুলির বিবর্তনের গোড়াতেই ভাষাগুলি

দুই রকমে বিবর্তিত হ'য়ে দুই বর্গে ভাগ হ'য়ে গিয়েছিল। তার এক বর্গের নাম দেওয়া হয়েছে 'কেন্তুম্', এবং আর এক বর্গের নাম দেওয়া হয়েছে 'শতম্'। এখন নিঃসঙ্কোচে বলতে পারা যায়, **বুলগেরীয়-ভাষা 'শতম্'-বর্গের** ভাষা।

বলা বাহুল্য, বাংলা-ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর 'শতম্'-বর্গের ভাষা। কেননা, আমরা আর্য (সংস্কৃত) ভাষার 'শতম্'-শব্দকে 'শ' অথবা *'শত' বলি এবং আমাদের ভাষা এই মর্মে আর্য ভাষা থেকেই বিবর্তিত হয়েছে।* আমি ভে'বে আনন্দ পেলাম,—ভাষার দিক থেকে বুলগেরীয় ও বাঙালীরা বেশী না হোক, কমপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ আড়াই হাজার বছর আগে এক ছিল। আরও লক্ষ্য করলাম, সংখ্যায় অল্প হ'লেও, বুলগেরিয়ায় কাল বর্ণের লোক আছে, যেমন বাংলাদেশে কাল বর্ণের লোকের সংখ্যা অনেক বেশী হ'লেও গৌরবর্ণ লোকও রয়েছে। এখানে মনে রাখা উচিত যে, একই ভাষাভাষী লোক হ'লেই যে তাঁদের গায়ের রঙ্ এক হবে, এমন ধারণা ঠিক নয়।

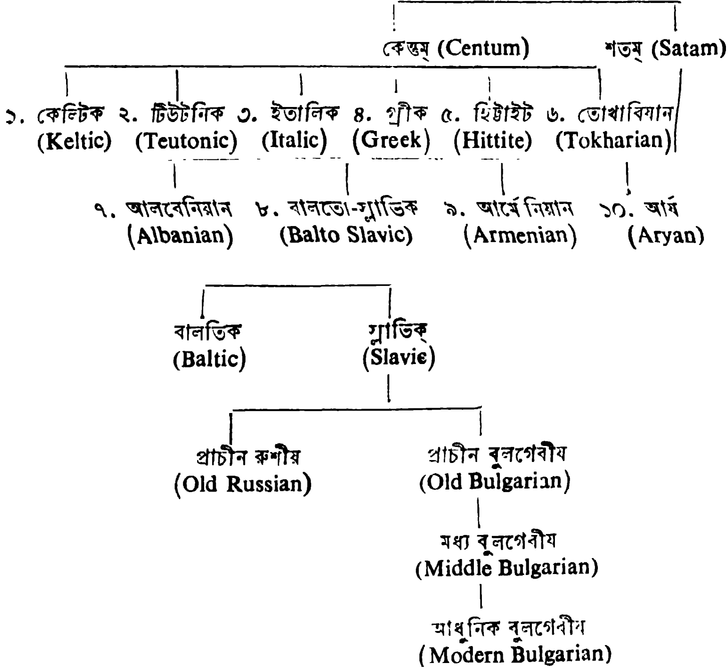
বুলগেরিয়ার ভাষা-সম্বন্ধে কৌতূহল জে'গে উঠ্‌ল বেশি ক'রে। খোঁজ-খবরও নিতে লাগলাম। সফিয়া-বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলে পর, এ-বিষয়ে ওখানকার ভাষাতত্ত্ব বিভাগের লিঙ্গুইস্টিক্স্-শাখার মুখ্য অধ্যাপকের সাথে আমার আলাপ হ'ল। তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) জানেন না ; আর আমি আধুনিক উচ্চারণ-কসরতী শাস্ত্রে (Phonetics= Linguistics-এ) অজ্ঞ। সুতরাং, আলাপটা ভাল ক'রে জম্‌ল না। তবে, তাঁর কাছ্ থেকে শুনে এলাম,—বুলগেরীয় ও রুশীয়-ভাষা 'স্লাভিক'-ভাষা থেকে উৎপন্ন। সুতরাং, উভয়ভাষার স্বর ও ব্যবঞ্জন-ধ্বনি একরূপ হ'তে বাধ্য। মনে হ'ল, বুলগেরীয়দের সংস্কারসাধিত রোমান বর্ণমালা রুশীয়-ভাষা লেখার জন্য ব্যবহৃত হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। এখন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বর্তমান বুলগেরীয়-ভাষার বংশ-লতিকা এভাবে তৈরি করা আমার পক্ষে অনেকটা সহজ হ'য়ে গেল,—

বুলগেরীয়-ভাষার বংশ-লতিকা

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা

(Indo-European Languages)

(খ্রী. পূ. ৩০০০-২৫০০)



উক্ত বুলগেরীয়-ভাষার বংশ-লতিকাটির প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়, যেখানে এসে 'স্লাভিক'-ভাষার জন্ম হ'ল, তার বহু পরেই প্রাচীন রুশীয় ও প্রাচীন বুলগেরীয়-ভাষা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। দেশের মানুষকে খ্রীস্টান ধর্মের সাথে পরিচিত ক'রে তুলবার জন্য যে-সমস্ত বুলগেরীয় পাদ্রী গীর্জায় ব'সে বাইবেলের অনুবাদ ও ধর্মীয় পুস্তকাদি লিখতে গিয়ে বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সহজতর স্লাভিক-ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হন, তাঁরাই বুলগেরীয়-ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এদেশের গীর্জায় অনুশীলিত এই লৌকিক স্লাভিক-ভাষাকে "প্রাচীন বুলগেরীয়" (Old Bulgarian) অথবা "গীর্জাই স্লাভিক" (Church Slavic)

নামে অভিহিত করা যায়। ভারতীয় আর্য-ভাষার বিবর্তনের দিক থেকে ভাব্‌লে 'স্লাভিক'-ভাষাকে আর্য-ভাষার 'প্রাকৃত' অবস্থার সাথে তুলনা করা চলে এবং বুলগেরীয় গীর্জায় পাদ্রীদের দ্বারা অনুশীলিত 'স্লাভিক'-ভাষাকে "প্রাচীন বুলগেরীয়" (Old Bulgaria) ভাষা নামে চিহ্নিত করা যায়।

এই "প্রাচীন বুলগেরীয়" ভাষাই মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেমন হয়েছে 'চর্যাপদের' প্রাচীন-বাংলা মধ্যযুগের অবস্থা কাটিয়ে আধুনিক যুগে উপস্থিত। দেখা যায়, খ্রীস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বুলগেরিয়ার গীর্জায় বসে যে-সমস্ত পাদ্রী বুলগেরীয়-দিগকে বুঝানোর জন্য ওঁরা বুঝতে পারেন এমন 'স্লাভিক'-ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করছিলেন ও খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থ লিখছিলেন, সেই ভাষাই হয়েছে বর্তমানে বুলগেরীয়-ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। আর, বাংলা-ভাষার প্রাচীন-তম নিদর্শন হচ্ছে 'চর্যাপদ'।

এখানে এ কথাও উল্লেখ করতে হয় যে, বৌদ্ধ-অবধুতেরাই চর্যাপদের গানগুলি রচনা করেছিলেন খ্রীস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ধর্মীয় প্রেরণা ও রচনা-কালের দিক দিয়ে 'প্রাচীন-বাংলা' ও 'প্রাচীন-বুলগেরীয়' একেবারেই সমপর্যায়ের। খ্রীস্টীয় নবম থেকে নিয়ে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চার শ' বছর ধ'রে যাঁরা স্লাভিক'-ভাষার উপাদানে বুলগেরীয়-ভাষার ভিত্তি পত্তন করছিলেন, তাঁদের মধ্যে যতগুলি প্রকৌশলী ছিলেন, তাঁদের ভিতর থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে যাঁদের নাম করতে হয়, তাঁরা হচ্ছেন সেণ্ট্ সাইরিল্ (St. Cyril) ও সেণ্ট্ মেথোদিউস্ (St. Methodius) নামক দুজন বিশপ্ (Bishops)। বুলগেরীয়-ভাষা এঁদের দান কখনও ভুলতে পারবে না, যেমন কখনও ভুলতে পারবে না বৌদ্ধ অবধূতদের কথা বাঙালী।

আগেই বলেছি, "প্রাচীন-বুলগেরীয়" ভাষা 'স্লাভিক'-ভাষা থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। "আধুনিক-বুলগেরীয়" ভাষাও "প্রাচীন-বুলগেরীয়" ভাষারই বিবর্তিত রূপ। সুতরাং, "আধুনিক-বুলগেরীয়" ভাষায় 'স্লাভিক উপাদান অত্যধিক হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষার 'শব্দসম্পদের' (Vocabulary) আলোচনার সাহায্যে কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে।

কি ক'রে এ কাজটি মোটামুটি সমাধা করা যায়, তাই ভে'বে হিম্‌শিম্ খেয়ে গেলাম। ভাষায় কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই; অক্ষরও সব ক'টা

চিনি নে; ভাষা শুনেও বুঝতে পারি নে; উপায় কি? অগতির গতি—একমাত্র ভরসা আমার দোভাষিণী গৃহিণী এ্যান্ন (Mrs. Ann) এবং তাঁর সঙ্গিনী কুমারী য়োতোভা (Miss Yotove)। ঠিক করলাম এঁদের সাহায্য নিতে হবে। এঁদেব সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রে বুঝতে পাবলাম,—বুলগেরিয়ার ভাষা শব্দ-সঙ্করের সমষ্টি। এই সমষ্টি তুর্কী, গ্রীক, রুমানীয় ও আলবেনীয় উপাদানে গঠিত। ইতিমধ্যেই ওদেশের কথায় লুকানো তুর্কী উপাদানের সাথে আমি পরিচিত হয়েছি এবং তা হচ্ছে 'বখ্‌শীশ্', সাতানা' ও 'মাসা'। গ্রীক্ উপাদানও রয়েছে প্রচুর, যেমন—

বুলগেরীয়	অর্থ	গ্রীক
আঙ্গেল (Angel)	দেবতা	এঙ্গেলস্ (Anggelos)
কামিলা (Kamila)	উট	ক্যামেলস্ (Camelos)
দ্যাভোল (Dyavol)	পিশাচ	দিযাবোলস্ (Diabolos)

রুমানীয় ও আলবেনীয় শব্দও কম নয়। তবে এই সমস্ত বিদেশী উপাদানে গঠিত আধুনিক বুলগেরীয়-ভাষায় কোন্ উপাদানের অনুপাত মূল 'স্লাভিক' ভাষায কত, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, বুলগেরীয়-ভাষার শব্দ-সম্পদে আর্য (সংস্কৃত) ভাষার ছাপ খুবই সুস্পষ্ট। অনুপাতে আর্য (সংস্কৃত) ভাষার ছাপবাহী শব্দের সংখ্যা গ্রীক্ প্রভাবিত শব্দ-সংখ্যার কম হবে ব'লে মনে হয না। বলাবাহুল্য, আর্য (সংস্কৃত) ভাষার সাথে বুলগেরীয় ভাষার এই যোগ ঘনিষ্ঠ বলেই বাংলা-ভাষার সাথেও বুলগেরীয় ভাষার একটা সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবে স্থাপিত হ'য়ে গেছে। নিম্নে তার উদাহরণ দিচ্ছি—

আর্য (সংস্কৃত)	বাংলা	বুলগেরীয়
ভগ (বান)	ভগবান	বগ (Bog)
নভস্-নভঃ	নভ	নেভে (Neve)
দিন	দিন	দেন (Den)

আর্য (সংস্কৃত)	বাংলা	বুলগেরীয়
নিশীথ	নিশী (রাত)	নশ্‌ৎ (Nosht)
অধস্‌-অধঃ	×	আদ্‌ (ad) ['নরক' অর্থে]
অস্ত্র	অস্‌তর, অস্‌তুরা	স্ত্রেলা (Strela) ['তীর' অর্থে]
অগ্নি	আগুন	আগন (Agan)
বলাহক	বলাহক (মেঘ)	অবলাক (Oblak)
মাংস	মাঁস (কলাই)	মেসো (Meso) (=meat)
বৃষ	বিরিষ, ষাঁড়	বিক (Bik) (ষ=ক)
লক্ষ্	×	ল্যুক্ (Lâk) (=bow)
×	গুড়ুম্	গ্র্যুম্ (Grâm=Thunder)

বুলগেরীয়-ভাষার সংখ্যাবাচক শব্দগুলোর সাথে আর্য-ভাষার সংখ্যা-বাচক শব্দগুলোর যোগ এখনও প্রায় একরূপ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক মিল দেখা যাচ্ছে, তা বাংলা-ভাষায় একটা ধারণাতীত ব্যাপার। উদাহরণ দিচ্ছি—

আর্য (সংস্কৃত)	বাংলা	বুলগেরীয়
একঃ	এক, এ্যাক্	এদ্‌নো (edno)
দ্বি	দুই, ব, বা, বে	দে (dve)
ত্রি	তিন, তে, তি	ত্রি (tri)
চতুর=চতুঃ	চার, চু, চৌ	চেতিরি (chetiri)
পঞ্চ	পাঁচ, পঁচ, পঁয়	পেৎ (pet)
ষষ্‌+ত=ষষ্ঠ	ছ, ছা, ছে, ছি	শেস্ত্ (shest)
সপ্ত=সপ্তন্	সাত	সেদেম্ (sedem)
অষ্ট=অষ্টন্	আট	অসেম্ (osem)
নব=নবন্	নয়, উন	দেবেৎ (devet)
দশ=দশন্	দশ	দেসেৎ (deset)

উক্ত সংখ্য' শব্দে ধ্বনিতাত্ত্বিক মিল প্রায় একরূপ হ'লেও, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। তবে, সবগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তথাপি, আনাড়ী-ধরনের একটা ব্যাখ্যা নীচে দেওয়া হ'ল।

আর্য (সংস্কৃত) 'একঃ' শব্দ বুলগেরীয়-ভাষায় কিভাবে 'এদ্‌নো' হ'ল বুঝতে পারা গেল না। তবে, শব্দটির গঠনে আর্য ভাষায় (এ+ক্‌+অ+ঃ) যেমন চারটি বর্ণ আছে, বুলগেরীয়-ভাষায়ও (এ+দ্‌+ন্‌+ও) চারটি বর্ণই আছে; তন্মধ্যে দুই ভাষাতেই 'এ'-বর্ণটি সাধারণ।

লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল, আর্য (সংস্কৃত) ভাষার 'দ্বি', 'ত্রি', 'চতুর' অবিকল মূলরূপ নিয়েই বুলগেরীয়-ভাষায় বর্তমান। দেখা যাচ্ছে আর্য (সংস্কৃত) 'পঞ্চ', গ্রীক 'পেন্তে' (pente) বুলগেরীয়-ভাষায় 'পেৎ'। পাঁচের বেলায় বুলগেরীয় 'পেৎ' গ্রীক্‌-ভাষার কাছাকাছি। ছয়ের বেলায় আর্য (সংস্কৃত) পূরণবাচক ষষ্‌+ত(=ষষ্ঠ) থেকে 'শেস্ত্‌' (Shest) হয়েছে। সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ গুলিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। 'সাতের' বেলায় আর্য (সংস্কৃত) পূরণবাচক 'সপ্তন্‌' বুলগেরীয়-ভাষায় হয়েছে 'সেদেম্‌' (sedem)। দেখা যাচ্ছে, 'সপ্তম' শব্দের 'প্‌' লোপ পেয়েছে এবং তৎসংযুক্ত বর্গের প্রথম বর্ণ 'ত' পরিণত হয়েছে বর্গের তৃতীয় বর্ণ 'দ'-ধ্বনিতে। 'অষ্টম'-এর 'ট'-লোপে বুলগেরীয় রূপ 'অসেম'; পরিবর্তন খুব গুরুতর নয়। আর্য সংখ্যাবাচক 'নবন্‌' হয়েছে বুলগেরীয় 'দেবেৎ'। 'নবন্‌' শব্দের শব্দাদ্য স্বরযুক্ত 'ন' (=ন্‌+অ) হয়েছে 'দে'=(দ্‌+এ) এবং শব্দান্ত্য 'ত্‌'=ৎ। দুইটি বর্ণই একই বর্গের বটে। আর্য (সংস্কৃত) 'দশন্‌' বুলগেরীয়-ভাষায় হয়েছে 'দেসেৎ' (deset) এতে বিশেষ গোলমাল নেই— দ='দে', শ='সে' এবং ন্‌='ৎ'।

বুলগেরীয় ভাষায় দশের পরবর্তী সমস্ত সংখ্যা-শব্দ আর্য (সংস্কৃত) রীতির সংখ্যা-শব্দের অনুরূপ অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা-শব্দটির সাথে 'দশ' শব্দটি যোগ ক'রে পূর্ণ সংখ্যাটি গঠিত হয়েছে। নিম্নে উদাহরণ দিচ্ছি:—

আর্য (সংস্কৃতি)		বুলগেরীয
বিংশতি=দ্বি+দশতি		দ্বেদেসেৎ (dvedeset)
ত্রিংশৎ=ত্রি+দশৎ		ত্রিদেসেৎ (trideset)
চত্বারিংশৎ=চত্বার+দশৎ		চেতিরিসেৎ (chetiriset)
পঞ্চাশৎ=পঞ্চ+দশৎ		পেদেসেৎ (pedeset)
ষষ্ঠি=ষষ্‌+দশতি		শেইসেৎ (sheiset)
...	...	...
শতম্‌		স্তো (sto)

আধুনিক বাংলা-ভাষার মতো আধুনিক বুলগেরীয়-ভাষায়ও লিঙ্গের সংখ্যা তিন, যেমন—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ। তবে, বাংলা-ভাষার ন্যায় জৈবিক ভিত্তিতে এই ভাষায় লিঙ্গ নির্ণীত হয় না। এর লিঙ্গ ঠিক করা হয় শব্দের গঠন-ভিত্তিতে। এদিক থেকে আর্য (সংস্কৃত) ভাষার সাথে বুলগেরীয় ভাষায় যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। বুলগেরীয়-ভাষায় 'আ'-কারান্ত শব্দ মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক, যেমন—'স্ত্রেলা'=ধনুক, 'মাসা'=টেবিল; 'সিস্ত্রা'=ভগ্নী এবং ব্যঞ্জনান্ত শব্দ মাত্রই পুংলিঙ্গবাচক, যেমন— ''স্তল'= চেয়ার; 'অবলাক'=মেঘ; 'কন'=ঘোড়া ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। 'লতা', 'শাখা', 'তারা' প্রভৃতির ন্যায় আর্য (সংস্কৃত)-ভাষার 'আ'-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দগুলির প্রভাবটুকুই বুলগেরীয়-ভাষার স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দে অবশিষ্ট রয়েছে ব'লে মনে করার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। তবে, এ-ভাষা আর্য ভাষার আভিধানিক লিঙ্গ কাটিয়ে উঠেছে।

বুলগেরীয়-ভাষার সর্বনাম শব্দে একটা অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। তা হচ্ছে, ব্যক্তিবাচক নাম পুরুষের এক বচনে স্ত্রী ও পুংলিঙ্গের জন্য পৃথক্ রূপ। বুলগেরীয়-ভাষায় বাংলা 'সে' পুংলিঙ্গের জন্য ''তোই'' (toi) এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ''ত্যা'' (tya) রয়েছে। ব্যাপারটি ইংরেজী ভাষায় He এবং She শব্দকে স্মরণ করায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চট্টগ্রামী উপভাষার নামপুরুষের একবচনের সর্বনাম 'হিতে' (পুং) 'হিতী' (স্ত্রীং) অথবা 'তে' (পুং) 'তেই' (স্ত্রীং) রূপগুলির কথাও মনে করিয়ে দেয়। এই রূপগুলির সাথে আর্য (সংস্কৃত) ভাষার 'তদ্' শব্দেব পুলিঙ্গের ''সঃ'' এর স্ত্রীলিঙ্গের ''সা'' রূপগুলোর কথাও ভোলা যায় না।

সে যাই হোক, বর্তমান বুলগেরীয়-ভাষার প্রায় সবটুকুই প্রাচীন বুলগেরীয়-ভাষার জটিলতা ত্যাগ ক'রে বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) হ'য়ে পড়েছে, যেমন বিশ্লেষণাত্মক হ'য়ে গেছে বর্তমান বাংলা-ভাষা। জীবন্ত ভাষার এই পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলা ও বুলগেরীয় ভাষা জীবন্ত। সুতরাং, এ-দুভাষার ভাবী বিবর্তন বিশ্লেষণাত্মক পথেই এগিয়ে চলবে।

পরিভাষা

বর্তমান বাংলাদেশে বাঙালীরা তাঁদের ভাষা নিয়ে যে বেশ কিছুটা মাথা ঘামাচ্ছেন,—না ভুল বলা হ'ল,—বাধ্য হ'য়ে তাঁদেরকে নিজের ভাষা সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হচ্ছে, তা' বেশ ভাল করেই টের পাওয়া যায়, আপিস-আদালতের চিঠিপত্রে ব্যবহৃত বাংলা নম্বরে, নানা সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার বাংলা নিমন্ত্রণ পত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাংলা সিল-মোহরে, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সমস্ত শহর-বন্দরের দোকান-পাটের বাংলা 'সাইন বোর্ডে' বা নামফলকে। বাংলাদেশে বাংলার মতো একটি মাত্র অত্যুন্নত ভাষা বর্তমান থাকতে, এদেশের প্রশাসন, শিক্ষার মাধ্যম, আইন-আদালত প্রভৃতির ভাষা যে বাংলা হবে, এই কথার স্বীকৃতির জন্য সরকারী ঘোষণার আবশ্যক হয় না। কিন্তু, ঐতিহাসিক ঘটনার বিবর্তনে এই হতভাগ্য দেশে তাও করতে হয়েছে।

এতদিন বাংলা-ভাষা ছিল আমাদের কাছে একটা অশ্রদ্ধেয় ঘরোয়া ভাষা, অথচ রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত একটা অতি জরুরী জিনিস। এ-ভাষায় আমাদের অধিকাংশের কোন দিনই আস্থা ছিল না, তবে নাক সিট্‌কানো আত্মীয়তা ছিল। আন্তরিক সহানুভূতির ঐকান্তিক অভাবের কথা তো না বল্লেই চলে। তাই, স্বাধীনতার পর বাংলা যখন রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হ'ল ব'লে বিঘোষিত হ'ল, তখন যারা এদ্দিন মুখে বাংলার বুলি কপ্‌চিয়ে লোককে ভাঁওতা দিয়ে মনে মনে কৌতুকবোধ করতেন, আর ভাবতেন, বাংলা ? সে আবার কি ? এ-সব তো 'বাত্‌কে বাত্‌'—কথার কথা। এবার তাদের চক্ষু চড়ক গাছ হ'ল। তাঁরা দেখলেন, এবার সত্যি-সত্যি পালে বাঘ পড়েছে। তাই, শিক্ষিত সমাজই চেঁচামেচি ক'রে উঠল জোরে। কারণ, এতে ক'রে তাদের আঁতেই ঘা লাগ্‌ল বেশী। তাঁদের মধ্যে যারা ছিলেন ভীতু, তাঁরা চেপে গেলেন, আর যাঁরা ছিলেন যৎকিঞ্চিৎ সাহসী ও বুদ্ধিমান, তাঁরা লোকদেখানো সুরে বলে উঠলেন, "যা চাচ্ছিলাম,

তা এদ্দিনে হ'ল। ইস্কুল-কলেজে, আপিস-আদালতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবার বাংলা-ভাষা চালু হবে। তবে, ভাব্‌ছি আপিস-আদালতে ব্যবহৃত ইংরেজী Technical Term-গুলি নিয়ে কি করি। এগুলির বাংলা পরিভাষা চাই। তা ছাড়া আপিস-আদালতে যে হাজার হাজার বাংলা মুদ্রাক্ষর-যন্ত্র বা ছাপাক্ষর আবশ্যক তারও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে, কি ক'রে কাজ চালানো যাবে?" তাঁরা ভাবলেন ও ভাবছেন, যে-সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, তার জটিলতার জট খু'লে এ-সমস্যার সমাধান সত্বর সম্ভব নয়। আসলে তার সমাধান খুঁজে বার করা হয়েছে অনেক আগে। এঁরা ইচ্ছা করেই তার খবর নিচ্ছেন না। তাঁরা আঁক্‌ড়ে ধ'রে আছেন ইংরেজী-ভাষা, আর ভাব্‌ছেন, এমন ক'রেই অন্ততঃ তাঁদের দিন তো কেটে যাবে। এঁরা স্বার্থপর, এঁরা নিজের কথা ছাড়া কিছুই ভাবেন না, ভাবতে পারেনও না।

দেশের গণমানব বাংলা মুদ্রাক্ষর-যন্ত্রেরও খবর রাখে না, বাংলা পরিভাষা তৈরিরও তোয়াক্কা করে না। প্রকৃতপক্ষে, তারাই বাংলা-ভাষার মূল ধারক ও বাহক। তাদের কাজ চালাবার মতো প্রয়োজনীয় পরিভাষা তারা নিজেরাই তৈরি ক'রে নিয়েছে ও নিচ্ছে। তারা কত রকমের পরিভাষা যে এরই মধ্যে তৈরি ক'রে ফেলেছে, আমরা আজও তার খবর রাখি না। তার নমুনা দেশময় ছড়িয়ে আছে। এ-গুলিকে লৌকিক পারিভাষিক শব্দ ব'লে উল্লেখ করতে হয়। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যে-নীতির উপর ভিত্তি ক'রে দেশের অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত গণমানব এই লৌকিক পারিভাষিক শব্দগুলি সৃষ্টি ক'রে চলেছে, পণ্ডিত সমাজের অবগতির জন্য নীচে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

১। প্রথম নীতি হচ্ছে, অনুবাদ-নীতি। এরা শিক্ষিত লোক নয়। তাই বৈজ্ঞানিক অনুবাদের ধার ধারে না। যে-বস্তুর যে-কাজ অথবা অন্যবস্তুর কাজের মত যে-বস্তুর কাজ, কতকগুলি শব্দের অনুবাদের পশ্চাতে তার প্রভাব দেখা যায়, যেমন—

Aeroplane	— উড়োজাহাজ	Submarine	— ডুবো জাহাজ
Motor Car	— হাওয়া গাড়ি	Radio	— বেতার
Flight	— উড়াল	Contractor	— ঠিকাদার

২। দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে, স্বীকরণ-নীতি। কোন বিদেশী শব্দকে আত্মস্থী-করণের ক্ষমতা এদের অসাধারণ। বিদেশী শব্দে ব্যবহৃত বিদেশী ধ্বনিকে নিজের ভাষার ধ্বনিতে পরিণত ক'রে এরা বিদেশী শব্দকে দেশী শব্দে পরিণত করে অদ্ভুতরূপে, যেমন—

Acting	--- এক্‌টিনি	Engine	--- -ইঞ্জিল
Bomb	--- বোমা	Life-buoy	--- বয়া
Burge	--- বজ্‌রা (নাও)	Pinnace	--- পান্‌সি (নাও)
Canvas	--- কেম্বিস	Treasury	--- তেরজুরি
Gentleman	--- জাণ্ডুমান	General	--- জাঁদরেল
Voting	--- ভোটাভুটি	Torpedo	--- তলপেটা

এ-সব গণমানবের কাজ। ভাল হোক, মন্দ হোক,—এরা নিজেদের অভাব মোচনের জন্য নিজেরা সচেষ্ট হ'যে এ-সব লৌকিক পারিভাষিক শব্দ তৈরি ক'রে নিয়েছে। আর, শিক্ষিত লোকেরা কোন বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দেরও কোন বাংলা শব্দ তৈরি না ক'রে শুধু ইংরেজী, তথা বিদেশী ভাষাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকার চেষ্টা করছেন। পরিভাষার জন্য চেঁচামেচিও মূলত তাঁদেরই। এর বাহ্যিক কারণ অনেক। কিন্তু, মৌলিক কারণ আমার মতে কেবল একটি: সাধারণ মানুষের মন স্বাধীন ও সবল, আর শিক্ষিত মানুষের মন জটিলতাচ্ছন্ন (Sophisticated) ও বিজাতীয় নাগপাশে আবদ্ধ হ'য়ে কয়েদীর মতো অধীন ও অক্ষম। এঁদের মন মুক্তির পথ যেমন খুঁজে পাচ্ছে না, উদরও তেমন অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত ব'লে সারবান কোন বস্তু আহার ক'রে হজম করতে পারছে না। বিদেশী-ভাষাকে নিজের মতো ক'রে আত্মস্থ করার শক্তি সরল সাধারণ মানুষের যতখানি আছে, সে-শক্তি কুটিলতাচ্ছন্ন শিক্ষিত মানুষের ততখানি নেই ংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যখন 'পরিভাষা' 'পরিভাষা' ক'রে চেঁচামেচি করছেন, তখন জনসাধারণ নিজেদের মতো বিদেশী ভাষার শব্দকে আত্মস্থ ক'রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

যাঁরা বাংলা পরিভাষার Bogey বা জুজুতে আপিস-আদালতে ও উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা-ভাষার প্রচলনকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ব্যাহত করছেন, তাঁদের মন সচল নয়, বলিষ্ঠও নয়। তাঁদের আচরণে

মনে হয়, পরিভাষা তৈরির ব্যাপারে তাঁদের যেন কোন দায়-দায়িত্ব নেই, তাঁরা যেন এর জন্য কোন আয়োজন করতেও নারাজ। এঁরা বাংলা-ওয়ালাদের ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হ'তে চান কি? তাও না। তাঁরা ব'লে বেড়ান "পরিভাষা হবে এমন, যা সবাই বুঝে ফেলবে।" এ-সমস্ত কথা আমাদের কানে ধুয়ার (Refrain) মতই শোনায়। বাংলা-ওয়ালারা বাংলা জানেন বটে, তাঁরা বিশ্বের সব শাস্ত্রের ও বিষয়ের, বিশেষ ক'রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পারিভাষিক শব্দের সাথে পরিচিত নন; তেমন মনে করাও অন্যায়। তাঁদের সাথে সহযোগিতার কথাটাও তাঁরা চিন্তা করেন না। আসল কথা হচ্ছে, যাঁরা যে-শাস্ত্রের অধিকারী, তাঁদেরই সে-শাস্ত্রের বাংলা পরিভাষা তৈরি করতে হবে। তবে, তাঁরা ইচ্ছা করলে ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের জন্য বাংলাওয়ালাদের সাহায্য নিতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর পণ্ডিতদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আবশ্যক।

জীবনের সর্বস্তরে, বিশেষ ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বাংলা-ভাষা চালু করতে বল্লেই যাঁরা 'পরিভাষা' 'পরিভাষা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠেন, আর বলেন যে, এমন সহজ পরিভাষা চাই, যা সকলেই বুঝে ফেলবে, তাঁরা যে 'পরিভাষার' পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করেন, তেমন মনে হয় না। তাঁরা মনে করেন, ইংরেজী 'Technical term' কথার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'পরিভাষা'। এমন ধারণা একান্তই বিভ্রান্তিকর। ইংরেজী 'Technical term' কথার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে 'পারিভাষিক শব্দ' এবং এই 'পারিভাষিক' শব্দটি 'পরিভাষা' নামক বিশেষ্য শব্দের বিশেষণের রূপ। 'পরিভাষা' শব্দটি আদপে ইংরেজী 'definition' শব্দের বাংলা অনুবাদ। বাংলায়ও শব্দটি একেবারে অপরিচিত নয়। এদেশে ইংরেজী-ভাষা আমদানীর বহু পূর্বে সংস্কৃত-ভাষায় শব্দটি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ অর্থে প্রচলিত ছিল। 'বাচস্পত্য' অভিধান মতে 'পরিভাষা' শব্দের অর্থ হ'ল,--"শাস্ত্রকারের সংজ্ঞা বিশেষ"। প্রাচীন সংস্কৃত কবি মাঘের 'শিশুপাল বধ' কাব্যেও এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়--'বঙ্গীয় শব্দকোষ')। অন্যান্য অভিধানেও শব্দটির যে অর্থ দেওয়া হয়েছে, তার দিকে লক্ষ্য রে'খে এর অর্থ দেওয়া যায়,--"অর্থান্তর নাই এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নাম পরিভাষা।" এর থেকে

বোঝা খুবই সহজ যে, 'পারিভাষিক শব্দ' এমন শব্দ, যার দ্বারা যে-কিছুই বুঝানো হয়, কেবল সর্বত্র সে-কিছুই বুঝানো হবে,—অন্য কিছু নয়। অধিকন্তু, এ হচ্ছে সংজ্ঞাবাচক শব্দ অর্থাৎ অনেকগুলি কথা বোধক বা ভাব-দ্যোতক এমন একটি বা একটির অনুরূপ শব্দ, যা উচ্চারণ করলেই কেবল ঐ-সমস্ত কথাই বোঝায় বা ঐ-সমস্ত ভাবই দ্যোতিত হয়; যেমন ব্যাকরণে 'কারক' বল্লে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সাথে অন্য শব্দের কোন-না-কোন প্রকারের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। তাই, 'কারক' ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। এইরূপ, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের 'পারিভাষিক শব্দ' আছে এবং এই পারিভাষিক শব্দের প্রত্যেকটিই অনেকগুলি কথা বা ভাব একত্রে বুঝায়। এই জন্যেই, ভাষায় শব্দের পারিভাষিকত্ব লাভ করতে দীর্ঘদিনের ব্যবহার আবশ্যক হয়।

এবার 'Technical term' কথাটিতে ফিরে আসা যাক। ইংরেজীতে কথাটি যা বোঝায় তা হচ্ছে—A word (=term) connected with methods or objects used by experts in science, technology or arts by way of abbreviation, অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, চারু ও কারুকলা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যবহৃত বস্তু অথবা তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতির সহিত সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত শব্দ। উদাহরণস্বরূপ লাতিন 'Alma-mater' কথার উল্লেখ করা যায়। এর মৌলিক অর্থ 'সদাশয়-জননী' হলেও, বর্তমানে এতে যা বোঝায় তা হচ্ছে, 'ছাত্রদের সেই বিদ্যালয় যাতে তারা শিক্ষা পে'য়ে মানুষ হয়েছে'। মূলের সঙ্গে Technical term-এর কোন-না-কোন প্রকারের সম্বন্ধ থাকা প্রত্যাশিত হ'লেও, তার সাথে কোন সম্বন্ধ না থাকলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। যেমন লাতিন Placenta শব্দের অর্থ হচ্ছে a flat cake বা একটা চেপ্টা পিঠে। কিন্তু, ধাত্রী-বিদ্যায়, এ শব্দ যা বোঝায়, তা হচ্ছে—The structure which unites the unborn baby to the womb of its mother and establishes a nutritive connection between them, অর্থাৎ সেই শারীর-ব্যবস্থা যা ভ্রূণের সাথে তার মাতৃগর্ভের সংযোগ ঘটায় এবং ভ্রূণ ও মাতৃগর্ভ এ দুয়ের মধ্যে পৌষ্টিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। এর বাংলা নাম 'অমর' বা 'ফুল'। এবার ভেবে দেখুন, placenta-এর সাথে মূলের কোন সম্বন্ধ আছে কি নেই।

আসল কথা হ'ল—অপরের মনে যে-শব্দের দ্বারা বক্তা একটি বা একাধিক বস্তু, ভাব বা ক্রিয়া দ্যোতিত করতে চান, সে শব্দের কোন 'অভিধা' থাকুক বা না থাকুক, 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনা'-য়, এমন কি শুধু 'লক্ষণা-য়, অথবা শুধু 'ব্যঞ্জনা'-য় তা দ্যোতিত হ'লেই হ'ল, যেমন, 'ইউনেস্কো' শব্দের দ্বারা আমরা 'জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) বোঝাতে চাই ও বু'ঝে নিয়ে থাকি। কিংবা, 'স্পুটনিক' বল্লে আমরা 'রুশ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিৎ কর্তৃক উদ্ভাবিত উর্দ্ধোৎক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত একটি কৃত্রিম উপগ্রহ' ("One artificial satellite put into space by means of rocket propulsion as by Russian scientists and technicians") বুঝে থাকি। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, Alma-matter কথাকে 'মাতৃকল্প-বিদ্যায়তন' রূপে পরিভাষিত করা চলে বটে, কিন্তু 'স্পুটনিক শব্দের কোন পারিভাষিক শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন আমাদের 'কালাজ্বর'-কে ইংরেজীতে 'কালা আজর' (Kala ajar) বলা হয়, অনুবাদ ক'রে 'black fever' বলা হয় না।

বাংলা 'কালাজ্বর' শব্দ দেখলে বা শুনলে মনে হয়, ইহা কাল রঙের জ্বর। ইহার আসল অর্থ কৃষ্ণবর্ণের জ্বর নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় লৌকিক-নিরুক্তি বা folk-etymology অনুসারে এর বাংলা বানান 'কালাজ্বর' হ'লেও এটি বাংলাদেশের রোগ নয়। এ-রোগ আসামের এবং আসামী-ভাষায় 'কাল' (=মৃত্যু)=(ফা') আজাৰ (=ব্যাধি)=কালাজার (বাংলা লেখায়) 'কালাজ্বর' শব্দে পরিণত হয়েছে। জ্বরের মতো শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধিতে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে বটে, প্রকৃতপক্ষে কোন জ্বরের সাথে এর সামঞ্জস্য নেই। যত দিন ডাক্তার ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত ঔষধের দ্বারা এই রোগের সূচিবেধক-চিকিৎসা (injection treatment) প্রবর্তিত হয়নি, ততদিন এই রোগ সারাবার কোন উপায় ছিল না। সবাই মনে করতো এই রোগ মানুষের কালস্বরূপ, এর দ্বারা আক্রান্ত হ'লেই মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। তাই, এর নাম দেওয়া হয়েছিল, 'কালাজার' বা 'কালজ্বর'। সর্বত্র এ-নামে এই রোগ এখনও চিহ্নিত হচ্ছে।

আশা করি, এখন বোঝা যাবে, বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত 'পরিভাষা' নামক প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা থেকে গৃহীত কৃতঋণ শব্দটি ইংরেজী ভাষায় ব্যবহৃত Technical term-এর প্রায় সমার্থক। উভয়ই সংজ্ঞা-বাচক বা বিশিষ্ট অর্থজ্ঞাপক শব্দ। ইংরেজী Technical term কথার 'অভিধা' যাই হোক, 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনা'-য় বহু বিস্তৃত অর্থবোধক কথা। 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনা'-য় তার এই প্রাচুর্য একদিনের ব্যাপাব নয়, দীর্ঘ কালের সঞ্চয়ের ফল। বাংলায় গঠিত ও গৃহীত পারিভাষিক শব্দের বেলায়ও এ-কথাটি মনে রাখতে হবে। দীর্ঘদিন ধ'রে ব্যবহৃত না হ'লে, কোন বাংলা পাবিভাষিক শব্দই পারিভাষিক-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে না।

বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেকের, বিশেষ করে দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের কাহারও কাহারও ধারণা অস্পষ্ট ব'লে, এ-সমস্ত বিষয়ে ব্যবহৃত ইংরেজী Technical term বাংলায় পরিভাষিত হ'লে তাঁদের মন ওঠে না। এঁদেরকে বলতে শুনেছি,— "কিছুই হ'ল না। ইংরেজী শব্দটি যা বোঝায়, বাংলা শব্দটি তা বোঝায় না।" এ উক্তির সবটুকু সত্য নয়। ব্যাপাবখানা বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করছি। বেশ কিছুদিন আগে অর্থনীতি বিশারদেরা 'economic function' কথাটির বাংলা ক'রে পাঠালেন 'অর্থনৈতিক বিচিত্রা'। বর্ণানুক্রমিক ও ভাষাগত ভুলত্রুটি পরীক্ষা ক'রে যিনি এগুলিকে প্রক্রিয়াজাত (Processed) করছিলেন, তিনি ইংরেজী শব্দটি ও তার বাংলা পরিভাষার প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কথাটি দে'খে আমার তো একেবারে আক্কেল গুড়ুম ;—Economic function-এর বাংলা 'অর্থনৈতিক বিচিত্রা'? Economic-এর বাংলা আর্থনীতিক' না হ'য়ে, না হয় 'অর্থনৈতিক' হ'ল, কিন্তু function-এর বাংলা 'বিচিত্রা' হ'ল কি ক'রে, আন্দাজ করা যাচ্ছিল না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোর Halls বা মিলনায়তনসমূহে যে-সমস্ত functions হয়, তাকে সচরাচর 'বিচিত্রানুষ্ঠান' বলা হ'য়ে থাকে। এখান থেকেই Economic function-এর বাংলা 'অর্থনৈতিক কর্মধারা বা কার্যপদ্ধতি' না হ'য়ে 'অর্থনৈতিক বিচিত্রায়' পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা অনুবাদকের মনে

দেখা দিয়ে থাকবে। পরিভাষা গঠনে বাংলা না জানার বিপদ কোথায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারে, তার একটা উৎকট নিদর্শন এখানেই পাওয়া গেল।

আরও একটা নিদর্শন মিলে অন্যত্র। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরেজ শস্ত্রচিকিৎসক (surgeon) বার্নার্ড্ (Bernard) কৃতকার্যতার সাথে বছর চারেক আগে যখন মানুষের 'Heart transplantation' নামক অদ্ভুত অস্ত্রোপচার করেছিলেন, তখন বিশ্বময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। "দৈনিক পাকিস্তান" নামক বাংলা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট বিরাট হরফে খবরটি পরিবেশিত হ'ল 'হৃদয়-বদল'---এই শিরোনামায়। দেখে মনে হ'ল, নিশ্চয় 'হৃদয়-বদলের' সাথে বৈষ্ণবদের মতো 'কণ্ঠিবদল'-ও হ'য়ে থাকবে। এমন প্রণয়ঘটিত কাণ্ড তো পৃথিবীর সব দেশে হর-হামেশাই ঘটে থাকে। এখন থাক,--একবার ইংরেজী কাগজখানা প'ড়ে দেখি, তাতে কি আছে। ইংরেজী কাগজখানা খুলতেই দেখি বড় বড় হরফে খবর বেরিয়েছে, "Transplantation of Human Heart" ঔৎসক্যভরেই কয়েক মিনিটের মধ্যে খবরটি প'ড়ে নিয়ে মনে হ'ল, এই খবরটিই বাংলায় 'হৃদয়-বদল' হ'য়ে বেরিয়ে থাকবে। আবার বাংলা কাগজখানা খুলে দেখি তাই হয়েছে। তবে, শিরোনামায় 'হৃদয়-বদল' কথা দেখে প্রণয়ঘটিত কণ্ঠিবদলের ব্যাপার মনে দ্যোতিত হ'ল কেন? কারণ, ইংরেজী heart শব্দ যেমন ইংরেজী সাহিত্যে 'Centre of the emotions especially love', অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'হৃদয়' শব্দও বাংলা-সাহিত্যে তেমন যাবতীয় প্রেমানুভূতির কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয় এবং anatomy বা শারীরস্থান-বিদ্যায় ইংরেজীতে শব্দটি বোঝাচ্ছে 'that part of the body which pumps blood through the system' আর এটিই বাংলায় বোঝাচ্ছে 'হৃৎপিণ্ড' অধিকন্তু, ইংরেজী Transplantation-এর অর্থ take up plants, etc. with their roots and plant in another place—অর্থাৎ উদ্ভিদের চারা প্রভৃতিকে শিকড়সহ এক স্থান থেকে তুলে আর একস্থানে লাগানোর নাম 'বদল' নয়। Heat transplantation-এর ব্যাপার হ'ল এক জনের অকেজো হৃৎপিণ্ড কে'টে ফে'লে দিয়ে সে-স্থানে আর এক জনের কর্মক্ষম হৃৎপিণ্ড সংযোজিত করা। সুতরাং এর বাংলা হবে "হৃদপিণ্ড-সংযোজন",—'হৃদয়-বদল' নয়।

আবার, বিজ্ঞানের পরিভাষা যদি সাহিত্যিক বা কাব্যিক হ'য়ে পড়ে, তারও বিপৎ কম নয়। তাতে বিজ্ঞানও মাঠে মারা যায়, সাহিত্যও স্ফূর্ত হয় না। দেখা গেছে, জনসাধারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ চায় না বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন সাহিত্যের অনধিকার প্রবেশ কামনা করে না। উদাহরণস্বরূপ Talkies-এর কথা উল্লেখ করা যায়। কলকাতায় প্রথম যখন Talkies এল, তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে Movies চলছিল। Movies 'চলচ্চিত্র' রূপে বাংলায় পরিভাষিত হয়েছিল বহু আগে; এবং তা জনসাধারণের মধ্যে বেশ চালু হ'য়ে যায় নির্বিবাদে। Movies-এর চেয়ে উন্নততর Talkies-এর আমদানী হওয়াতে, এই Talkies-কে বাংলায় কিভাবে পরিভাষিত করা যায়, তা নিয়ে কলকাতার চিত্র-জগৎ মাথা ঘামিয়ে বা'র করেছিলেন 'সবাক চলচ্চিত্র', যা পরে শুধু 'সবাক চিত্রে' পরিণত হয়। এতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে চিত্র-জগৎ Talkie-এর একটা সুন্দর পারিভাষিক শব্দ তৈরি ক'রে দিতে অনুরোধ করলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে। শুনেছি, কবিগুরু 'বিশ্ব-ভারতীর' জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা আদায় ক'রে Talkies-এর বাংলা অনুবাদ ক'রে দিলেন 'রূপবাণী'। এ নিয়ে বিদগ্ধ-সমাজ ও খবরের কাগজে আলাপ-আলোচনা হ'তে দেখেছি। কবি বলেছিলেন, রূপবাণীর কোন 'রূপ' নেই, তা যখন কথা ও গান হয়ে কর্ণগোচর হয়, কেবল তখনই তা একটা নির্দিষ্ট শ্রুতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'রূপ' পায়। Movies-এ বাণী অশ্রুত এবং Talkies-এ বাণী শ্রুত। সুতরাং, Talkies-কে বাংলায় বলতে হয় রূপবাণী অর্থাৎ কিনা মূর্তিমতী-বাণী। পণ্ডিতদের কাছে এ-আলাপ প্রলাপ ব'লে মনে হ'ল। তাঁরা Talkies-এর পরিভাষা 'রূপবাণী' শব্দকে অগ্রাহ্য ব'লে ঘোষণা করলেন ও বল্লেন এর পরিভাষা হবে 'সবাক চলচ্চিত্র', সংক্ষেপে 'সবাক চিত্র'। তা এখনও চলছে। তবে কলকাতার একটা নতুন প্রেক্ষাগৃহের নাম দেওয়া হ'ল 'রূপবাণী' এবং এতে 'সবাক চিত্র' দেখানো শুরু হ'ল। আমার ধারণা 'রূপবাণী' কবিত্বময় ও সাহিত্যধর্মী শব্দ বলেই Talkies-এর পরিভাষা রূপে গণ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করেনি।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কোন পারিভাষিক শব্দেই 'অভিধার' দিক থেকে অর্থাৎ মৌলিক অর্থের দিক থেকে, বহু ধারণার সামগ্রিকতার দ্যোতনা নেই। মুখ্য অথবা গৌণ, এই দুই শ্রেণীর অর্থকে, বিশেষ ক'রে 'লক্ষণা' ও 'ব্যঞ্জনা'-কে অবলম্বন করে পারিভাষিক-শব্দ বহু ধারণার একটা সামগ্রিক-দ্যোতনা দীর্ঘ দিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে থাকে। এই জন্যই, পারিভাষিক-শব্দ সংজ্ঞাবাচক, অন্য কথায় একটি সুদীর্ঘ ধারণার সামগ্রিকতাবোধক হইয়া থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ প্রযুক্তি-বিদ্যা সংক্রান্ত Teleseme শব্দের উল্লেখ করা যায়। শব্দটি গ্রীক tele (=far) sema (sign) যোগে তৈরী, যার মানে হচ্ছে 'a far sign'. কিন্তু এ-শব্দের বৈজ্ঞানিক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, "A system of electric signalling for the automatic transmission of different signals, in use in large hotels, for police alarms etc. অর্থাৎ পুলিসকে সতর্কীকরণ, বিশাল হোটেল-পরিচালনা প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় উপায়ে ইঙ্গিত দানের বৈদ্যুতিক সঙ্কেত-ব্যবস্থা। এখানে যতগুলো বিষয়সম্পৃক্ত কথা রয়েছে, তা Teleseme শব্দে নেই; অথচ একটি শব্দে তা বোঝানো হয়েছে। এর বাংলা পারিভাষিক-শব্দ যদি 'দূরেঙ্গিত' (দূর+ইঙ্গিত) বলে গৃহীত হয়, তাতে কাজ না চলার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অথচ 'দূরেঙ্গিত' শব্দ শুনলেই আমাদের প্রযুক্তিবিদেরা হৈ-হৈ ক'রে উঠবেন ব'লে আমার ধারণা। তাঁরা ব'লে ফেলতে পারেন যে, এ গণমুখী শব্দ নয়; এ শব্দ কেউ বুঝবে না; কারণ, এ হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ, বাংলা হ'লে তো আমরাও বুঝতাম। কথা হল,—ইংরেজীতে ব্যবহৃত Teleseme শব্দ খাঁটি ইংরেজী অর্থাৎ Anglo Sexon শব্দ কিনা তাঁরা বুঝুন আর নাই বঝুন, এতে কোন দোষ নেই; আর বাংলার বেলায় 'যত দোষ, নন্দ ঘোষ'।

বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানকল্প বিষয়ের ইংরেজী-পরিভাষা সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় রয়েছেঃ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা অথবা ঐ জাতীয় যাবতীয় বিষয় যে-যে ভাষায় চর্চিত হয়েছে ও হচ্ছে, খাস সে-সে ভাষায় পারিভাষিক শব্দের সংখ্যা কত, তারও একটি হিসেব নিতে হবে। এ-গুলির অধিকাংশেরই মূল হয় লাতিন, না হয় গ্রীক-ভাষা। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজীর কথাই ধরা যাক। সাধারণ ইংরেজীতে যাকে

Iron (A. S. iron) বলে, বিজ্ঞানের ইংরেজীতে তাকে বলা হয় Ferrus ; আর এই Ferrus হচ্ছে, লাতিন Ferrum থেকে গৃহীত শব্দ। এইরূপে সাধারণ ইংরেজীতে যাকে Water (A. S. water) বলে, বিজ্ঞানের ইংরেজীতে তাকে বলা হয় Aqua, আর এই Aqua একটি নির্ভেজাল লাতিন শব্দ। ডাক্তারী বিদ্যায় (Medical Science) এই Aqua না হ'লে, বহু ঔষধ তৈরি হবে না। তার পর water থেকে যখন adjective বা বিশেষণ পদ তৈরি করা হয়, তখন তার রূপ দাঁড়ায় Watery। তাকে যখন ভাষায় ব্যবহার করি, তখন 'Watery grave' বা 'সলিল-সমাধি', 'Watery soup' বা 'জোলো ঝোল' কিংবা 'Watery moon' বা 'বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ' পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারি। এই Watery বিশেষণ পদ দিয়ে আর কিছু করার উপায় নেই। তখন ফিরে যেতে হয় aqua-তে। তার থেকে aquatic plant বা জলীয় উদ্ভিদ, aquatic animal বা জলীয় জন্তু, aquatic game বা জলক্রীড়া থেকে শুরু ক'রে aquarium বা মৎস্যপোষ্যাধার, aqueduct বা পয়ঃ-প্রণালী, aquarius বা কুম্ভরাশি, aquiferous বা শীকরসিক্ত, aqueous rocks বা জলজ-শিলা, aqua regia বা স্বর্ণদ্রাবক ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে বাংলা 'পানি' এবং 'জল', এই শব্দটির ব্যবহারের কথাও চিন্তা ক'রে দেখতে হবে। পানি 'অর্ধ-তৎসম' শব্দ, অর্থাৎ সংস্কৃত তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিশেষণ পদ 'পানীয়' থেকে অর্থে ও গঠনে বিকৃতি ঘটিয়ে গৃহীত হয়েছে। এবং মূলে শব্দটি বিশেষণ হ'লেও, বাংলায় ও হিন্দীতে অর্ধ-তৎসম রূপ নিয়ে বিশেষ্য পদে পরিণত হয়েছে। তাই, শব্দটিকে আমরা বাংলায় 'পানিফল', পানিবসন্ত', 'পানকৌড়ি', 'পান্তোয়া', এমন কি 'পান্তাভাতে'ও ব্যবহৃত হ'তে দেখি। এই 'পানি' শব্দের বাংলা বিশেষণ রূপ হচ্ছে 'পানসে' অর্থাৎ ফিকা, জোলো। 'পানসে হাওয়া', পানসে ঝোল', 'পানসে শরবত'-ও চলতে পারে অর্থাৎ ঘরোয়া কথায় 'পানসে' শব্দের ব্যবহার চলতে পারে, তবে 'পয়ঃপ্রণালী' স্থলে 'পানসে নর্দমা', 'জলজ-শিলা' স্থলে 'পানসে-শিলা' 'জলক্রীড়া'-স্থলে 'পানসে ক্রীড়া' চলবে কিনা পাঠকেরাই ভে'বে দেখুন। 'তৎসম' তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্য-'জল'শব্দ ছাড়া 'পানি'শব্দ বাংলা বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যবহার করা চলবে বা চলা উচিত ব'লে আমি মনে করি না। এই জন্য 'পানসে' বাষ্প না লিখে 'জলীয় বাষ্প' লেখার প্রয়োজন হ'য়ে থাকে।

এমন কি, ঘরোয়া কথায়ও সর্বত্র—বিশেষ ক'রে বাংলার বাগধারাসম্মত (idiomatic) কথায়ও 'জলের' স্থলে 'পানি' এবং 'পানির' স্থলে 'জল' ব্যবহার করা চলে না। তাই, আমরা কখনও 'জলাতঙ্ক' (hydrophobia)-কে 'পান্যাতঙ্ক', 'জলপাই'-কে 'পানিপাই', 'জলপানি'-কে 'পানিপানি', 'জলযোগ'-কে 'পানিযোগ' এবং 'পানিফল'-কে 'জলফল', 'পানকৌড়ি-কে 'জলকৌড়ি', 'পান্তাভাত'-কে 'জল্‌ভাত' বলতে পারি না ও বলি না।

এদিক থেকে ভাবতে গিয়ে 'পানি-পরিক্রমা' নামক সদ্যঃপ্রকাশিত (বৈশাখ, ১৩৭৯) ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির কথা মনে পড়ে গেল। এতে বাংলাদেশের জল-সম্পৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এটা বাংলাদেশের 'পানিসম্পদ-বিজ্ঞানী' সমাজের মুখপত্র। সুতরাং, এ একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-সাময়িকী। এ-সাময়িকীর নাম "পানি-পরিক্রমা" অনুপ্রাস (alliteration) নামক কাব্যিক অলঙ্কারে মণ্ডিত হয়েছে বটে, বৈজ্ঞানিক যথার্থতা (exactitude) যে রক্ষা কবতে পারেনি, তা একরূপ স্থির নিশ্চিত। আমরা 'পানি ছেঁচা' বলি, 'পানি খাওয়া' বলি, 'পানি ভাত'-ও বলি। তা ছাড়া, 'অজুর পানি'. 'গোসলের পানি', 'বানেব পানি'-তো বলিই। কিন্তু, 'পানি-পরিক্রমা'-র মতো কথা বিজ্ঞানে অচল ; এবং বিজ্ঞানে যে অচল, তার উদাহবণ 'পানি-পরিক্রমা' থেকেই দিচ্ছি। এই পত্রিকার "পারিভাষিক শব্দসম্ভাব" অংশে (পৃঃ ৬৭—৮৭) শুধু 'পানি' আর 'জল'-এর ব্যবহার কেমন বেপরোয়াভাবে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিকভাবে করা হ'য়েছে দেখা যেতে পারে :—

1. Hydrology — পানিবিজ্ঞান (পৃঃ৬৯)
2. Hydrology — পানিবিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান (পৃঃ৭২)
3. Hydraulic radius — ঔদক ব্যাসার্ধ (পৃঃ ৭২)
4. Hydraulic gradient — ঔদক অবক্রম (পৃঃ ৭২)
5. Hydrologic cycle — বারি আবর্ত, পানি আবর্ত (পৃঃ ৭২)
6. Hydrometry — বারিমিতি, জলমিতি, পানিমিতি (পৃঃ ৭৩)
7. Hydrometeorology — বারি আবহ-বিজ্ঞান (পৃঃ ৭৩)

8. Hydraulic jump — ঔদক লম্ফ (পৃঃ ৭৩)
9. Hydraulics — পানি প্রবাহ বিজ্ঞান (পৃঃ ৭৩)
10. Hydrography — জলনির্লেখ বিজ্ঞান (পৃঃ ৮১)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—গ্রীকভাষা থেকে নেওয়া বৈজ্ঞানিক Hydro (Gr. hydra) শব্দযুক্ত দশটি পারিভাষিক শব্দের বাংলা পরিভাষায় মাত্র দুইটি শব্দে এককভাবে 'পানি' শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে, এবং মাত্র তিনটি শব্দে 'জল' অথবা 'বারি' শব্দের সমার্থক 'পানি' শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে। এর থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে-বিজ্ঞানী মাত্র দু'টি শব্দে একক ভাবে 'পানি' শব্দের ব্যবহার করেছেন, তিনি স্থির নিশ্চিত যে, 'পানি' দিয়ে এর কাজ সহজেই চলে যাবে, আর তার 'পানি'-প্রীতির ফলে আরও তিনটি সংস্কৃত কথার সাথে 'পানি' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু 'পানি' শব্দ দিযে *'পানি-বিজ্ঞান'* কথা Hydrology-এর জন্য তৈরি ক'রে বিজ্ঞানীর মন ভর্‌ল না। তাই, তিনি 'জল-বিজ্ঞান', 'বারি-বিজ্ঞান' নামক আরও একটি সংস্কৃত কথা পারিভাষিক 'পানি বিজ্ঞান' কথার সাথে যোগ দিয়ে দিলেন। বোধ হয় বিজ্ঞানী ভাবেননি যে, অর্দ্ধ-তৎসম 'পানি' শব্দের সমার্থক আরও বেশ কতকগুলি তৎসম শব্দ রয়েছে, যেমন—সলিল, অপ্, উদ, বারি, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয়, জীবন, জল ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর প্রত্যেকটিকে 'বিজ্ঞান' শব্দের পূর্বে বসিয়ে দিয়ে Hydrology শব্দের পরিভাষা তৈয়ার করা চলে না। কারণ, শব্দগুলির অধিকাংশই বাংলায় সীমিত ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে আস্‌ছে। এই ধরুন,-'সলিল' বল্লেই 'সলিল-সমাধির' কথা, 'অপ' বল্লে 'ক্ষিত্যপতেজোমরুৎব্যোম' নামক পঞ্চভূতের কথা, 'উদ' বল্লে 'উদকুণ্ড' বা কমণ্ডলুর' কথা, 'অম্বু' বল্লে 'অম্বুবাচিমেলার' কথা, 'বারি' বল্লে 'বারিধি', 'বারিদ', 'বারিশ' প্রভৃতির কথা, এমন কি 'বারি কি বারই নীল নিচোল'-এর রম্যন্তিক (Romantic) ছবিও মনে উদিত হয়। কিন্তু, 'জল' এমন একটা শব্দ, যা মৌলিক অর্থে [√জল্ (আচ্ছাদন করা) + অচ্,র্তৃ = জল — যাহা পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, অথবা যদ্দ্বারা পৃথিবী আচ্ছাদিত] এবং ব্যবহারে অতিব্যাপক। বাংলায় বিজ্ঞানের ভাষায় অন্য তৎসম শব্দ ব্যবহার না ক'রে কেবল 'জল' শব্দের ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে কাজ চলতে পারে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'পানি'-র প্রতি অত্যাসক্তি ছে'ড়ে দিলে, কি ক'রে জল

ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করবে, তা' নীচে দেখিয়ে দিচ্ছি :—

1.	Hydrology	-	জল-বিজ্ঞান।
2.	Hydrologic cycle	-	জলাবর্ত।
3.	Hydraulic radius	-	জলীয় ব্যাসার্ধ।
4.	Hydraulic gradient	-	জলীয় অবক্রম।
5.	Hydraulic jump	-	জল-লম্ফন।
6.	Hydrometry	-	জলমিতি।
7.	Hydrometeorology	-	জলাবহ বিজ্ঞান।
8.	Hydrolics	-	জলপ্রবাহ বিজ্ঞান।
9.	Hydrograph	-	জলাঙ্ক (জলনির্লেখ ?)
10.	Hydrography	-	জলাঙ্ক-বিজ্ঞান।
11.	Hydrophobia	-	জলাতঙ্ক।
12.	Hydrographic chart	-	জলাঙ্কিক নক্সা।

বাংলা-ভাষাজ্ঞানের অপ্রতুলতা বশত পরিভাষা তৈরিতে যে কিরূপ মারাত্মক ভুল হ'তে পারে, তারও একটা চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে, Hydrograph শব্দের বাংলা পারিভাষিক "জলনির্লেখ" শব্দ তৈরিতে। গ্রীক 'hydro'=জল শব্দ ঠিক আছে, কিন্তু graph, graphe (Graphein =to write) a writing=লিপি, লিখন, লেখ থেকে বেছে একটি শব্দ যোজনা ও প্রয়োগের বেলায় দেখতে পাচ্ছি একটা অপ্রত্যাশিত ধারণা কাজ করেছে। graph-এর পরিভাষা 'লেখ' গৃহীত হওয়া পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু, তার সাথে তৎসম উপসর্গ নির্=নিঃ যোগ ক'রে শব্দটিকে ভারিক্কি ক'রে তুলতে গিয়ে 'নির্লেখ' আকারে রূপ দেওয়ায়, ইহার প্রচলিত অর্থ যে কি দাঁড়ায়, তা ভেবে দেখা হ'ল না। 'নির্লেখ' শব্দের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে 'লেখাবিহীন', আঁক বা আঁক্‌ড়িশূন্য, কারণ, নির্-নিঃ উপসর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাস্তিবোধক। শব্দটি তৈরি করার সময় বিজ্ঞানী যদি 'নির্লজ্জ', 'নির্লিপ্ত', 'নির্লোভ', 'নির্জলা', 'নির্লক্ষ্য' প্রভৃতি শব্দের অর্থের কথা মনে করতে পারতেন, তবে তিনি কখনও গ্রীক graph শব্দের বাংলা 'নির্লেখ' শব্দ তৈরি করতে পারতেন না। সুতরাং, hydrograph-এর বাংলা-পরিভাষা অবাধে 'জলাঙ্ক' বা 'জল-লিপি' অথবা 'জললিখ' হ'তে পারত এবং hydrography-এর

বাংলা 'জলনির্লেখ বিজ্ঞান' স্থলে 'জলাঙ্ক-বিজ্ঞান' বা 'জললিপি-বিদ্যা' খুব সহজেই হ'য়ে যেত। বলা বাহুল্য, "জলনির্লেখ বিজ্ঞান" কথার অর্থ —ঐ বিজ্ঞান, যা জলের কোন চিহ্ন বা আঁকড়ি রেখে যায় না, এমন বিষয়ে জ্ঞান দান করে। অথচ, hydrography ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা বোঝায়। অতএব, hydrographic chart-এর বাংলা করতে হয় 'জলাঙ্কিক' বা 'জললৈপিক নক্‌সা'। chart-এর পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলা নির্লেখ' গ্রহণযোগ্য নয়।

ভাষা-জ্ঞানের অভাবে পশ্চিমবঙ্গকে অনুসরণ করতে গিয়েও 'পানি পরিক্রমা' পত্রিকার (এই নামটি "জল-পরিক্রমা" হ'লে বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকত) পরিভাষাকারেরা নানা রকমের ভুল করেছেন। তার দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছিঃ Discharge mass curve কথার বাংলা করা হয়েছে, "সামগ্রক স্রাব রেখা"। প্রথমত 'সমগ্র' শব্দের বিশেষণ 'সামগ্রিক'—'সামগ্রক' নয়। পশ্চিমবঙ্গে curve-এর বাংলা 'রেখা' করা হয়েছে। এখানেও তা গ্রহণ করা হয়েছে,--ভাল কথা। পশ্চিম বঙ্গে 'dscharge' শব্দের বাংলা করা হয়েছে, 'ক্ষরণ', 'মোক্ষণ', 'স্রাব'। এ ক'টা শব্দ থেকে আমাদের বিজ্ঞানীরা বেছে নিলেন 'স্রাব' শব্দটি ; তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না যে, ব্যবহারে শব্দটি প্রায়ই মেয়েদের 'মাসিক রক্তস্রাব'-এর জন্য ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে,--জলের discharge mass বা জলের 'সামগ্রিক নিকাশ'--এর জন্য ব্যবহৃত হয় না। পুরুষের বেলায়ও 'স্রাব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে : তবে 'প্র'-উপসর্গ যোগে 'প্রস্রাব'-রূপে।' পশ্চিমবঙ্গে 'data' শব্দের বাংলা-পরিভাষা 'উপাত্ত', ইহার অর্থ—"সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এমন স্বীকৃত বা গৃহীত বিষয়সমূহ"। ইহা লাতিন 'datum' শব্দের বহুবচনের রূপ। 'উপাত্ত' শব্দের চেয়ে প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত 'তথ্য' অনেক সহজ হ'লেও, 'পানি-বিজ্ঞানীরা' কঠিন 'উপাত্ত' শব্দ গ্রহণ করেছেন নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গের অনুসরণে। একবচন 'datum' (পৃঃ ৭১) শব্দের পরিভাষা করতে গিয়ে, তারা আরও অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছেন। পশ্চিম বঙ্গে 'datum line' এর বাংলা করা হয়েছে 'উপাত্ত রেখা'। তারা ঠিকই করেছেন, কারণ 'datum line'-এর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ইংরেজীতে যা বোঝায়, তা হচ্ছে—"The horizontal baseline from which

heights and depths are measured." তাই তাঁরা এর বাংলা করেছেন 'উপান্ত রেখা'। দুঃখের বিষয় তাঁরা ব্যাপারখানা ভালভাবে না বু'ঝে পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণ করতে গিয়ে একবচনের 'datum' শব্দের বাংলা ক'রে বসেছেন 'উপান্ত'। তাঁরা 'উপান্ত' শব্দের অর্থও ঠিক মত বুঝে উঠেছেন কি না, সন্দেহ হয়। ইহার অর্থ হচ্ছে,— " যাহা শেষ সীমার অব্যবহিত পূর্বে বা পরে অবস্থিত।" মোটের উপর, এক বচনের রূপ 'datum' শব্দের বাংলা অর্থ 'একটি তথ্য' অথবা 'একটি উপাত্ত' আর বহুবচনের 'data' শব্দের মানে হ'ল 'একাধিক তথ্য' অথবা 'একাধিক উপাত্ত'। এমনতরো আরও কত বিভ্রাটযে ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তবে তাঁদের উদ্যম একান্ত প্রশংসনীয়। আমি তাদেরকে বলবো,—

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?"

পরিভাষা তৈরির বেলায় আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, ইউরোপীয় ভাষাগুলির পারিভাষিক-শব্দের অধিকাংশের মূল লাতিন ও গ্রীক ভাষায় নিহিত। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ইউরোপের প্রাদেশিক ভাষাগুলি যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তা লাতিন ও গ্রীক ভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে সর্বাধিক, যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মূল হ'লেও, পাণিনি-প্রবর্তিত সংস্কৃত-ভাষায় তা সর্বাধিক পরিমাণে ও বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষিত হয়েছে। অপভ্রষ্ট ভাষা যতই সরল ও মধুর হোক, তা ঐ ভাষাভাষীর জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশ ক'রে উন্নত হ'তে পারেনি। তার জন্য তাদেরকে 'ক্লাসিক্যাল এইজ' বা প্রত্নোৎকৃষ্ট যুগের ভাষার শরণ নিতে হয়েছে। ইউরোপের আধুনিক ভাষাগুলি যেমন লাতিন ও গ্রীক ভাষা থেকে শব্দ-সম্পৎ কুড়িয়ে নিয়ে উন্নত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, আমাদের ভাষাও তেমন 'তৎসম' তথা সংস্কৃত-ভাষা থেকে শব্দ-সম্পৎ গ্রহণ ক'রে উন্নত হয়েছে ও হচ্ছে। যেখান থেকে যে-ভাষার উৎপত্তি, সেখান থেকেই যদি সে-ভাষা তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য রস আহরণ করে, তবে তার সঞ্জীবনী-শক্তি স্বল্প সময়ের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়। এ-নীতির অনুসরণে বাংলা-ভাষাকে বৈজ্ঞানিক শব্দ সৃষ্টির দ্বারা উন্নত ক'রে তুল্‌তে হ'লে, সংস্কৃত-ভাষার দ্বারস্থ না হ'য়ে আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। এতে অনীহা প্রকাশ ভাষার দিক থেকে আত্মহত্যার সামিল।

ইউরোপীয় ভাষাগুলির পারিভাষিক শব্দের অধিকাংশই লাতিন ও গ্রীক-ভাষা থেকে গৃহীত হওয়ার ফলে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওখানকার প্রায় সমস্ত উন্নত ভাষায় কতকগুলি শব্দ একরূপ সর্বজনীনতা লাভ করেছে। এ-গুলিকে আন্তর্জাতিক (international) শব্দ বলা যায়। বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ইউরোপের ভাষায় এ-গুলির সংখ্যা কত, তা নির্ণীত হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। দেশের সেরা বিজ্ঞানী-দের সাহায্যে এ-শ্রেণীর আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক-শব্দকে বেছে নিয়ে আলাদা ক'রে বিবেচনা করতে হবে। আমি মনে করি, এ-গুলিকে তাদের আন্তর্জাতিক উচ্চারণে আত্মস্থ ক'রে নেয়া আমাদের ভাষাব উচিত। এতে একদিকে আমাদের ভাষার সম্পৎ বে'ড়ে যাবে এবং অন্য দিকে আমাদের যে-সমস্ত তরুণ-বিজ্ঞানী উচ্চতর শিক্ষা লাভ ও গবেষণার জন্য উন্নত দেশে গমন করবেন, তাঁরা এখান থেকেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক-প্রতীকমালা (basic scientific formulae) ও পারিভাষিক শব্দাদির সাথে সহজে পরিচিত হ'তে সমর্থ হবেন। এতে বিদেশী বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা বা বক্তব্য শুনে মূল বিষয় বুঝে নিতেও সাহায্য পাওয়া যাবে অনেকটা।

আমরা যখন বলি, আমাদের ভাষা পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম, তখন আমরা যা বোঝাতে চাই, তা হচ্ছে আমাদের সাহিত্যের অর্থাৎ কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতির ভাষা উন্নত। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকল্প (অর্থাৎ অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি) বিষয়ে "কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড" কর্তৃক প্রকাশিত কতিপয় পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আমাদের নেই বল্লেও চলে। কিন্তু, আমাদের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কল্প বিষয়ে সাহিত্য রচনা করতে হবে জ্ঞান সঞ্চয়ন ও জ্ঞান বিতরণের জন্য। নইলে আমাদের ভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন অসম্ভব। এর জন্য পরিভাষাও 'বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কম প্রকাশ করেনি। এতৎসত্ত্বেও, পরিভাষা রচনার চীৎকার কমেনি, তার বিরুদ্ধে আপত্তিও কম ওঠেনি। এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রধান আপত্তি হ'ল, সৃষ্ট পারিভাষিক শব্দগুলো বড় সংস্কৃত-ঘেঁসা, কটমট ও কঠিন ব'লে জনসাধারণের বোধগম্য নয়। তাই রাজনৈতিক শ্লোগান বা জিগিরের মতো ভাষার ক্ষেত্রেও জিগির তোলা হচ্ছে 'গণমুখী পরিভাষা চাই'। যে-দেশের লোকের বর্ণজ্ঞান (literacy)

এখনও শতকরা মাত্র ষোল-সতের, সে-দেশের লোককে বোঝাবার মতো পরিভাষা তৈরির শক্তি কারো আছে কি না জানিনে, তবে জোর দিয়ে বল্‌তে পারি, পৃথিবীর উন্নততম দেশের সমুন্নত ভাষাভাষীরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত পুঁথি-পুস্তক পড়ে না এবং তাতে যে-সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই বোঝে না। লাতিন 'Habeas corpus'-এর অর্থ আইনজীবী ছাড়া, তিনি ইংরেজই হউন আর বাঙালীই হউন--কে বুঝে? তার বাংলা পারিভাষিক কথা 'শারীর উপস্থাপন' হ'লে আইন ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যের বোঝার প্রয়োজন আছে কি? এখানে আরও তিনটি লাতিন পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন 'carditis', 'cardiogram', 'cardiograph'। এ-শব্দগুলো ডাক্তার ছাড়া আর কেউ বোঝে কি? আমি যদি যথাক্রমে এ-গুলোর বাংলা ক'রে দেই,--'হৃৎস্ফিতি', 'হৃৎস্পন্দন' এবং 'হৃল্লিখ', এ-দেশের শতকরা আশি জন নিরক্ষর (illiterate) মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, অবশিষ্ট শতকরা কুড়ি জন অক্ষরজ্ঞকে বোঝাবার দায়িত্বও নিতে পারি না। তাদেবকে বোঝানোর কোন আবশ্যকতাও অনুভূত হওয়া উচিত নয়। কেননা, এ বুঝবে ডাক্তার, আনাড়ি ব্যক্তি নয়। অতএব, যাঁরা 'গণমুখী পরিভাষা' তৈরির ধুয়া তোলেন, তাঁরা হয় ব্যাপারটি বোঝেন না, না হয় বুঝতে চান না। এটা নিশ্চিতরূপে ব'লে দেওয়া যায় যে, এঁদের কথা শুন্‌লে বাংলা-ভাষায় পরিভাষা তৈরি করা যাবে না, এবং বাংলা-ভাষায় পরিভাষা তৈরি করতে হ'লে সংস্কৃত-ভাষার সাহায্য নিতেই হবে, যেমন ইংরেজী, ফরাসী, জর্মন প্রভৃতি উন্নত ভাষাগুলিতেও পারিভাষিক শব্দ তৈরি করতে গিয়ে লাতিন ও গ্রীক ভাষার সাহায্য নিতে হয়েছে ও নিতে হয়। পারিভাষিক শব্দ সংজ্ঞা-বাচক ব'লে, এ-গুলি যাদের জন্য তৈরি হয়েছে ও হবে, তারা বর্ণনা-মূলক বিবৃতির মধ্য দিয়েই এ-গুলির অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনাসমেত সংজ্ঞাটি বুঝে নেবেন। তারপর, ব্যবহার-পরম্পরায় এ-গুলি তাদের নিজস্ব সংজ্ঞা-প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ হবে।

কথায় কথায় অনেক কথা বেড়ে গেল। আর নতুন ক'রে কথা বাড়াতে চাইনে। এ দীর্ঘ আলোচনায় যা বলতে চেয়েছি, তা হয়তো নানা কথার ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তাই, পরিশেষে অতি সংক্ষেপে

আমার মূল বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে করি। প্রসঙ্গক্রমে যে-সমস্ত ছোটখাট বক্তব্য প্রকাশ করেছি, তা এ-স্থলে পুনরাবৃত্ত হবে না।

প্রথমতঃ, বাংলা-ভাষা আমাদের দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে নীতিগত ও ব্যবহারিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করায়, দেশের সর্বত্র পরিভাষা সৃষ্টির তাগিদ বাংলাবিরোধী ও বাংলা-সমর্থক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। বাংলাবিরোধীরা নানা অজুহাতে আপিস-আদালত ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাংলা চালু করতে অক্ষম ব'লে নারাজ, আর অশিক্ষিত লোকেরা ইতিমধ্যে নানা শব্দ নিজের মত ক'রে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, পারিভাষিক শব্দ সংজ্ঞাবাচক অর্থাৎ যে-সমস্ত কথা ভাবনা-চিন্তা, ক্রিয়া-কর্ম, রীতিনীতি একটি কথা বা শব্দের দ্বারা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হবে, সব সময় সেই শব্দ বা কথা তাই বোঝাবে। এই জন্যই পারিভাষিক শব্দ বোঝার জন্য অধিকারিভেদ আছে। দীর্ঘ দিন সকলে মিলে কোন বিশিষ্ট শব্দকে বিশেষ ভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহার করলেই, তা বিশিষ্টতা অর্জন ক'রে পারিভাষিক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং গৃহীত হয়।

তৃতীয়তঃ, যাঁরা পরিভাষা তৈরি করবেন ও পরিভাষার কাজের ভার নেবেন, তাঁদের বাংলা-ভাষায় বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। এ-কাজে বিশেষ উৎসাহেরও প্রয়োজন আছে। নৈলে তাঁরা তাঁদের কাজে কৃতকার্য হবেন না। তাঁদেরকে ভাষা-বিশেষজ্ঞেরও সহযোগিতা লাভ করতে হবে। তা না হ'লে তৈরি করা ' পরিভাষায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাবে। অধিকন্তু, পরিভাষা সাহিত্যিক-ভাষা হ'লেও চলবে না। পরিভাষাকে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির ভাষায় রূপ দিতে হবে।

চতুর্থতঃ, বিজ্ঞানের পরিভাষায় অনেকগুলি এমন শব্দ আছে, যাকে আন্তর্জাতিক শব্দ ব'লে নির্দিষ্ট করা যায়। অথচ এ-গুলোকে কোন জাতি-বিশেষের শব্দ ব'লে নির্দিষ্ট করা চলে না। এ-গুলোকে নিজেদের বাংলা ভাষার ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক প্রকৃতি অনুসারে আত্মস্থ ক'রে ভাষার অঙ্গীভূত ক'রে নিতে হবে। তাতে আমাদের ভাষাও উন্নত হবে, আমাদের ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রও দেশে সম্প্রসারিত এবং বিদেশে সহজতর হবে।

৪ —

পঞ্চমতঃ, বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন মনকে সর্ববিধ সংস্কার থেকে উন্মুক্ত রাখতে হয়, তার পরিভাষা তৈরির বেলায় ভাষা-ব্যবহারের ব্যাপারেও কোন বিশেষ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি অতিরিক্ত প্রবণতা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হয়। 'পরিভাষা' ভাষাগত প্রকাশ-ক্ষমতার অভাব সূচিত করে। এ-অভাব পূরণ করার জন্য যে-ভাষারই আশ্রয় নিতে হয়, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে তা গ্রহণ করতে হবে। ইউরোপীয় ভাষার বেলায় লাতিন-গ্রীক ভাষার সাহায্য ছাড়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা একরূপ অচল। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির বেলায়ও সংস্কৃত-ভাষার সাহায্য ছাড়া চল্‌বে না। যাঁরা সংস্কৃতের নাম শুন্‌লেই নাক সিট্‌কান, তাঁদেরকে এ-ভাষাতাত্ত্বিক সত্য মেনে নিতে হবে।

ষষ্ঠতঃ, পরিভাষার ক্ষেত্রে অনুকরণ, অনুসরণ, গ্রহণ বা বর্জন দূষণীয় নয়। আবশ্যক মতো তা করতে হবেই। তবে, তা করবার আগে সে-কাজ করার ক্ষমতাও অর্জন করতে হবে। নইলে অনুকরণ হবে ভাঁড়ামি, অনুসরণ হবে বিপথগামিতা, গ্রহণ হবে দুর্বলতা এবং বর্জন হবে মূঢ়তা।*

* জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত "বাংলা ভাষার ব্যবহার : ব্যবহারিক জীবনে, উচ্চ-শিক্ষায়" শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ। ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩।

আরবী-ফার্সীর বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

মুখ্যতঃ ফার্সী এবং গৌণতঃ আরবী-ভাষার দীর্ঘ-চর্চাসূত্রে এই দুই ভাষার বহু শব্দ আজ বাংলা-ভাষার অঙ্গীভূত। এই শব্দগুলি এখন বাংলা-উচ্চারণ ও বাংলা-ব্যাকরণ দ্বারা ন্যূনাধিক প্রভাবিত। ভাষাতাত্ত্বিক কারণে এই সমস্ত শব্দের বিশুদ্ধায়ন একান্তই অবাঞ্ছিত। তাই, এই জাতীয় শব্দের কথা বাদ দিয়া, ধর্মীয় কারণে কুর্‌আন্-হদীথ্-এর মূল-পাঠের, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আরবী নামের এবং নির্ভুলতার খাতিরে অভিধান (lexicon), অভিসন্দর্ভ (thesis) প্রভৃতিতে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দাদির উচ্চারণ-বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য বাংলার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরবী-ফার্সী বর্ণমালার প্রতিবর্ণীকরণ-রীতি অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই নিম্নলিখিত পদ্ধতি দুইটি উদ্ভাবিত হইল :

(১) আরবী-বর্ণমালার বাংলা-প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি

ব্যঞ্জন-বর্ণ		স্বরবর্ণ		ব্যঞ্জন-বর্ণ	
বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী স্বরধ্বনি	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ
য	ض	অ	َ	ঊর্ধ্ব কমা '	ا ـ ء
ত়	ط	ি=ই	ِ	ব	ب
য	ظ	উ=ু	ُ	ত	ت
ঊর্ধ্ব কমা '	ع	অন্	ً	থ	ث
ঘ	غ	ইন্	ٍ	জ	ج
ফ	ف	উন্	ٌ	হ	ح
ক়	ق	্=(হস্ চিহ্ন)	ْ	খ	خ
ক	ك	আ=া	اَ ; ا	দ	د
ল	ل	আ=া	آ	দ	ذ
ম	م	ঈ=ী	ىِ ; ا	র	ر
ন	ن	ঊ=ূ	وُ	য	ز
অন্তঃস্থ-ব্	و	ঔ=ৌ	وَ	স	س
হ	৪=ة	ঐ=ৈ	ىَ	শ	ش
য়	ى	বর্ণদ্বিত্ব-চিহ্ন	ّ	স	ص

ফৈধ়=فَيْض O সৈয়িদ=سَيِّد O ঔলাদ=أَوْلَاد O সমাৱাত=سَمَاوَات

কৌথর=كَوْثَر O শৈখ=شَيْخ O দালিক=ذَالِكَ O কৈয়ূম=قَيُّوم

'ঈদ=عِيد O ৱাহিদ=وَاحِد O মজ়লূম=مَظْلُوم O বত্ত্বহ=بَطَّة

তৈর=طَيْر O শম্সু-'ধ্-ধুহা=شَمْسُ الضُّحَى O ইয়্যা ক ন'বুদু=

إِيَّاكَ نَعْبُد O মুহম্মদ ইন্'আমু-'ল্-হক্ক=مُحَمَّد إِنْعَامُ الْحَقّ

ত'আলা=تَعَالَى O আমীন=أَمِين O ঘৈবী=غَيْبِي O মঘ্‌রিব=

مَغْرِب O স্বাহিব=صَاحِب O ম'ম'=مَعْمَع O ম'সূম=مَعْصُوم

মৈয়িত=مَيِّت

ব্যাখ্যা

মৌলিক প্রশ্ন

ঐতিহাসিক কারণে আমাদের আরবী-উচ্চারণ অনেকটা ইরানী বা ফারসী-উচ্চারণের দ্বারা প্রভাবিত এবং ভৌগোলিক কারণে এই উচ্চারণে বাংলা-ভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যও বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভঙ্গী লইয়া স্বাভাবিকভাবে মিশিয়া গিয়াছে। ফলে, আমাদের বর্তমান আরবী-উচ্চারণ (অবশ্য, 'কারী'-র বহু-অনুশীলিত আরবী-উচ্চারণের কথা ছাড়িয়া দিয়া) একটি জগাখিচুড়ি উচ্চারণে পরিণত হইয়াছে। এই

নূতন, অথচ স্বাভাবিক, উচ্চারণের হাত হইতে এই দেশের কেহই সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। এমন কি, কাহাকে মুক্তি দেওয়াও সম্ভবপর নহে। তবে, চেষ্টার দ্বারা এই নব-উদ্ভূত পরিস্থিতির উন্নতি-বিধান সম্ভবপর। আরবী-বর্ণমালার বাংলা-প্রতিবর্ণীকরণের বর্তমান প্রচেষ্টার মূলে এই বোধটুকুই ক্রিয়া করিয়াছে।

বলাবাহুল্য, বাংলা-বর্ণমালাকে যে-ভাবেই রূপান্তরিত করা হউক না কেন, তাহা কেহই সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইতে রাজি হইবেন না। ইহার মূল-কারণ প্রথম অনুচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও, আরবী-বর্ণমালার খাঁটি উচ্চারণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এবং লাতিন বর্ণমালায় আরবী-বর্ণমালার প্রতিবর্ণীকরণের রীতি সম্মুখে রাখিয়া, অনেক ভাবনা-চিন্তার পর বর্তমান রীতি উদ্ভাবিত ও গৃহীত হইল।

গৃহীত রীতির বৈশিষ্ট্য

জানি,—বক্ষ্যমাণরীতি সকলের সমভাবে মনঃপুত হইবে না। তথাপি, এই রীতির পক্ষে বক্তব্য এই যে, ইহা খাঁটি আরবী-উচ্চারণের তিন-চতুর্থাংশ কাছাকাছি এবং যথাসাধ্য ধ্বনিতত্ত্ব-ভিত্তিক বলিয়া বৈজ্ঞানিক। অধিকন্তু, ফারসী-উচ্চারণ-প্রভাবিত আরবী-ধ্বনিতত্ত্বের সহিত ইহার কোন যোগ রাখা হয় নাই, বাংলাদেশী আঞ্চলিক ভঙ্গীপ্রবণ বাংলা-উচ্চারণের সহিতও ইহার তেমন কোন বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষিত হয় নাই।

বিশেষতঃ, আরবী-বর্ণমালার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই বাংলা-প্রতিবর্ণীকৃত বর্ণমালায় আমদানী করা হইয়াছে। তাহা এই:—একই আকৃতির আরবী বর্ণের উপরে বা নীচে এক বা একাধিক 'বিন্দু' বসাইয়া এক বর্ণ হইতে আর এক বর্ণকে পৃথক্ করিবার যে-রীতি প্রচলিত, তাহা অবিকল ঐভাবে বাংলা-বর্ণমালায়ও আমদানী করা হইয়াছে। অন্য কথায়, যতগুলি বাংলা-বর্ণে 'বিন্দু' বসানো হইয়াছে, তাহার অবস্থান ও সংখ্যা আরবী-বর্ণমালায় 'বিন্দু'র অবস্থান ও সংখ্যা-নির্দেশক। ফলে, বাংলা-বর্ণমালার কোন্ বর্ণ আরবী-বর্ণমালার কোন্ বর্ণের প্রতিনিধি, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, আরবী 'د' (দাল) বর্ণের বাংলা 'দ'-বর্ণ হইল পূর্ণ প্রতিলিপি। অথচ, আরবী 'ذ' (বর্গীয় 'জ'-এর আমেজমাখা 'দ') বর্ণের জন্য বাংলা-

বর্ণমালায় 'দ' ব্যতীত অন্য কোন প্রতিলিপি নাই। সেই জন্যই আরবী বর্ণের ন্যায় বাংলা 'দ'-বর্ণের উপর একটি 'বিন্দু' বসাইয়া 'ذ' বর্ণের প্রতিনিধি (প্রতিলিপি নহে) করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ভাবে (বিন্দু-বসানো) 'দ'-বর্ণকে (বিন্দু-বসানো) ذ বর্ণের প্রতিনিধি করা হইল। ইহার অর্থ, বর্গীয় 'জ'-এর আমেজমাখা 'দ' বা 'ذ'।

বিশিষ্ট আরবী-ব্যঞ্জন-ধ্বনি

বাংলাভাষীর মুখে আরবী ج , ذ , ز , ض , ظ বর্ণগুলির উচ্চারণ প্রায় এক রকম; ফার্‌সীভাষীর মুখেও প্রায় তাই। অথচ, আরবীতে এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটির উচ্চারণ পৃথক্। দুঃখের বিষয়, বাংলা-বর্ণমালায় একটা বর্গীয়-'জ' ব্যতীত এতগুলি আরবী-বর্ণের উচ্চারণ আদায় করিবার জন্য অন্য কোন বর্ণ নাই। অবশ্য, বাংলা-ভাষায় অন্তঃস্থ-'য' কোন শব্দের আদিতে বসিলে, বর্গীয়-'জ' বর্ণের মতো উচ্চারিত হয়। অথচ, ইহার প্রকৃত 'ইঅ'-উচ্চারণটি শব্দের মধ্যে বা শেষে বসিয়া ইহা এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ইহার আদ্য-ধ্বনি পৃথক্ করিবার জন্য অন্তঃস্থ-'য' বর্ণের তলায় একটা ফুট্‌কি বসাইয়া 'য়' (ইঅ) ধ্বনির নির্দেশ দেওয়া হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, বর্গীয-'জ' বর্ণের সমধ্বনি আদ্য অন্তঃস্থ-'য' বর্ণে পাওয়া যায়। তাহাকে মানিয়া লইয়াও, পাঁচটি আরবী-বর্ণের জন্য বড় জোর দুইটি বাংলা-বর্ণ 'জ', 'য' পাওয়া গেল। অবশিষ্ট তিনটিকে বাংলায় পৃথক্ করিবার উপায় কি?

আরবীতে ج, ز, ظ, বর্ণের উচ্চারণ পৃথক্ হইলেও কতকটা কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে, 'ج' বাংলা বর্গীয়-'জ' বর্ণের প্রতিলিপি না হইলেও, প্রতিনিধি হইবার পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। তাই, 'ج'-বর্ণের জন্য তলায় বিন্দুযুক্ত বর্গীয়-'জ' ব্যবহার করা হইল; শব্দাদ্যে ব্যবহৃত অন্তঃস্থ-'য' বর্ণকে 'ز'-বর্ণের প্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল এবং উপরে বিন্দুযুক্ত বর্গীয়-'জ' বর্ণকে 'ظ'-বর্ণের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হইল। এইভাবেই এই সমস্যার সমাধান বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্ভব।

ফার্সী ও বাংলা-উচ্চারণে ث, س, ص, বর্ণগুলির উচ্চারণ প্রায় একরূপ। অথচ, আরবী 'ث'-বর্ণ উষ্ম-দন্ত্য, 'س'-বর্ণ সম্পূর্ণ-দন্ত্য এবং 'ص'-বর্ণ অন্তঃস্থ-'ব' বর্ণের আমেজমাখা দন্ত্য-ধ্বনি। তাই, 'থ'-এর মাথায় বিন্দু দিয়া 'ث', শুধু দন্ত্য-'স' দিয়া 'س' এবং দন্ত্য-'স' বর্ণে অন্তঃস্থ-'ব' অর্থাৎ 'স্ব' দিয়া ص বুঝানো হইয়াছে।

আরবী ت এবং ط-এর উচ্চারণ বাংলা ও ফারসী উচ্চারণে প্রায় এক। আরবী 'ت'-বর্ণ সম্পূর্ণ-দন্ত্য এবং 'ط'-বর্ণ অন্তঃস্থ-'ব' বর্ণের আমেজমাখা দন্ত্য-বর্ণ। এই কারণেই, 'ت' বর্ণকে দন্ত্য-'ত' দিয়া এবং 'ط'-বর্ণকে দন্ত্য-'ত' বর্ণে অন্তঃস্থ-'ব' অর্থাৎ 'ত্ব' দিয়া পৃথক করা হইয়াছে।

আরবী ق এবং ک বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ কণ্ঠ্য। তবে, প্রথমটির উচ্চারণ নিম্ন-কণ্ঠ্য এবং দ্বিতীয়টির উচ্চারণ ঊর্ধ্ব-কণ্ঠ্য। তাই, বাংলায় অঘোষ-কণ্ঠ্য 'ক'-বর্ণ দিয়া আরবী 'ک'-বর্ণের এবং মাথায় দুই বিন্দুযুক্ত 'ক̈' দিয়া 'ق'-বর্ণের প্রতিনিধি ঠিক করা হইয়াছে।

আরবী 'হম্‌যহ্' বা ا (অলিফ) এবং 'ع'-বর্ণের সমকক্ষ অথবা কাছাকাছি উচ্চারণ-বিশিষ্ট কোন বাংলা-বর্ণ নাই। এইগুলি সেমীয় আরবী-ভাষার একান্ত বিশিষ্ট বর্ণ। সুতরাং, বাধ্য হইয়াই আরবী ا-বর্ণের জন্য বাংলায় 'ঊর্ধ্ব-কমা (')' এবং 'ع'-বর্ণের জন্য বাংলায় 'উল্টা-কমা (')' ব্যহার না করিয়া পারা যায় নাই। বলা বাহুল্য, রোমান-অক্ষরে আরবী হরফের প্রতিবর্ণীকরণেব কাজেও এই দুইটি চিহ্নই ব্যবহৃত হয়।

আরবীতে দুইটি 'হে'-বর্ণ আছে; যথা—ح, ۿ/ه। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'ح'-বর্ণটি 'নিম্ন-কণ্ঠ্য গভীর উষ্ম-ধ্বনি' এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ۿ/ه বর্ণটি 'ঊর্ধ্ব-কণ্ঠ্য হাল্‌কা উষ্ম-ধ্বনি'। অধিকন্তু, প্রথম ও দ্বিতীয়টির আকৃতিতেও বিস্তর তফাৎ। দ্বিতীয়টির উপরে কখনও কখনও দুই বিন্দু বসাইয়া এই পার্থক্য দেখাইয়া দেওয়া হয়। বাংলায় যে-চারিটি উষ্ম-ধ্বনি (শ, ষ, স, হ) আছে, তন্মধ্যে একমাত্র 'হ'বর্ণই কণ্ঠ্য-ধ্বনি জ্ঞাপন করে। আবার তাহার উচ্চারণও হাল্‌কা। তথাপি, বাধ্য হইয়া আরবী 'ح'-বর্ণকে বাংলা 'হ'-বর্ণ দিয়া এবং 'ۿ/ه'-বর্ণকে দুই বিন্দুযুক্ত 'হ̈'-বর্ণ দিয়া লিখিতে হইয়াছে। ইহাতে আরবীর ন্যায় বাংলা বর্ণ দুইটির মধ্যে পার্থক্য সূচিত হইবে।

আরবী-ভাষার 'و' বর্ণটি উচ্চারণে বাংলা-ভাষার অন্তঃস্থ-'ব' বর্ণের অনুরূপ। বলা বাহুল্য, বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত 'ব'-ফলাগুলি অন্তঃস্থ-'ব'। যদিও বাংলা 'সোয়াস্তি' (স্বস্তি), 'সোয়ামি' (স্বামী), 'সোয়াদ' (স্বাদ) প্রভৃতি বিশেষ্য শব্দে অন্তঃস্থ-'ব' বর্ণের 'ওয়' নামক মূল উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে এই ধ্বনি বাংলা-ভাষায় অন্যভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এমন কি, লেখায়ও বর্গীয়-'ব' ও অন্তঃস্থ-'ব' এক হইয়া গিয়াছে। তাই, আরবী 'و'-বর্ণের জন্য অন্তঃস্থ-'ব' ব্যবহার করিতে গিয়া তাহার তলায় একটি রেখা দিয়া অন্তঃস্থ-'ব্' বর্ণ প্রস্তুত করিয়া ইহাকে বর্গীয়-'ব' হইতে আকৃতিতে পৃথক্ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, আরবী অন্য ব্যঞ্জন-বর্ণের বাংলা প্রতিলিপি আছে। সুতরাং, তাহাদের কোন প্রতিনিধির আবশ্যক নাই। উপরে প্রদত্ত তালিকার যথাস্থানে তাহা দেওয়া হইয়াছে।

বিশিষ্ট আরবী-স্বরধ্বনি

আরবী-লেখায় ই'রাব বা স্বরধ্বনি ব্যবহৃত হয় না। শব্দান্ত্য-স্বরধ্বনি ব্যাকরণের এবং শব্দমধ্য-স্বরধ্বনি অভিধানের সাহায্যে ঠিক করিয়া লইয়া আরবী-লেখা পড়িতে হয়। কিন্তু, বাংলা লেখায় স্বরধ্বনি ব্যবহৃত না হইলে, সেই লেখা একেবারেই অচল। এইখানেই আরবী-লেখার সহিত বাংলা-লেখার মৌলিক প্রভেদ নিহিত। এই জন্য আরবী-লেখা বাংলায় অনুলিখিত হইলে, আরবীর গুপ্ত স্বরধ্বনি বাংলায় ব্যক্ত করিতে হয়। ফলে, বাংলা-অনুলিখনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যাগুলি নিম্নে আলোচিত হইতেছে:

আরবী-ভাষার একক স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে 'যবর' একটা বিচিত্র স্বরবর্ণ। ইহার উচ্চারণ বাংলা স্বরবর্ণের 'অ' অথবা 'আ'-ইহাদের কোনটিই নয়; বরং দুইয়ের মাঝামাঝি একটা বিশিষ্ট স্বরধ্বনি। ইহা অগ্রবর্তী বা পশ্চাদ্বর্তী স্বর ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির দ্বারা হরদম প্রভাবিত হইয়া, কখনও অর্ধ-সংবৃত-'অ', আবার কখনও অর্ধ-বিবৃত-'আ'-রূপে উচ্চারিত হইতে থাকে। সুতরাং আরবী-স্বরবর্ণে ইহার উচ্চারণগত অবস্থান অত্যন্ত পিচ্ছিল।

বাংলা-ভাষায় 'অ'-স্বরের উচ্চারণ সাধারণভাবে অর্ধ-সংবৃত হইলেও, কিছুটা পিচ্ছিল। কেননা, বাংলা 'অ'-স্বর কখনও সংবৃত-'ও', কখনও স্বাভাবিক অর্ধ-সংবৃত-'অ', আবার কখনও বিবৃত-'আ' ধ্বনিরূপে উচ্চারিত এবং এখন লিখিতও হইয়া থাকে। উদাহরণ দেওয়া যাউক:—

'অ'=সংবৃত-'ও'—অতি=ওতি; ভাল=ভালো; হ'ল=হোল; মত=মতো।
'অ'=বিবৃত-'আ'—অকাল=আকাল; অকাট=আকাট; অঘাটা=আঘাটা।
'অ'=স্বভাবিক অর্ধ-সংবৃত—অত; অঙ্ক; অনাবিল ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ।

বাংলা 'অ'-স্বরের উচ্চারণে এই পিচ্ছিলতা আছে বলিয়াই, ইহাকে আরবী 'যবর'-এর জন্য ব্যবহার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। ইহার জন্য একবার 'অ'-স্বর আবার একটু পরেই 'আ'-স্বর (এখন যেমন ব্যবহৃত হইতেছে) ব্যবহার করিলে, বিভ্রান্তির অবসান হইবে না।

বাংলা 'আ'-স্বর সম্পূর্ণ বিবৃত-ধ্বনি। আরবীতে 'যবর'-এর পর 'অলিফ্' আসিলেই ধ্বনিটি সম্পূর্ণ বিবৃত হয়,—নতুবা নহে। এই হিসাবে 'যবর'-এর পর 'অলিফ্' হইলেই, বাংলায় 'আ'-স্বর ধরা হইয়াছে। আরবী 'খাড়া-যবর্'-ও বিবৃত 'আ'-স্বর। কিন্তু, 'আলিফ্'-এর উপর 'মদ্দ্' (مٓد) হইলে, বিবৃত-'আ' আরও দীর্ঘায়িত হইয়া থাকে। এই জন্যই 'আ'-কারকে উপরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া এই আকৃতি 'ৗ' দিয়া বিবৃততর 'আ'-এর দ্বারা এই ধ্বনি দেখানো হইয়াছে।

আরবীতে দ্বিস্বর (diphthong) ধ্বনি প্রকাশতঃ দুইটি। তাহার একটি হইল, 'যবর'-এর পর 'و'=ব্ এবং অপরটি হইল, 'যবর'-এর পর 'ی'=য়। ইহাদিগকে 'ঔ'-ৌ এবং 'ঐ'-ৈ দিয়া আমরা বাংলায় লিখিয়া আসিয়াছি। তাই, বাংলায় আমরা মৌলবী (مَوْلَوِی), মৌলানা (مَوْلَانَا), মৌলুদ (مَوْلُود), তৌজী (تَوْجِی), তৌহীদ (تَوْحِید), তৌফীক (تَوْفِیق), দৌলত (دَوْلَت), প্রভৃতি অনেক শব্দ এবং গৈবী (غَیْبِی), কৈফিয়ত (کَیْفِیَت), তৈয়ার

(تَيَّار), সৈয়দ (سَيِّد), ফৈজত (فَيْضَت), তৈয়ম্মম (تَيَمُّم)

প্রভৃতি বহু শব্দ পাইতেছি। ইহা হইতে দেখা যাইবে, আমরা আরবী

وْ — এবং ىْ —এর জন্য অলক্ষিতে 'ঔ'=ে ৗ এবং 'ঐ'=ৈ নামক দ্বিস্বর দুইটি ব্যবহার করিয়াছি ও করিতেছি। অবশ্য, বাংলায় সর্বত্র এই নিয়মে কাজ হয় নাই বা হয় না। বাংলা-ভাষার এই প্রচলিত রীতিকে আরবী দ্বিস্বর দুইটির কাছাকাছি বাংলা দ্বিস্বর বলিয়া ধরিয়া লইয়া, এই রীতির ব্যাপক ব্যবহার চালু করার জন্যই ইহাদিগকে গ্রহণ করা হইল। ইহাদের স্থলে নূতন রীতির প্রচলনে কোন স্বার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যাহা চলিত তাহাকেই চালু রাখা উচিত। যাহাতে লোক অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে নাকচ করিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

এতদ্ব্যতীত, আরবীর অন্য স্বরগুলি বাংলার তৎশ্রেণীর স্বরের অনুরূপ। তাহা উপরে প্রদত্ত তালিকায় দেখানো হইয়াছে। এই স্থলে তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

বাংলা-ভাষায় স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত আরবী শব্দ

বাংলা-ভাষায় স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (naturalised) আরবী-ভাষার শব্দ-সংখ্যা নেহাত কম নহে। এইরূপ কতকগুলি শব্দ উপরের অনুচ্ছেদে দেখানো হইয়াছে। এই শব্দগুলির বাংলা বানানে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। বাংলা-ভাষায় বহুপ্রচলিত 'আরব' বা 'আরবী' বানানেও হস্তক্ষেপ করিয়া 'অরব (عَرَبْ) বা 'অরবী (عَرَبِىْ) করা হয় নাই। ইহার সঙ্গত কারণ অছে।

যে-সমস্ত আরবী শব্দ-যুগান্তের ব্যবহারের ফলে বাংলা-ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়া বাংলা বনিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (naturalised) হইয়াছে, তাহা দেশের ধ্বনি-প্রবাহে ও লিখন-রীতিতে বাংলা-ভাষার সহিত সম্পূর্ণরূপে বা বহুলাংশে এক হইয়া যাওয়ায়, রচনাশৈলীতে ও

ভাবপ্রকাশে বাংলা-ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শব্দাবলী ব্যতীত এই জাতীয় আরও কতকগুলি শব্দ এইরূপ:—নেহাত (نِهَايَة), হদ্দ (حَدّ), হাউস (حَوْض), নগদ (نَقْد), হজম (هَضْم), তামাদি (تَمَادِي), তাম্বুরা (طَنْبُور), (কব্জ)-কব্জা (قَبْضَة) প্রভৃতি।

সাধারণ বাংলা-লেখায় এই শ্রেণীর শব্দের স্বাভাবিক বানানে, অর্থাৎ এতকাল শিক্ষিত ব্যক্তি যে-বানানে লিখিয়া আসিয়াছে, সে-বানানে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। কেননা, এই জাতীয় শব্দ এখন আরবী নহে, বরং বাংলা। প্রতিবর্ণী-করণের সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক বাংলা-লেখার বেলায়ও এইগুলিতে নূতন রূপ দিলে, ভাষার অঙ্গচ্ছেদ করা হইবে এবং ভাষা ভাব-প্রকাশের শক্তি হারাইয়া ফেলিবে। নেহাত অবিবেচক লোক ছাড়া কোন লেখকই ভাষাকে পঙ্গু করিবার জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অবশ্য, ধর্মীয় ও পাণ্ডিত্যমূলক লেখার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বলা বাহুল্য, প্রতিবর্ণীকরণের উদ্দেশ্য মূলতঃ পৃথক্। উহার সাহায্যে অপর-ভাষাকে ইহার আপন ধ্বনিতে সঠিকভাবে আয়ত্ত করিবার জন্যই এই রীতির প্রচলন করা হয়। সেই কাজ নিজের ভাষাকে পঙ্গু করিবার জন্য করা যাইতে পারে না। প্রশ্ন হইবে,—শব্দ তো ভাষায় রহিয়া গেল; তবে ভাষা পঙ্গু হইবে কেন? ইহার উত্তর বর্তমান জগতের বর্ণ-বৈষম্য-নীতিতে (colour prejudice) খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের ভাষায় অন্য কোন ভাষার পাঠ উদ্ধৃতির বেলায় অথবা, অন্য ভাষার অভিধান নিজের ভাষায় রচনা করিতে গিয়া সেই ভাষার শব্দের উচ্চারণ যথাসাধ্য সঠিক করিয়া তুলিয়া ধরিবার ইচ্ছায়, কিংবা ঐতিহাসিক নাম-ধাম ও ধর্মীয় শব্দাদিকে অপভ্রষ্টতার হাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে,—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বিশিষ্ট শ্রেণীর রচনায় ও পুস্তকে মূলের বিশুদ্ধতা রক্ষার তাগিদে, এই প্রতিবর্ণীকরণ-রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং, এই রীতির প্রয়োগ-ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত।

আরবী 'সম্বন্ধ-পদ'

বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ-রীতিতে আরবী 'সম্বন্ধ-পদ' বা "মুধাফ-মুধাফ-ইলৈহি" (مُضَافْ مُضَافْ اِلَيْهِ)-এর আমদানীও একটা সমস্যা। ইহার সহিত দুই নিকটবর্তী স্বরের পারস্পরিক সংযুক্তির প্রশ্নও বিজড়িত। আলোচ্য রীতিতে ইহা কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, নিম্নে সে-সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

যে দুই শব্দের দ্বারা আরবী 'সম্বন্ধ-পদ' গঠিত হয়, সে শব্দ-দুইটির মধ্যে তিনটি নীতি দুইটি আকৃতিতে ক্রিয়া করে; যেমন:—

(১) كِتَابُ زَيْدٍ

(২) عَبْدُ الأَحَدِ

(৩) هَارُوْنُ الرَّشِيْدِ

আকৃতির দিক হইতে, প্রথম সম্বন্ধ-পদে শব্দ দুইটি পাশাপাশি বসিয়াছে; তাহাদের মাঝখানে কোন কিছু নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্বন্ধ-পদে শব্দ দুইটি পাশাপাশি বসিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মাঝখানে 'ال' আসিয়া প্রত্যেকটির দ্বিতীয় শব্দের গোড়ায় যোগ দিয়াছে। নীতির দিক হইতে, (ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্বন্ধ-পদের প্রথম শব্দের শেষে কোন 'তন্‌বীন' (تَنْوِيْن) নাই। (খ) প্রথম সম্বন্ধ-পদের দ্বিতীয় শব্দের শেষে 'তন্‌বীন' আছে, অথচ অপর দুইটি সম্বন্ধ-পদের দ্বিতীয় শব্দের শেষে কোন 'তন্‌বীন' নাই। (গ) দ্বিতীয় সম্বন্ধ-পদের দ্বিতীয় শব্দের গোড়ায় অবস্থিত 'ال'-এর 'ل' উচচারিত; অথচ তৃতীয় সম্বন্ধ-পদের দ্বিতীয় শব্দের গোড়ায় অবস্থিত 'ال' সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত। এই 'ال'-বর্ণ দুইটি লইয়াই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিবর্ণীকরণের বেলায়

এই 'اَلْ' রাখিয়া দিবার পক্ষপাতী, তাঁহারা আরবী ধ্বনিতত্ত্বের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন এবং আরবী-ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে অশুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইয়া দিবার এক ফন্দি আঁটিয়া বসিয়াছেন। কারণ, আরবী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ "হারুন্-অল্-রশীদ্" এবং "অব্দ্-অল্-অহদ্" পড়িতেছেন। যাহা উচ্চারণে নাই, তাহা উচ্চারণ করিব, আর যাহা উচ্চারণে আছে, তাহাও উচ্চারণ করিব—এই রীতি অদ্ভুত ও অবৈজ্ঞানিক।

বলা প্রয়োজন যে, এইভাবেই এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে: যাহা লেখায় আছে, অথচ উচ্চারণে নাই, তাহা প্রতিবর্ণীকরণে দেখানো হইবে না ; কিন্তু উচ্চারণে লেখার কিছু লোপ করা হইল, এই ব্যাপারটি দেখাইয়া দিবার জন্য লুপ্ত স্থলে এইরূপ " ' " একটি লুপ্ত চিহ্ন দিয়া তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে দুই কুল রক্ষা পাইবে,—উচ্চারণও ঠিক থাকিবে, লেখায় কিছু ছিল, এই কথাও মনে পড়িবে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিয়া, উক্ত আরবী 'সম্বন্ধ-পদ' তিনটির বাংলা-প্রতিবর্ণীকরণ এইরূপ হইবে:—

كِتَابُ زَيْدٍ = কিতাবু-যৈদিন্

عَبْدُ الْاَحَدِ = 'অব্দু-'ল্-অহদি

هَارُوْنُ الرَّشِيْدِ = হারূনু-'র্-রশীদি

লক্ষণীয়ঃ

সম্বন্ধ জ্ঞাপনের জন্য সম্বন্ধের মূল শব্দ দুইটির মধ্যে 'হাইফেন' চিহ্ন দেওয়া অত্যাবশ্যক। এই 'হাইফেন' সম্বন্ধ-পদ ব্যতীত নিকটবর্তী দুই স্বরের পারস্পরিক সংযুক্তির বেলায়ও ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা প্রতিবর্ণীকৃত পাঠে গোলযোগ ঘটিবে। ইহার একটি উদাহরণ:—

هُوَ الَّذِىْ = হুৱ-'ল্লযী

(২) ফার্সী-বর্ণমালার বাংলা-প্রতিবর্ণীকরণ-পদ্ধতি

ফার্সী লেখায় আরবী-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় বটে, তবে উভয় ভাষার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বেশ পৃথক্। ফলে, বর্ণমালা এক হইলেও, আরবীর কতকগুলি বর্ণ ফার্সীতে বেশ পৃথক্‌রূপে উচ্চারিত হয়। অধিকন্তু, ফার্সীতে কতকগুলি বর্ণ অতিরিক্ত। এই দুইটি প্রধান বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ফার্সী বর্ণমালাকে বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃত করা যায়:—

জ — ض	প — پ
জ় — ظ	স় — ث
গ — گ	চ — چ
ন = ँ — ں	য় — ذ
হ় — ة	ঝ় — ژ

উদাহরণ

پدر = পিদর্; پژمرده = পঝ়্মুর্দাহ্; چمن = চমন্; ذهن = যিহ্ন, گرز = গুর্য; فروشگاه فردوسی = ফরূশ্গাহ্-ই-ফির্দৌসী; پامبر = পায়ম্বর; ژنگ = ঝ়নগ্; جنگ = জনগ্; چنگیز = চিন্গীয্।

সরকারী চিঠিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশের বাংলা পদ্ধতি

সম্প্রতি (১৯৭৩) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী কার্যালয়ে ব্যবহৃত কাজ-কর্মে অবিলম্বে বাংলা-ভাষার ব্যবহারে তৎপর হইতে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে নির্দেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার এই নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, এবং সেই হেতু অভিনন্দনযোগ্যও বটে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে যদিও জাতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা-ভাষার মর্যাদা আগেই স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে বাংলা-ভাষা চালু করিবার কিছু কিছু উদ্যোগও গ্রহণ করা হইয়াছিল, তথাপি বলিতে কি, বাঙালীর চিরাচরিত আলস্যবশে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দেশ-প্রেমের অভাব বশতঃ এতাবৎ তাহা তেমন ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কারণ, এই পদক্ষেপগুলি ছিল দ্বিধান্বিত এবং তাহাদের কার্য-কারিতা সম্পর্কে অনেকেই ছিলেন সন্দিহান। অধিকন্তু, এই কাজ সুসম্পাদিত করিবার জন্য যে উদ্যম, আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টা এবং উৎসর্গিত মনোভাবের প্রয়োজন, তাহার একান্তই অভাব ছিল।

সে যাহাই হউক, রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক (১৯৭৩) ঘোষণা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া সর্বস্তরে বাংলা-ভাষার ব্যবহারে সকলকে যে তৎপর হইতে নবতর অনুপ্রেরণা দান করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং একবার আন্তরিকভাবে সর্বস্তরে বাংলা-ভাষার প্রচলনে যথোপযুক্ত তৎপরতা প্রদর্শন করা হইলে, তাহা যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তবে, বাঞ্ছিত সফলতা অর্জন করিতে হইলে, আমাদিগকে সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সতর্কতার প্রয়োজন কোথায়, আশা করি, তাহা শিক্ষিত লোক মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন।

সরকারী, আধাসরকারী এবং প্রায় সর্ববিধ সরকারী কাজ-কর্মেই গত দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া এই দেশে ইংরেজী-ভাষার ব্যবহার

চালু রহিয়াছে। বাস্তব কারণেই সেই কাজ-কর্মের কায়দা-কানুন ভবিষ্যতেও আমাদিগকে বহুদিন মানিয়া চলিতে হইবে এবং শুধু মাধ্যমটিই জাতীয় মর্যাদা ও আত্মশ্লাঘার খাতিরে পরিবর্তন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, সেই মাধ্যম হইবে আমাদেরই মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষাও বটে,—বাংলা-ভাষা। অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা-সমূহের কাজকর্মে বাংলা-ভাষাব ব্যবহার প্রচলিত করিতে গিয়া আমাদের এই ব্যাপারে সতর্ক হইতে হইবে যে, আমরা যেন ইংরেজীতে কাজকর্ম চালু থাকা কালে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে অবশ্যগ্রহণীয় শব্দটি প্রযোগ করিয়া আসিয়াছি, বাংলা-ভাষা ব্যবহারকালেও যেন সেই শব্দের উপযুক্ত ভাব,অর্থ ও ব্যঞ্জনাবহ শব্দ চয়ন করিতে পারি। নিছক দায়সারা গোছের শাব্দিক অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহা যেমন ইংরেজী হইবে না, তেমন বাংলাও হইবে না।

বর্তমান নিবন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে উদাহরণ সহযোগে আমি বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিব। রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিকতম ঘোষণাব বেশ কিছু কাল পূর্ব হইতেই, সীমিতভাবে হইলেও সরকারী এবং আধাসরকারী পর্যায়ে বাংলায় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের রীতিটি ধীরে ধীরে চালু হইয়া উঠিতেছিল। এই সকল চিঠিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশের যে-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে, তাহা আমি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব কারণেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, সরকারের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া-মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমির এক প্রস্তাবের ভিত্তিতেই সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশের বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বাংলা একাডেমির প্রস্তাবটি সরকারী ও আধাসরকারী পত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশেব জন্য ব্যবহৃত কতিপয় ইংরেজী শব্দের দায়সারা গোছের শাব্দিক অনুবাদ মাত্র। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া-মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইহার পূর্ণ সমর্থনও ঐ শ্রেণীর দায়সারা গোছেরই কাজ। কারণ, তাঁহারা ইংরেজী শব্দগুলির (তাহাও আবার সম্পূর্ণ নহে) ব্যবহারিক তাৎপর্য অনুধাবন না করিয়াই শাব্দিক অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তাহা কিছুতেই গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ইংরেজী রীতি অনুসাবে ঐ-সমস্ত শব্দে যেই সম্ভ্রম ও বিনয় প্রকাশ পায়, বাংলা

অনুবাদে তাহার কোন প্রতিফলনই ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয়, অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহারা ইংরেজী শব্দগুলির 'ব্যঞ্জনা'র কথা বেমালুম ভুলিয়া গিযা, কেবল 'অভিধা'-র কথাই ভাবিয়াছেন। ইহাতে সম্বোধনে কোন 'সম্ভ্রম'ও প্রকাশ পায় নাই, কিংবা পরিসমাপ্তিতে কোন ব্যক্তিগত 'বিনয়'-ও ব্যক্ত হয নাই। সুতরাং এই অনুবাদ অগ্রাহ্য। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইংরেজদের সৌজন্য ও সম্ভ্রম ইংরেজের মত, আর বাঙালীদের সৌজন্য ও সমভ্রম বাঙালীর মত।

আমার কথা হইল এই যে, বাংলা চিঠিপত্রে কাহাকেও সম্বোধন করিতে গিয়া যদি 'সমভ্রম' প্রকাশ করিতে বা সৌজন্য দেখাইতে হয় এবং পত্রের পরিসমাপ্তিতে কেহ ব্যক্তিগত 'বিনয়' ব্যক্ত কবিতে চাহেন (বলা বাহুল্য, না চাহিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই), তবে বাংলা-ভাষায় লিখিত ঐতিহ্যবহ পত্রের কথা চিন্তা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির কথা চিন্তা করা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার পত্রগুলি এই ব্যাপারে বাঙালী-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবহ। এই ঐতিহ্যটিকে বজায় রাখিতে হইলে,—একজন বাঙালী হিসাবে আমি এই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত করা উচিত বলিয়াই মনে করি—বাংলা-ভাষায় লিখিত ঐতিহ্যবহ পত্রগুলির আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া "বাংলায় সরকারী ও আধাসরকারী চিঠিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশের পদ্ধতি" ইংরেজী-ভাষার পটভূমিতে ঠিক করিয়া লইতে হইবে। আমার মতে বর্তমান সময়ই (১৯৭৪) এই কাজের জন্য সকলের চেয়ে বেশী উপযুক্ত। কারণ, আমাদের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে বর্তমান সময়ে দ্রুত বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত্‌ হইতেছে। ভাষার ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া গ্রহণ বর্জনের ইহাই সর্বাধিক প্রশস্ত কাল। এই সময়ে যাহা গৃহীত হইবে, তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া চালু থাকিবে ও পুরাতনভিত্তিতে নূতন ঐতিহ্যসৃষ্টির সহায়ক হইবে। আর যাহা বর্জিত হইবে, তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

এই মৌল কথা কয়টি স্মরণ রাখিয়া বাংলায় সরকারী ও আধাসরকারী চিঠিপত্রে সম্বোধন ও বিনয় প্রকাশের উপযুক্ত এবং গ্রহণীয় শব্দগুলি কি কি এবং কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহাতে বাংলায় ব্যবহারের জন্য ইংরেজীর সমশব্দ পাওয়া যাইবে।

(ক) সরকারী চিঠিপত্রে ব্যবহৃত শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা

From	প্রেরক
To	প্রাপক
Subject	বিষয়
Reference ...	পূর্বসূত্র, বরাত
In or with reference to ...	বরাতে, সূত্র ধরিয়া
(Sent) through proper channel ...	যথাপ্রথা প্রেরিত (হইল)
Sir, ...	মান্যবরেষু,/মাননীয়েষু,/সম্মানাস্পদেষু
Madam, ...	মান্যবরাসু,/মাননীয়াসু,/সম্মানাস্পদাসু
Dear Sir, Dear Madam, ...	প্রিয়জনেষু,/সজ্জনেষু ('সুজন' বা 'সুজনেষু' নহে। কেননা, 'সুজন' রোমান্টিকতা ব্যঞ্জক শব্দ)
Dear Mr. (so and so) ...	বন্ধুবর (অমুক) সাহেব,/বন্ধুবর (অমুক) বাবু
Yours faithfully (male) ...	আপনার বিশ্বাসভাজন, / আপনার বিশ্বাসাস্পদ
Yours faithfully (famale)...	আপনার বিশ্বাসভাজনীয়া, / আপনার বিশ্বাসাস্পদা
Yours obediently (male) ...	বিনীত, / অনুগত, / বশংবদ
Yours obediently (female)...	বিনীতা, / অনুগতা, / বশংবদা
Yours sincerely (male) ...	ভবদীয় অকপট-হৃদয়,/ভবদীয় সরলচিত্ত
Yours sincerely (female) ...	ভবদীয় অকপট-হৃদয়া./ভবদীয় সরলচিত্তা
Mr. (before the name of a Muslim—male) ...	জনাব / শ্রী ** (১)
Mrs. (before the name of a Muslim—female)...	জনাব / শ্রীমতী ** (২)
Mr. (before the name of a Hindu, Buddha or a Christian—male ...	শ্রীযুক্ত / শ্রী
Mrs. (before the name of a Hindu, Buddha or a Christian—female)	শ্রীযুক্তা / শ্রীমতী

Mr. & Mrs.	(অমুক) দম্পতি যেমন—Mr. & Mrs. Hamid =হামিদ-দম্পতি
Miss	কুমারী
Mrs.=Mistress	গৃহিণী
Messrs. (used as the plural of Mr. before the names of business firms)...	ভদ্রমহোদয়গণ

উদাহরণ ঃ –

(i) Messrs Karim Bakhsh... করীম বখ্‌শ্‌ আখ্যেয় ভদ্রমহোদয়েরা / করীম বখ্‌শ্‌ আখ্যাত ভদ্রমহোদয়গণ

(ii) Messrs Karim Bakhsh & Co. ... করীম বখ্‌শ্‌ কোম্পানীর ভদ্রলোকগণ।

(খ) চিঠিপত্র সংশ্লিষ্ট আরও কতিপয় জরুরী ও বহুব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ

Immediate	ত্বরিত
Immediate slip	ত্বরাপত্রী
Urgent	জরুরী
Urgent slip	জরুরী-পত্রী
Most urgent	চূড়ান্ত জরুরী
Confidential	বিশ্বস্ত
Confidential letter ...	বিশ্বস্ত-পত্র
Confidential cover ...	বিশ্বস্ত-খাম
Confidential clerk... ...	বিশ্বস্ত কেরানি (কেরানী'—এই বানান ভুল)
Secret	গোপনীয়, গুপ্ত
Secret letter	গোপনীয় পত্র, গুপ্তপত্র
Secret news	গোপন-সংবাদ, গুপ্তসংবাদ

Personal ... ... ব্যক্তিগত, স্বকীয়
Personal letter ... ... ব্যক্তিগত পত্র
At an early date ... ... অবিলম্বে
As early as possible ... যথাশীঘ্র সম্ভব
Immediately ... ... ত্বরায়
Private ... ... খাস, একান্ত
Private Secretary ... ... একান্ত সচিব, খাস সচিব
Privilege ... ... বিশেষাধিকার
Precis ... ... প্রেসি, সংক্ষেপায়ণ
Type Writer ... ... মুদ্রাক্ষরক
Typist (male/fem.) ... মুদ্রাক্ষরিক/মুদ্রাক্ষরিকা
Gazette ... ... ইস্তাহার
Gazetted ... ... ইস্তাহারে প্রকাশিত
Orderly ... ... আর্দালি
Peon ... ... পেয়াদা
Review ... ... পুনরীক্ষণ
Television... ... ... দূরেক্ষণ
Representation ... ... সমুপস্থাপনা
Report ... ... রিপোর্ট্,বিবরণী ('প্রতিবেদন'=অত্যন্ত বাজে অনুবাদ। বেতার হইতে শব্দটি বাদ দেওয়া উচিত।)
Miscreant... ... ... দুষ্কৃতিকারী ('দুষ্কৃতকারী' বলা বা লেখা নানা কারণে উচিত নহে)
Migration ... ... অভিপ্রয়াণ
Migration Certificate ... অভিপ্রয়াণ-প্রমাণক
Commission ... ... অধ্যায়োগ (অধি+আ+√যুজ+ঘঞ্)
High Commission... ... রাষ্ট্রীয় অধ্যায়োগ
Attested ; Attestation ... প্রত্যায়িত ; প্রত্যায়ন ('সত্যায়িত' বা 'সত্যায়ন' নহে)

**(১) মুসলমানদের নামের পূর্বে সম্ভ্রমসূচক 'জনাব' শব্দ পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহর্তব্য। অনেকে এখন অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রীলিঙ্গে 'জনাবা' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। 'জনাব' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ 'জনাবত', উচ্চারণ সৌকর্যে 'জনাবা', মূলে অশ্লীলতাব্যঞ্জক শব্দ। অতএব, ইহা সর্বথা পরিত্যাজ্য।

(২) 'শ্রী', 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীমান' প্রভৃতি শব্দ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল বাঙালীর নামের পূর্বে ব্যবহার করা চলে কি না, জাতিকে বাছিয়া লইতে হইবে। ৬০/৬৫ বৎসর পূর্বেও হিন্দু-মুসলমান সকলেই নিজেদের নামের পূর্বে 'শ্রী' ইত্যাদি লিখিতেন। আমরাও লিখিতাম, দলিল-দস্তবিজেও লিখিত হইত। ঈশা খাঁর কামানে বাংলায় 'শ্রী ইছা খান' ও শের শাহের টাকায় দেবনাগরিতে 'শ্রীসের সাহসা' এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর একমাত্র মুসলমান মহিলা কবি 'শ্রীমতী রহিমন্নিছা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক দলিলে 'শ্রী'-র ব্যবহার স্মর্তব্য। 'শ্রী' যেন হঠাৎ মুসলমানদের কাছে ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে 'বিশ্রী' হইয়া গেল। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, কতকটা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসংস্কারবশতঃ হিন্দুয়ানি বর্জনের তাগিদে এবং কতকটা জলাতঙ্কের মত সংস্কৃতাতঙ্কে বাংলার মুসলমান তাহাদের নামের পূর্ব হইতে 'শ্রী' লেখা বাদ দিতে থাকে। তখন বা তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে (সমসাময়িক হওয়াই স্বাভাবিক) মুসলমান বি. এ. পাশ করিলে নামের পূর্বে সম্ভ্রমসূচক **'মৌলবী' শব্দ এবং তন্নিম্নমানের ইংরেজী শিক্ষিত হইলে **'মুন্‌শী'** শব্দ ব্যবহার করিতেন। নামের পূর্বে 'শ্রী'-র পরিবর্তে 'জনাব' লেখার রেওয়াজ পাকিস্তান আমলেই চালু হয়। ইসলামী জোশে মূল শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ 'জনাবা' কোন্ অর্থ প্রকাশ করে, তাহা না বুঝিয়াই বাংলায় তাহা চালু হইতে থাকে। সুতরাং, পুংলিঙ্গে 'জনাব' এবং স্ত্রীলিঙ্গে (সংস্কৃত সদস্য-সদস্যা; সভ্য-সভ্যা; মনোরম-মনোরমা প্রভৃতির অন্ধ অনুকরণে) 'জনাবা' লিখিত হইতে থাকে। এখন বাংলার মুসলমানদিগকে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রসঙ্গতঃ এইখানেই আর একটি কথা বলিয়া রাখি। আমি মনে করি সরকারী চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবিজ প্রভৃতি (এইখানে আমাদের 'সংবিধানের ভাষা' স্মর্তব্য) সাধুভাষায় লিখিত হওয়া উচিত। কারণ, এই ভাষায় পদবিন্যাস-পদ্ধতি (Syntax) সুশৃঙ্খল, যথারীতি বিধিবদ্ধ ও

ব্যকরণ-সঙ্গত বলিয়া বাক্যের অর্থ গ্রহণে দ্বিমতের অবকাশ অত্যন্ত সীমিত। 'চলিত-ভাষায়' বাক্যের বাঁধন শিথিল বলিয়া (এই শিথিলতা আসে লেখকের মানসিক প্রবণতাহেতু বক্তব্য বিষয়ে, শব্দে, পদে বা বাগ্‌ভঙ্গীতে) 'চলিত-ভাষায়' গঠিত বাক্য অনেক সময় দ্ব্যর্থবোধক হইয়া পড়ে এবং সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়। অধিকন্তু, ইংরেজীতে যেমন সরকারী চিঠিপত্রের ভাষা, আইন-কানুনের ভাষা, ইস্তাহারের ভাষা, রাষ্ট্রীয় ঘোষণাদির ভাষা, উপন্যাস বা নাটকের সংলাপ শ্রেণীর হাল্‌কা, চটুল ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত রচনার মত নহে, বাংলায়ও তাহা তেমন হালকা ভাষায় রচিত হওয়া উচিত নহে। এই সমস্ত বস্তু ইংরেজীতেও গুরুগম্ভীর ও রক্ষণশীল ভাষায় রচিত। বাংলায় তেমন ভাষা হইল 'সাধু-ভাষা'—চটুল ও হাল্‌কা 'চলিত-ভাষা' নহে। এই জন্য সরকারী চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবিজে বাংলা-ভাষার 'সাধু' রীতি ব্যবহৃত হওয়া উচিত। আমাদের 'সংবিধানটি' সাধু-ভাষায় রচিত না হইলে, ইহার যে-অবস্থা ঘটিত, 'চলিত-ভাষায়' সরকারী চিঠিপত্র লিখিত হইলে, অবিকল সেই অবস্থাই ঘটিবে। ইহাতে কত প্রকারের বিভ্রান্তি যে ঘটিবে, তাহার হিসাব দেওয়া বা নেওয়া এখন সম্ভবপর নহে। একটি ছোট উদাহরণ দিতেছি: "আপিসে গেছলাম সকালে। বিকেলে ফিবে এসেই দেখি, পকেট থেকে পাঁচ টাকা খসে গেছে।" এই পাঁচ টাকা পকেটমার নিতে পারে, হারানো যাইতে পারে, যাতায়াতে ব্যয়িত হইতে পারে, এমন কি পথে ছোট খাট বস্তু ক্রয়েও খরচ হইতে পারে। টাকাটা কোন্ ঘটনায় 'খসে গেল', তাহা কে বলিবে? সরকারী কাজ কর্মে এমন কিছু ঘটুক, তাহা কেহ আশা করে না।

সর্বজনীন-ভাষা বা লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা
[Lingua-Franca]

"লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা' একটি বিদেশী কথা; আমাদের ভাষায় এসেছে ইউরোপ থেকে ইংরেজীর জাহাজে অতিথি হ'য়ে প্রভুত্ব বিস্তার করতে, যেমন এসেছিল ইংরেজ জাতি আমাদের দেশে রাজত্ব কর্‌তে। অতিথি থাক্‌বে অতিথিরূপে। সে যদি উ'ড়ে এসে জু'ড়ে বসবার আয়োজন করে, বাড়ির কর্ত্রী বাংলা-ভাষার তা' সহ্য হবে কেন? সে চায় না তাকে তাড়াতে;—চায় অতিথিরূপে তার যেটুকু প্রাপ্য তাকে তা' বুঝিয়ে দিয়ে নিজের ঘর নিজেই সামলে নিতে। তাই, আজ বাংলা-ভাষায় "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" কথার বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে আলোচনা আবশ্যকীয় হ'য়ে পড়েছে।

কথাটি বাংলা-ভাষায় নবাগত। তাই, এখনও ভাষার সাথে মিশে যেতে পারেনি। এর সাথে লোকের পরিচয়ও পাকা হ'য়ে ওঠেনি বেশি ক'রে, যদিও সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে এর ব্যবহার শিক্ষিত সমাজে বেশ বে'ড়ে গেছে। নতুন পরিচয়, নতুন আলাপ; প্রণয়ের মৌতাত তো একটু বেশি-বেশি ক'রে হবেই। যাতে আমাদের সে-মোহটা কেটে যায়, সে-চেষ্টা দেখবার প্রয়োজনও নেহাৎ কম নয়।

ভাষা-বিভ্রাট মানুষের একটা চিরন্তন সমস্যা। মানব-সংস্কৃতির আদি-কাল থেকেই জটিল আকার ধারণ ক'রে সকলের পক্ষে এ-সমস্যা একটা বড় রকমেব অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার সব চাইতে বড় নজীর হ'ল ইংরেজদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এতে "বাবিল মিনারের" অর্থাৎ Tower of Babel-এর যে-রূপক ব্যবহার করা হয়েছে তা' জানিয়ে দিচ্ছে ভাষা-সমস্যার অনৈতিহাসিক প্রাচীনতার দূরত্ব কতখানি। গোড়াতে সকলেই সকলের কথা বুঝ্‌তো। তারা পরামর্শ করলে, খোদা আকাশে থাকেন, আর আমরা থাকি মাটির ধূলায়। তা' হবে কেন? একটা মিনার উঠানো যাক; স্বর্গের রাজ্য বিজিত হো'ক। খোদা আকাশ থেকে

দেখ্লেন দুনিয়ার মানুষগুলি স্বয়ং খোদার উপর খোদকারি কর্‌তে শুরু করেছে। বাস, আর কি! খোদা বল্লেন, "দাও, পাজিদের ভাষা গুলিয়ে।" যেই কথা, সেই কাজ। ভাষা গেল গুলিয়ে, কাজ গেল তলিয়ে; চূন আন্‌তে বল্লে আসে সুর্‌কি, সুর্‌কির দরকার হলে চলে আসে কাট, 'উত্তর' বোঝাতে হয় 'দক্ষিণ', 'দক্ষিণ' বোঝাতে গিয়ে হ'য়ে পড়ে 'পশ্চিম'। কী দারুণ বিভ্রাট! কী ভীষণ কাণ্ড! মিনার আকাশের কিনারে গিয়েই থেমে গেল; মানুষগুলোর স্বর্গ জয়ের দুরাশা পড়্‌লো ভেঙ্গে খানখান হ'য়ে।

পৃথিবীতে ভাষার অন্ত নেই; কেহ কারো কথা বড় একটা বোঝে না। মানব-সভ্যতায় এ ভাষা-বিভ্রাট কত কত অনর্থ যে ঘটিয়েছে, তার কোন হিসেব নেই। এর জন্যই দুনিয়ার সব লোক এক সাথে জুটে কোন রকমের বড় কাজ ক'রে উঠ্‌তে পারেনি, এখনও পারছে না। পৃথিবীর সব চাইতে বড় ভাষাবিদ্ পণ্ডিতও পৃথিবীর ভাষাগুলোর সংখ্যার তুলনায় এত কম ভাষা জানেন যে, ভিন্ দেশের লোকেদের সাথে কথা বলতে গিয়ে, বোকা বনে যান। তখন তাঁদেরকেও দোভাষীর সাহায্য নিয়ে তবে পরের ভাষা বুঝ্‌তে হয়।

এই যে দুনিয়া-জোড়া ভাষা-বিভ্রাট, কখনও এর কি কোন প্রতিকারের চেষ্টা হয়নি? মানুষের মধ্যে ভাষা-বিভ্রাট যেমন চিরন্তন, মানুষের সাথে মানুষের মিলনের চেষ্টাও তেমন চিরন্তন। সভ্যতা-বিস্তারের সাথে সাথে দুনিয়ার বুকে মানুষে-মানুষে পরিচয় ও মিলনের চেষ্টাও বে'ড়ে গেছে। এ চেষ্টার ফলে, মানুষের জগৎব্যাপী ভাষা-বিভ্রাটের কিছু কিছু প্রতিকারও হ'য়েছে। তবে, কালে-কালে ও স্থানে-স্থানে এ প্রতিকার-প্রচেষ্টা ছিল এক একটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পৃথিবীতে এমন এক শ্রেণীর লোকও বরাবর দেখা গেছে, যাঁরা দুনিয়া জু'ড়ে সকল মানুষের জন্য এক ভাষা করার খোয়াব দেখেছেন। বাইবেলের "বাবিল-মিনারের" রূপকের পেছনেও এমন একটা মন উঁকি দিচ্ছে। তবে, তাঁদের সে-খোয়াব কল্পনার রঙীন-রাজ্য ছে'ড়ে কখনও ধরার ধূলায় নেমে আসেনি। তাই, দেখা গেছে কোন কোন জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে এবং উন্নত সংস্কৃতির বাহনরূপে কোন-কোন ভাষা কোন-কোন সময়ে এক-একটা বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আসিরীয়, গ্রীক, লাতিন, আরবী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাই তার উদাহরণ।

সময় এবং অবস্থার পরিবর্তনে কাজে ব্যাপার দাঁড়াল অন্য রকম। তখন জগতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি দুনিয়ার যাবতীয় ভাষা-বিভ্রাটের অবসান ঘটাবার প্রচেষ্টার সাথে আর তাল রে'খে চল্‌তে পারলে না। সভ্যতা-বিস্তৃতির সাথে সাথে সভ্যতার উপকরণ গেল বে'ড়ে; দরকার হ'ল দেশ-দেশান্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার; যাতায়াতের পথও হ'য়ে গেল খোলসা। তখন আসিরীয়, গ্রীক, লাতিন, আরবী ও সংস্কৃত প্রভৃতির ন্যায় এক জাতের নিজের ভাষায় ভাব আদান-প্রদান করা কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হ'য়ে দাঁড়ালো একটা কঠিন ব্যাপার, একটা জটিল সমস্যা। রাজশক্তির ভয় যেখানে নেই, উন্নত সংস্কৃতির প্রলোভন যেখানে শূন্য, সেখানে এক জাত আর এক জাতের ভাষা নেবে কোন্ দুঃখে? সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধ'রে ভাব-আদান-প্রদানের জন্য দুনিয়ার বুকে আর এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। এ-সমস্যার সমাধান কর্‌তে গিয়েই এক এক জায়গায় এক এক সময়ে এক এক 'সর্বকালীন ভাষা'র উদ্ভব হ'ল। ইউরোপ খণ্ডে এরই নাম হ'ল, "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" (Lingua-Franca), আফ্রিকায় হ'ল, "স্বোহিলি" (Swahili) ও "হৌস্‌সা" ("Haussa"), উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় হ'ল, "চিনূক" (Chinook), চীনদেশে হ'ল, "পিজিন্ ইংলিশ্" (Pidgin English) এবং ভারতে হ'ল "উর্দু"।

এই যে এতগুলি সর্বজনীন-ভাষা, এগুলির ভিতর "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা"-ই আমাদের কাছে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এটির কথাই ধরা যা'ক। এর উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কিন্তু ভারী মজার। ধর্মের প্রভাব, রাজশক্তির ভয়, সংস্কৃতির প্রলোভন—কিছুই এর উৎপত্তির মূলে ক্রিয়া করেনি। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাবই হ'ল এর উদ্ভবের মূল কারণ।

মধ্যযুগে ইউরোপের ভূমধ্য-সাগর-অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে ইতালী-দেশের পূর্ববর্তী সাগর-তীরে অর্থাৎ লেভান্ত্ (Levant) অঞ্চলে প্রাচ্য দেশের সাথে বাণিজ্য চল্‌ছিল জোরে। তখন ইতালীর ভেনিস্ (Venice) ও জেনোয়াই (Genoa) ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্র। এই দুই শহরে আরব, গ্রীক, আফ্রিকান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের বণিক্ পৃথিবীর নানা দেশের পণ্য-সম্ভার নিয়ে জমায়েৎ হ'ত। ইউরোপ খণ্ডের নানা দেশের সদাগরেরাও এখানে এসে ভিড় জমাতো ব্যবসার

খাতিবে। আমাদের অনেকেই ইহুদী শাইলকের সাথে বণিক্ এন্টনিওর "রিয়াল্তো" (Rialto) নামক ভেনিসীয় পুলে দেখা ও আলাপ-পরিচয় হবার কথা জানি। ভেনিস ও জেনোয়ায় তখন এ-জাতীয় "রিয়াল্তো"-এর অভাব ছিল না। এ-সমস্ত "রিয়াল্তো"-তে ব্যবসার আলাপ এবং লেন-দেনই হ'ত বেশি। আসলে এই "রিয়াল্তো"-গুলি আজকালকার দিনের "শেয়ার-মার্কেট" (Share-market)-এর অনুরূপ একটি ব্যাপার ;—অনুষ্ঠিত হ'ত ঘরে নয়, পুলের উপর, এই যা তফাৎ।

তখন দরকার হ'ল কথা বলার, পরস্পরের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের ; নইলে কাজকরা চলে না। এই গরজেই ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকগণ ভূমধ্য-সাগরের পূর্বতীরবর্তী স্থানে অর্থাৎ "লেভান্ত্" নামক অঞ্চলে তাঁদের নিজেদের অর্থাৎ ইতালীয় ভাষাকে এক সর্বজনীন ভাষা ক'রে তুল্লেন। এতে ইতালীয় ভাষা আর খাঁটি রইল না ; এর বিশুদ্ধি নষ্ট হ'ল। ইতালীয় ভাষার সাথে গ্রীক্, ফরাসী, স্পেনীয়, তুর্কী ও আরবী শব্দ গেল মিশে ; আর তার সাথে সাথে ইতালীয় ভাষার Inflexions বা শব্দ-সাধন-রীতি ও প্রকৃতি গেল পাল্টে। ইতালীয় ভাষা হ'ল একটা জগা-খিচুড়ি,—মস্তবড় এক ঠুটো জগন্নাথ। ফলে, এতে ইতালীয় শব্দ থাক্ল বেশি ক'রে, কিন্তু ইতালীয় ভাষার কৌলীন্য গেল ধূলিসাৎ হ'য়ে। সুবিধার মধ্যে হ'ল এই, জেনোয়া ও ভেনিসের "রিয়াল্তো"-গুলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বণিকদের আলাপ-আলোচনা ও গল্প-গুজবে মুখর হ'য়ে উঠ্লো।

এই যে জগা-খিচুড়ি ইতালীয় ভাষা, এরই নাম হ'ল "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা"। এর মানে হচ্ছে "ফ্র্যাঙ্ক্"-সুলভ বুলি বা ভাষা। "ফ্র্যাঙ্ক" এক শ্রেণীর লোকের নাম। এরা পুরানো জর্মন গোষ্ঠীরই ঐ এক দলের লোক, যারা খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফ্র্যাঙ্কোনিয়া (Franconia) থেকে বেরিয়ে এসে 'গল'-দেশ অধিকার ক'রে ফ্রান্স দেশ স্থাপন করেছিল। এই ফ্র্যাঙ্কদের ভাষাই পরে "ফ্রেন্স্" ভাষার সৃষ্টি করেছে। মধ্যযুগ অবধি লোকে এ-ভাষাকে শুধু যে ভাল চোখে দেখেনি তা' নয়, অসভ্যের ভাষা ব'লে ঘৃণা করেছে। এর থেকেই "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" অর্থাৎ মধ্য-যুগীয় ইউরোপের সর্বজনীন ভাষার পশ্চাতে একটা প্রাকৃত-জনোচিত ভাব অর্থাৎ হীনতার ভাব জড়িয়ে আছে। এ যেন চীনদেশের "পিজিন্ ইংলিশ্"—একটা নিম্ন শ্রেণীর, হীন প্রকৃতির নাককান-কাটা ইংরেজী।

আমাদের দেশেও এক সময় অশিক্ষিতদের মধ্যে এ জাতীয় খিচুড়ি ইংরেজীর চল ছিল। তারই একটা খুব জানা উদাহরণ হচ্ছে,—"সাব্, সাব্! ওয়ান্ বোতল্ ওয়ান্ পাইস্ ; টেক্ তো টেক্, ন টেক্ তো গো।"

"লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা" একটা মিশ্রিত বুলি বা ভাষা। কোন ভাষার খাঁটি ভাব এ-বুলিতে নেই। যে-কোন রকমে জোড়া-তালি দিয়ে নানান দেশের লোকের ভিতর কাজ-কারবার চালাবার জন্যই এ-বুলির উদ্ভব হয়েছিল। এ ছিল নেহাৎ মুখের ভাষা ; লেখার ভাষা এ-তখনও হয়নি। সুতরাং সাহিত্যে স্থান পাবার কথা ওঠেই না। এমন করে "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা"-কে বহুদিন মুখের বুলি হিসাবে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। মুখের বাইরে তাকে বড় কেউ পোছেনি। তথাপি মনে হয়, নানা জাতের বুলি বোঝাবার জন্য তখনকার কোন কোন ইউরোপীয় সাহিত্যে কথাটার ব্যবহার হয়েছে।

ফরাসী-ভাষার বেলায় এসেই "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" জাতে উঠ্‌লো,—কুলীন হ'ল। ইতিহাসে যা'কে আধুনিক যুগ বলে, সে সময় থেকে রাষ্ট্রীয প্রাধান্য ও সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের প্রভাবে ফরাসী-ভাষা হ'য়ে গেলো ইউরোপের "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" বা সর্বজনীন-ভাষা। ইউরোপের অনেক দেশের ভিতর ক্রমে ক্রমে এই ফরাসী-ভাষা ভাব আদান-প্রদানের বাহনরূপে অল্প-বিস্তর চালু হ'ল। ফরাসী-জাতির রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে আশ্রয় ক'রে ফরাসী-ভাষা "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা"-রূপে সাহিত্যেও স্থান পে'য়ে থাকবে। এই সে-দিনও ফরাসী-ভাষাকে ইউরোপ তার "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" ব'লে স্বীকার করেছে। এখন হাওয়া পাল্‌টে গিয়ে তা'র স্থান দখল করেছে ইংরেজী।

"লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কার" দিক থেকে উর্দুর অবস্থাও অনেকটা এরূপ। ভারতে "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" বলে কোন ভাষা প্রাচীন-কালে ছিল না। সংস্কৃতই ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষা এবং এর নানান প্রদেশে নানান ভাষা চালু ছিলো। উত্তর-ভারতের নানান দেশে নানান 'প্রাকৃত-ভাষা' অর্থাৎ সংস্কৃত-ভাষার প্রাদেশিক রীতির অপভ্রংশ ভাষা চল্‌তো। দিল্লী ও মীরাট অঞ্চলে তখন "সৌরসেনী প্রাকৃত"-ভাষার চল ছিল। এই "সৌরসেনী-প্রাকৃত" হ'ল 'প্রতীচ্য-হিন্দী' এবং ব্রজমণ্ডলের (মথুরা, দিল্লী ও তা'র আশপাশের) 'ব্রজ-ভাষা' প্রভৃতির জনক। নামজাদা উর্দু

সাহিত্যিক ও পণ্ডিত মুহম্মদ হোসেন আজাদের (মৃত্যু ১৯১০) মতে এই "ব্রজ-ভাষা" হচ্ছে উর্দুর জন্মদাতা। তিনি বলেন,—

اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان 'برج بھاشا' سے نکلی ہے اور 'برج بھاشا' خاص ہندوستانی زبان ہے لیکن وہ ایسی زبان نہیں کہ دنیا کے پردے پر ہندوستان کے ساتھ ہی آئی ہو۔ اسکی عمر آٹھ سو برس سے زیادہ نہیں ہے اور برج کا سبزہ زار اسکا وطن ہے + آب حیات (زبان اردو کا تاریخ)

"এ-কথা প্রত্যেকেই জানে যে আমাদের উর্দু-ভাষা ব্রজ ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং এই ব্রজ-ভাষা হচ্ছে খাস ভারতীয় (হিন্দুস্তানী) ভাষা। কিন্তু, এটি এমন একটা ভাষা নয়, যা' পৃথিবীর বুকে ভারতের অস্তিত্বের সাথে সাথেই এসেছে। এর বয়স আট শ' বছরের বেশি হয়নি; আর ব্রজ মণ্ডলই হচ্ছে এর জন্মভূমি।"—আব্-ই-হায়াৎ (উর্দু-ভাষার ইতিহাস অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

এর থেকেই দেখা যাবে, যাঁরা উর্দুকে সৌরসেনী-প্রাকৃতের সন্তান ব'লে মত পোষণ করেন, তাঁরাও নেহাৎ ভুল মত নিয়ে মাতামাতি করেন না। ব্রজ-ভাষা হ'ল সৌরসেনী প্রাকৃতেরই একটি বুলি (dialect), যা' দিল্লী ও মথুরা অঞ্চলের লোক বলত। এর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে ভারতের মুসলিম আভিজাত্য গর্বে গর্বিত ভাষা উর্দু। কিভাবে উর্দুর জন্ম হ'ল, তার সম্বন্ধেও সুপণ্ডিত মুহম্মদ হোসেন আজাদ একটা খুব খাঁটি মত প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন :—

اردو زبان اول لین دین نشست برخاست کی ضرورتوں کے لئے پیدا ہو گی۔ ہندؤں کے ساتھ ہندی مسلمان جو اکثر ایرانیوں یا ترکستانیوں کی اولاد تھے ہندوستان کو وطن اور اسی زبان کو اپنی زبان سمجھنے لگے۔ آب حیات

"গোঁড়ায় উর্দু-ভাষা লেন-দেন ও আদব-কায়দার আবশ্যকতা থেকে জন্ম-লাভ করেছে। হিন্দুদের সাথে হিন্দুস্তানী মুসলমান---যাঁদের বেশির ভাগ লোক ইরানী বা তুর্কীস্থানীদের বংশধর— হিন্দুস্তানকে নিজেদের জন্মভূমি এবং এদেশের ভাষাকে নিজেদের ভাষা ব'লে মনে কর্‌তে থাকে।"— আব্-ই-হায়াৎ।

অনুসন্ধান কর্‌লে দেখা যায়, ভারতে যখন (খ্রীস্টীয়-দ্বাদশ শতাব্দী) মুসলমানেরা এলেন বিজয়িবেশে এবং দেশে স্থায়ী হ'য়ে গেলেন অধিবাসী-রূপে, তখন ভারতের অধিবাসীদের সাথে ভাবের আদান-প্রদান, বস্তুর লেন-দেন, সামাজিক মেলা-মেশা ইত্যাদি বহু বিষয়ে বিজয়ী মুসলমানদের অসুবিধা হ'ল ভাষার জন্য, যেমন আজকাল নানা অসুবিধা হচ্ছে পশ্চিম-পাকিস্তানের সাথে পূর্ব-বাংলার। যে-সব মুসলমান প্রথমে ভারতে রাজ্য স্থাপন করলেন, তাঁরা বাড়িতে বল্‌তেন তুর্কী-ভাষা, আর লেখায় ব্যবহার কর্‌তেন ফার্‌সী বা তুর্কী মেশানো ফার্‌সী, যেমন এখনকার পাঞ্জাবের সরকারী চাকুরেগণ বাড়িতে হয় গুরুমুখী, না হয় পাঞ্জাবী ব্যবহার করলেও পোশাকী বা সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহার করেন উর্দু। ভারতের কোন ভাষাব সাথে ফারসী বা তুর্কীর যোগ ছিল না। তখন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গরজে বাধ্য হ'য়ে ভারতের হিন্দু ও বহিরাগত মুসলমান ভাবের আদান-প্রদান, টাকা-পয়সার লেন-দেন, রাষ্ট্রীয় মেলা-মেশা প্রভৃতি কর্‌তে গিযে উদ্ভব হ'ল এক জগাখিচুড়ি ভাষার,—যা সৌরসেনী প্রাকৃত কি ব্রজভাষাও নয়, ফার্‌সীও নয়, তুর্কীও নয় ;—এক অদ্ভুত বুলি বা মুখের ভাষা। এ মুখের ভাষা বা বুলিতে থাক্‌লো সব ভাষারই কিছু কিছু অংশ—যদিও এর মূল কাঠামো হ'ল মথুরা ও দিল্লীর আশ্‌পাশের চালু বুলি "ব্রজ ভাষা" বা "চালু হিন্দী"।

গোড়ায় কিন্তু এই জগা-খিচুড়ি ভাষার ব্যবহার সাহিত্যে হ'ত না। মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের প্রায় এক শতাব্দী পরে যখন কবিগণ ফার-সীতে কবিতা লিখে লিখে হয়রান হ'য়ে পড়্‌লেন এবং তার শ্রোতারাও বিশেষ একঘেয়ে বোধ করতে শুরু করলেন, তখন কবিগণ এই খিচুড়ি-ভাষার সাহিত্যিক চাট্‌নি ব্যবহার করে রুচি পাল্‌টাতেন। এ জাতীয় রচনার নাম ছিল "রেখ্‌তা" বা খিচুড়ি বুলির কবিতা। ফার্‌সী "রেখ্‌তা" (ریختہ) শব্দের অর্থও হ'ল মিশ্রণ বা বিক্ষেপ। এই "রেখ্‌তা"

শব্দে বুঝাতে চেষ্টা করা হ'ত যে, এটি এমন এক বুলি যার ভিতর নানান ভাষার শব্দ ও কথা ছড়িয়ে আছে। মোটের উপর, মথুরা ও দিল্লীর আশপাশের 'ব্রজ-ভাষা'' যখন খিচুড়ি হ'য়ে লেখায় কবিতার রূপ নিয়ে লোকের আনন্দ বর্ধন করত, তখন তাকে বলত "রেখ্তা"। এ যেন ছিল সাহেবদেরকে সাঁওতাল বা জুমিয়া নাচ দেখিয়ে আনন্দ দেবার আয়োজন।

তখন মুখে মুখে মথুরা ও দিল্লীর আশপাশে যে খিচুড়ি-বুলির ব্যবহার হ'ত, তার নাম ছিল পৃথক্। "রেখ্তা" বল্লে এ মুখের বুলিকে বুঝাতো না। তাকে বোঝাতে গিয়ে লোকে যে-শব্দ ব্যবহার করত, তা' হচ্ছে "উর্দু"। এর এই প্রকৃতি লক্ষ্য করে মীর আমান প্রমুখ উর্দু লেখক এবং গোড়ার দিক্‌কার বিদেশী পণ্ডিতগণ যে মত পোষণ করেছেন তা' হচ্ছে এরূপ :—

"Urdu is a mongrel pigeon form of speech made up of contributions from the varions languages which met in Delhi Bazaar."

"উর্দু হচ্ছে হরেক রকমের ভাষার শব্দ-সম্পদে তৈরী একটি খিচুড়ি-বুলি, যার সাক্ষাৎ দিল্লীর বাজারেই মিল্‌তো।" দিল্লীর বাজারে উর্দুব পবিচয় মেল্‌বার কারণ হ'ল, দিল্লী তখন মুসলমানদের রাজধানী। তাঁদের লোক-লস্করের স্থায়ী ছাউনি ছিল দিল্লীতে। এ সব লোক দেশের লোকেদের সাথে মিল্‌তে পে'ত বাজারে। তারা ভাবের আদান-প্রদান কর্‌তে গিয়ে এই খিচুড়ি বুলির ব্যবহার কর্‌ত। এখান থেকেই এই বুলি নাম পে'ল "উর্দু"। "উর্দু" তুর্কী ভাষার শব্দ ; --এর মানে হ'ল "ছাউনি" "উর্দু" শব্দ দিয়ে লোকে বুঝাতো যে এই বুলি 'ছাউনির' লোকেদের বুলি বা ভাষা।

দিল্লীর থেকেই এই খিচুড়ি ভাষা ভারতে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে চড়িয়ে পড়ে ; তাও লোক-লস্করের মারফতেই। এমন করেই উর্দু ভারতেব বিশেষ ক'রে উত্তর ও মধ্য ভারতের "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" বা সর্বজনীন ভাষায় পরিণত হয়েছে ধীরেসুস্থে। দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ ছাড়া আর কোথাও এর বিশেষ প্রভাব নেই। মোগল আমল থেকেই উর্দু বুলি সাহিত্যে ভালভাবে স্থান পে'য়ে জাতে ওঠে ও কুলীন হয়। তার পর

থেকে বেশি-বেশি ক'রে ফার্সী এবং তৎসূত্রে আরবী-ভাষার শব্দ এতে ঢুক্‌তে থাকে। তবু, এ-ভাষা কোন দিন মোগল আমলে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা লাভ করেনি। কুলীন হওয়ার পর থেকে এ-ভাষা ভারতের "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" বা সর্বজনীন ভাষার স্থান থেকে সরে পড়্‌তে থাকে। ফলে, এটি এখন উত্তর ভারতের কতিপয় মুসলমানের এবং হায়দরাবাদের সকলের ভাষারূপে দাঁড়িয়ে যায়। এখন পাঞ্জাবের আদালতের ভাষা উর্দু এবং যুক্ত-প্রদেশে উর্দু ও হিন্দী উভয়েই চলে।

সে যা'হোক, "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" (Lingua-Franca) কথার বাংলা অনুবাদ নিয়েই এ আলোচনার অবতারণা। সম্প্রতি (১৯৪৯-'৫০) রাজনৈতিক কারণেই কথাটার চল আমাদের মধ্যে বেজায় বে'ড়ে গেছে। একে বাংলায় কিভাবে প্রকাশ করা যায়, তার চেষ্টাও কম হয়নি। কেউ-কেউ কথাটার বাংলা অনুবাদ কবেছেন "**রাষ্ট্রভাষা**", কেউবা করেছেন "**সাধারণ ভাষা**", আবার কেউবা করেছেন "**আন্তর্জাতিক ভাষা**"। Lingua-Franca-এর মধ্যে "রাষ্ট্র" বুঝায় এমন কোন শব্দই নাই ; "সাধারণ" অর্থ বুঝায় এমন শব্দও দেখি না। সুতরাং Lingua-Franca কথার বাংলা "রাষ্ট্রভাষা" কিংবা "সাধারণ ভাষা" একেবারেই অচল। Lingua-Franca বর্তমানে গৌণভাবে International Language বুঝাইয়া থাকে। এই ইংরেজী International অর্থে বাংলা "আন্তর্জাতিক" শব্দের গঠন ভুল। 'আন্তর্জাতিক' শব্দের গঠনকগত অর্থ দাঁড়ায় 'জাতির মধ্যবর্তী' বা 'জাতির অন্তর্গত'। এই International অর্থে বাংলা করিতে হইলে 'সার্বজাতিক' শব্দ ব্যবহার করিতে হয়।

এই যে অনুবাদ-বিভ্রাট এর কারণ কি? একটু ভে'বে দেখ্‌লে মনে হয়, Lingua-Franca কথাটার উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখার ফলে এ-জাতীয় অনুবাদ বিভ্রাট শুরু হয়েছে। এর উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার বুৎপত্তির কথা বলা যা'ক।

Lingua-Franca কথাটা গঠনের দিক থেকে একটি শব্দসঙ্কর। লাতিন Lingua এবং জর্মন Franca শব্দদ্বয়ের যোগে কথাটা তৈরি হয়েছে ইতালীয়দের দ্বারা লাতিন-ভাষার প্রকৃতিসম্মত ব্যাকরণ অনুসারে। লাতিন Lingua (লিঙ্গুয়া) শব্দের অর্থ ভাষা। তৎসম

অর্থাৎ সংস্কৃত 'ভাষা' শব্দের মতো লাতিন 'লিঙ্গুয়া' শব্দ কথ্য এবং লেখ্য দুই ভাষাই বুঝায়। Frank হচ্ছে প্রাচীন জর্মন জাতির এক গোত্র; বর্বরতা বা প্রাকৃত জনোচিত অভদ্রতার ছাপ এই Frank (ফ্র্যাঙ্ক্) জাতির গায়ে লেগে আছে। ভূমধ্যসাগরীয় লেভান্ত্-অঞ্চলে পশ্চিম দেশাগত বর্বর জাতকেই বল্‌ত Frank (ফ্র্যাঙ্ক)। এই 'ফ্র্যাঙ্ক' শব্দ থেকেই লাতিনীকৃত রূপ হ'ল "ফ্র্যাঙ্কা" (Franka), আর ইংরেজী রূপ হ'ল Frankish (ফ্র্যাঙ্কিশ্)। সুতরাং "লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা"=Lingua-Franca কথার মানে দাঁড়াচ্ছে (বর্বর) 'ফ্র্যাঙ্কদের (অভদ্র) ভাষা'। অভিজাত ইতালীয়গণ 'রিয়াল্‌তো'-'সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ বণিকদিগের ব্যবসা সংক্রান্ত ইতালীয় ভাষার' এই অপভ্রংশকে বিদ্রূপভরে Lingua-Franca নাম দিয়েছিলেন। সুতরাং 'লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা' কথায় বিদ্রূপের ভাবও রয়েছে বিস্তর। এই বুৎপত্তির দিক্ থেকে যদি কথাটির অনুবাদ কর্‌তে হয়, তবে বড় সুবিধা হয় না; কেননা সেক্ষেত্রে বল্‌তে হয় 'বর্বর-ভাষা' বা 'প্রাকৃত-ভাষা'। অথচ, এখন আর এ-মানেতে এ-কথার ব্যবহার হয় না।

'লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা' বরাবরই একটি সঙ্কর ভাষা ছিল। নানান ভাষা-ভাষী লোক পরস্পর ভাব-আদান প্রদানের জন্য যে পাঁচমিশালী ভাষা মুখে মুখে ব্যবহার করেছে, তাই পরে "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" বলে পরিচিত হ'য়েছে। এটি চিরকাল গোড়ার দিকে মুখের বুলি ছিল; ভাষার রূপ নিয়ে লেখায় অর্থাৎ সাহিত্যে বড় একটা স্থান পায়নি। ভারতের 'প্রাকৃত'-ভাষার অবস্থাও গোড়ার দিকে ঠিক এমনই ছিল। বাংলার কথ্য বুলিও লেখ্য ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে খুব বেশী দিনের কথা নয়। বোধহয় বীর-বলই (প্রথম চৌধুরীই) প্রথম পশ্চিম বঙ্গের অর্থাৎ ভাগীরথী-তীরবর্তী স্থানের মুখের বুলির সাহিত্যিক মর্যাদা স্বীকার করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভায় তাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে, জে'নে রাখা ভাল,—আধুনিক সাহিত্যে স্বীকৃত 'চল্‌তি-ভাষা'ও বাংলাদেশের বা পশ্চিম-বঙ্গের কারও মুখের ভাষা নয়,—'সাধু-ভাষা'র আর একটি লেখ্য-রূপ মাত্র।

"লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" কথার অনুবাদে ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। ইংরেজী-ভাষা আমেরিকান ও ইংরেজ জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান জগতে সভ্য জাতির "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" হ'তে চলেছে। এ-ভাষা

জগতের উন্নততম ভাষাগুলির মধ্যে যে একটি, তাতে কারও দ্বিমত নেই। ভারতের তথাকথিত "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা' উর্দু-হিন্দী থেকে উৎপন্ন, না ব্রজভাষা থেকে, তা নিয়ে মারামারি না করেও বলা যায়, উভয়েই উন্নত লেখ্য ভাষা। সুতরাং, মনে হচ্ছে উন্নত লেখ্য ভাষারও ভবিষ্যতে "লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা" হ'তে বিশেষ বাধা থাক্‌বে না। বিশেষ ক'রে, "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" কথাকে ইংরেজী-ভাষা-ভাষীরা এখন থেকে "ইণ্টার্‌নেশন্যাল্‌ লেঙ্গুজ্‌" বা সর্বজাতিক-ভাষার অর্থে বুঝ্‌তে শুরু করেছেন। জাতি ব্যক্তিরই সমষ্টি। সুতরাং, "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা" গোড়ার থেকে নিয়ে আজ অবধি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি-কেন্দ্রিক কথা নয়।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে Lingua-Franca কথার বঙ্গানুবাদ "**সর্বজনীন-ভাষা**" ব্যবহার করাই বিশেষ সঙ্গত ব'লে মনে করি। কেননা, "সর্বজনীন" শব্দে "লিঙ্গুয়া-ফ্র্যাঙ্কা"-এর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাব প্রকাশ পাচ্ছে এবং "ভাষা" শব্দে কথ্য ও লেখ্য দুই রকমের বুলিই বুঝায়।

সামাজিকতার ভাষা

অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত, ইসারা, হাবভাব, চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোড় প্রভৃতি মানুষের ভাব আদান-প্রদানের উপায়গুলির মধ্যে মানুষের ভাষাই হচ্ছে প্রধান। এদিক থেকে ভাব্‌লে সমাজের সাথে মানুষের ভাষার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ, তা বুঝ্‌তে কষ্ট হয় না। এক এক সময় মনে হয়, সমাজের জন্যই ভাষা, আর ভাষার জন্যই সমাজ। কেননা, ভাষা না থাক্‌লে সমাজ জোট বাঁধে না, সমাজ না থাকলেও ভাষা তেমন ফোটে না। মানুষকে সমাজে বাস কর্‌তে হয়, সমাজের ব্যক্তি-বিশেষের সাথে ভাষার সাহায্যে ভাব আদান-প্রদান কর্‌তে হয়, তাই সামাজিকতার প্রশ্ন ওঠে।

সমাজে বাস কর্‌তে হ'লে ব্যবস্থার সাথে খাপ্‌খাইয়ে নিয়ে যে-ভাষার ব্যবহার করা প্রয়োজন, সে-ভাষাই 'সামাজিক-ভাষা'। এর উল্টোটার নাম হ'ল 'অসামাজিক-ভাষা'। অসামাজিক-ভাষা ব্যবহার ক'রে সমাজে বাস করা যায় না,—এ কথা বোধ হয় না বল্লেও চলে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা এমনই যে, এতে বয়সের প্রশ্ন, মান-মর্যাদার প্রশ্ন, ব্যক্তিগত সম্বন্ধের প্রশ্ন, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি কত কিছুর প্রশ্ন যে জড়িয়ে আছে, তার কোন সীমা নেই। সমাজের এ-সব অবস্থার কথা মেনে নিয়েই ভাষার ব্যবহার কর্‌তে হয়, নতুবা সমাজে বাস করা কঠিন। আমরা সমাজের এত সব দাবীকে সন্তুষ্ট ক'রে যে-ভাষা ব্যবহার করি, তাকেই **'সামাজিকতার ভাষা'** ব'লে উল্লেখ করতে পারি।

সামাজিকতার আর এক নাম হচ্ছে লৌকিকতা বা সামাজিক-সৌজন্য। সামাজিক-সৌজন্যের জন্য যা' প্রাথমিক প্রয়োজন, তা হচ্ছে সাদর-সম্ভাষণ ও আদর-আপ্যায়ন। এমনিতেও লোকে কথায়-কথায় ব'লে থাকে—"গুড়ের মিঠা কে-ই বা চায়, মুখের মিঠা কে না খায়" এই যে 'মুখের মিঠা' অর্থাৎ 'মধুর ভাষা,'—এটিই মানুষ মানুষের কাছে পাওয়ার আশা করে। কারণ, সে সামাজিক জীব, ভাষার সাহায্যে ভাব-বিনিময় করাই তার স্বভাব। মানুষের সামাজিকতা-বোধ না থাক্‌লে 'মুখের মিঠা' পরিবেশন

করার অর্থাৎ কারও সাথে মধুর ভাষায় কথা বলার প্রশ্নই উঠ্‌ত না ; তার ভাষা হ'ত সকলের সাথে এক রকম। এই সামাজিকতা বোধ থাকাতেই, এখন কারও সাথে দেখা হ'লেই আমরা সম্ভাষণ করি,—"আস্‌সলামু আলায়কুম্‌"। তিনিও প্রতিসম্ভাষণ জানান,—"ও আলায়কুমুস্‌ সলাম"। তারপর চলে 'শরীর কেমন', 'কুশল তো' কিংবা 'কেমন আছেন', 'খবর কি' ইত্যাদি কথায় আলাপ। এ-সব প্রশ্নের উত্তরে 'কেটে যাচ্ছে', 'চলে যাচ্ছে', 'বেঁচে আছি', 'আপনার যেমন দোয়া' ইত্যাদি কথাও "সামাজিকতার ভাষা"তেই হ'য়ে থাকে।

আমরা যাকে আদব কায়দা ও শরাফতি বা আভিজাত্য বলি, তা' আজও সমাজের একটা বড় ব্যবস্থা। এই সামাজিক ব্যবস্থাকে কথায় রূপ দিতে গিয়ে আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি, তার প্রায় সবটুকুই "সামাজিকতার ভাষা"। মনে করুন, কোন অপরিচিত লোকের নাম জান্‌তে চাই। তাঁকে বেয়াদবের মতো কিংবা অভদ্রের মতো জিজ্ঞাসা করা যায়না,—"তোমার নাম কি?" বেশ ভেবে চিন্তে, দেখে শুনে কায়দা ক'রে বল্‌তে হয়—"আপনার নামটি, জান্‌তে পারি কি" অথবা নিজের শরাফতি দেখাবার জন্য বলা চলে,—"ইস্‌মে শরীফ?" এমন সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে—"লোকে আমায় আবদুল হাকিম বলেই ডাকে" কিংবা "খাকসার কাদির নওয়াজ"। বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়, এ-সমস্ত কথায় বিনয় আছে, তবে কৃত্রিম। কৃত্রিম হ'লেও যে-ভাষায় এ-কথাগুলি বলা হয়, তা "সামাজিকতার ভাষা"।

একই ভাষাভাষী লোকের মধ্যেও সমাজভেদে ভাষা-ব্যবহারে তারতম্য ঘটে। তার প্রধান উদাহরণ হ'ল বাংলা-ভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ভাষা। হিন্দুরা নমস্কার করেন, মুসলমানেরা সালাম বা আদাব জানান, হিন্দুরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, মুসলমানেরা দাওয়াত কবুল করেন, হিন্দুরা জল পান করেন, মুসলমানেরা পানি খান, হিন্দুরা ভাত খে'য়ে আঁচান, মুসলমানেরা খানাপিনা ক'রে হাতমুখ ধোন, মুসলমানেরা 'চাচা' ব'লে আপন প্রাণ বাঁচালেও, হিন্দুরা 'কাকা' ব'লে ফাঁকা আওয়াজ করেন না। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এই যে ভাষাগত তারতম্য, একেও "সামাজিকতার ভাষা" না ব'লে উপায় নেই।

অধিকন্তু, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ভেদে ভাষার

যেমন তারতম্য ঘটে, সামাজিকতা বা লৌকিকতার দিক থেকেও ভাষা ব্যবহারে তফাৎ হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন যে, এর মধ্যে মান-মর্যাদার প্রশ্নটি খুবই সংবেদনশীল। এদিক থেকে আমাদের ভাষায় যে-প্রভাব দেখ্তে পাই, তা প্রধানতঃ বংশগত, পদগত, বয়সগত, ব্যক্তিগত, শিক্ষা-দীক্ষাগত, ধন-দৌলতগত মর্যাদার সাথেই জড়িত। তাই, আমাদের ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়া পদে সমাজের মান-মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার একটা পাকা-পাকি বন্দোবস্ত গোড়া থেকেই হয়ে গেছে। মূলতঃ এ-জন্যই আজও আমরা আমাদের ভাষায় 'তিনি,' 'যিনি', 'ইনি', 'উনি', 'আপনি'-রূপে পরিচিত সর্বনামগুলিকে ভিন্ন-ভিন্ন কারকে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ দিয়ে কেবল সামাজিকতা রক্ষার খাতিরেই বাঁচিয়ে রেখেছি, নইলে 'আমি'. 'তুমি': এবং 'সে'-এ তিনটি সর্বনামের কয়েকটি কারকগত রূপ দিয়ে কাজ সেরে নিতে পারা যেত। কারও প্রতি সম্মান দেখাবার বালাই না থাক্‌লে আমরা আমাদের ভাষায় এতগুলি বিশিষ্ট সর্বনাম পদ ব্যবহারের কথা যেমন ভাব্‌তাম না, তেমনই 'করেন', 'করবেন', 'করছেন', 'করেছেন', 'করুন' প্রভৃতি হাজার-হাজার ক্রিয়া পদের শেষে '-এন',-'বেন',-'ছেন',-'এছেন', '-উন' ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ ক'রে কারও প্রতি সম্মান দোখাবার ব্যবস্থাও রাখ্‌তাম না।

এ-সূত্রে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল আমাদের সমাজে যার সাথে যার সম্বন্ধ ঘনিষ্টতম, তাকে 'আপনি'-র স্থলে 'তুমি' ব'লে না ডাক্‌লে মন যেন ভ'রে উঠ্‌তে চায় না। তাই, বড়রা যখন ছোটদেরকে তুমি ব'লে ডাকেন, তখন অসম্মান বা অপমান করেন না, বরং আদর দেখান। স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্বন্ধ, বন্ধু-বান্ধবের সাথে বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধ, বান্দার সাথে খোদার সম্বন্ধই হচ্ছে নিকটতম। তাই, বন্ধুকে বন্ধুর প্রতি বল্‌তে শুনি 'তুমি' অথবা 'তুই', স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি বল্‌তে শুনি—"ওলো, তুমি কি বলছ, আধুনিকাদেরকে স্বামীদের ডাকতে শুনি- -"তুমি কোথায়", মানুষকে খোদার প্রতি প্রার্থনা জানাতে শুনি—

"তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে।"

এ-সমস্ত কথায় যতই আন্তরিকতা থাক না কেন, এগুলোকে "সামাজিকতার ভাষা" ব'লে স্বীকার করতেই হ'বে, কেননা এ জাতীয় ভাষা যাদের কাছ

থেকে আশা করা যায়, তার পান থেকে চুন খসবারও উপায় নেই। সে কারণেই ছোটরা যখন বড়দেরকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করে, তখন তারা বড়দেরকে অপমানিত করে। এমন 'তুমি' ব্যবহারে হাতাহাতির সূচনা হ'তেও দেখেছি।

আমাদের ভাষায় এক-বচনের স্থলে বহু-বচন ব্যবহার করার যে-ব্যবস্থা রয়েছে, তা একটা সর্বস্বীকৃত সামাজিক রীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-রীতিটাকে বাংলা-ব্যাকরণে "গৌরবে বহু-বচন" ব'লে আখ্যা দেওয়া হয়। নেতা, বক্তা, সম্পাদক, প্রভৃতি মানী ব্যক্তি, যাঁরা সমাজের আরও দশজনের পক্ষ হ'য়ে কথা বলেন, তাঁরা 'আমি'-র স্থলে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেন। ক্ষেত্র বিশেষে ভাষায় 'আমি' শব্দ প্রয়োগে যে 'অহং'-ভাব ফুটে ওঠে, আমাদের সমাজ তা পছন্দ করে না। এ-কথা ভে'বে সামাজিকতা রক্ষার খাতিরে পত্রিকা-সম্পাদক লিখে থাকেন,—"**আমাদের** বিশ্বাস, জাতিকে উন্নত করিতে হইলে, বিজ্ঞান-চর্চা আবশ্যক। চলুন **আমরা** বিজ্ঞান-সাধনার ব্রত গ্রহণ করি।" এতে যে অহমিকার ভাবকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সমাজের প্রতি দৃষ্টি না থাক্‌লে তা হ'ত না।

শব্দার্থ-বিজ্ঞান বা Semantics-এ যাকে "সুভাষণ" বলা হয়, তাও সামাজিকতা-রক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার একটা প্রধান অস্ত্র। বাড়িতে ভিখিরী এসেছে, ভিক্ষা দেবার ইচ্ছে নেই, বলা হ'ল, "মাফ কর," যেন ভিক্ষে তার প্রাপ্য এবং সে-প্রাপ্য আদায় কর্‌তে পার্‌ছি না ব'লে মাফ চাইছি। এমনও হয়, ভিখিরী দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে, ভিক্ষে দেবার ইচ্ছেও আছে, অথচ ঘরে চাল নেই। নিজের এ-অভাবের কথা কি ক'রে অপরকে বলি। তাই খানিকটা ভেবে-চিন্তে বল্‌তে হয়, "ঘরে আজ চাল বাড়ন্ত"। কিংবা, কারও বাড়িতে কর্তার সাথে আলাপ হচ্ছে, তাঁর ঘ্যানঘ্যানানি শুন্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না, উঠে-আস্‌তে মনটা আইঢাই করছে। কি ক'রে অভদ্রের মত বলা যায়,—"আর না, এখন যাই।" সামাজিক-ভদ্রতা রক্ষা ক'রে তাকে বল্‌তে হয়—"এখন তবে আসি।" মূল কাজটি হচ্ছে বেরসিকদের মতো "যাওয়া", আর মুখে ভদ্রতার খাতিরে বলা হচ্ছে "আসা"। এমন বিপরীতভাবে 'আসার' অর্থে 'যাওয়া' 'ঘাটতির' অর্থে 'বাড়তি' অথবা "দেবনা" অর্থে "মাফ কর" প্রভৃতি কেবল "সামাজিকতার ভাষাতেই" সম্ভব।

শুধু আমাদের ভাষায় নয়, পৃথিবীর যাবতীয় উন্নত ভাষার বেলায়ও শ্লীলতা ও অশ্লীলতার একটা প্রশ্ন আছে। সামাজিক সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি রে'খে ভাষা ব্যবহার করা না হ'লেই এ প্রশ্ন ওঠে। নতুবা শ্লীল ও অশ্লীল ব'লে ভাষায় কোন সমস্যাই দেখা দিত না। যে-সব কথা ভদ্র-সমাজে চলে না, তার সবই না হোক অন্ততঃ অধিকাংশ অশ্লীল। এ-দিক থেকে বিচার করলে "শালা-সম্বন্ধী" থেকে নিয়ে আমাদের ভাষায় যত রকমের গালি গালাজ আছে, তাব সবই অশ্লীল। ভব্য-সমাজে এ-সমস্ত বিশ্রী কথা চলে না। তাঁদের সমাজে যে-সমস্ত কথার ব্যবহার হয়, তা হচ্ছে বেশ শালীন ও সুরুচিসম্পন্ন।

আমাদের সমাজে কোন সম্ভ্রান্ত লোককে নাম ধ'রে ডাকা বেয়াদবী। এমন কি, নামের আগে-পাছে সম্ভ্রমসূচক কিছু না ব'লে শুধু নামটির উচ্চারণ করাও অভদ্রতা ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে। আমাদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন বড় বলেই এমনটি হয়। আমাদের সামাজিকতার ভাষায় সমাজের এ-অবস্থাও আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই আজও আমরা পরিচিত লোকের বেলায় 'মৌলবী সাহেব,' 'পণ্ডিত মশায়,' 'ডাক্তার বাবু,' 'খান সাহেব,' 'চক্কোত্তি মশায়' প্রভৃতি বলেই কাজ সারি, আর অপরিচিত লোকের বেলায় 'জনাব সৈয়দ আবদুল মজীদ সাহেব 'অথবা 'বাবু কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়' বলে পরিচয় দেই। কারও নাম বলা বা লেখার বেলায় আমরা এই যে রীতি অনুসরণ ক'রে থাকি, এটি সামাজিকতার বালাই না থাকলে সম্ভব হ'ত না।

আমাদের চিঠিপত্রগুলো সামাজিকতার ভাষার একটা প্রধান অঙ্গ। ব্যক্তিগত পত্রের বেলাতেই সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষার প্রশ্ন বড় হ'য়ে দেখা দিয়ে থাকে। ইংরেজী শিক্ষিতদের কাছে বাংলা সামাজিক-পত্রের পাঠ রীতিমতো একটা সমস্যা ব'লে অনুযোগ শোনা যায়। যাঁরা ইংরেজী Sir, Dear Sir, Dear, My Dear—কিংবা Yours faithfully, Yours sincerely, Yours affectionately—প্রভৃতির ব্যবহার নিয়ে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কর্‌তে কসুর করেন না, তাঁদের কাছে 'জনাব,' 'মহাশয়', 'বখেদমতেষু', 'পাক জনাবেষু', 'প্রীতিভাজনেষু', 'কল্যাণীয়েষু', অথবা 'আরজ-গুজার' 'বশংবদ,' 'বিনীত,' 'দোয়াগো', 'আশিস্‌প্রার্থী', 'খাকসার' প্রভৃতি পাঠ কিছু নতুন ঠেকা উচিত নয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্বন্ধ

যেখানে সুস্পষ্ট নয়, সেখানে হয়তো পত্রের পাঠ একটু চিন্তা করেই লিখ্‌তে হয়,—অন্যত্র তার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

এ-প্রসঙ্গে চাটুকারিতার বা তোষামোদের ভাষার কথাও উল্লেখ কর্‌তে হয়। চাটুকারিতা বা তোষামোদ সমাজে প্রশংসনীয় গুণ ব'লে স্বীকৃত নয়,—বরং একটা নিন্দনীয় দোষ। এতৎসত্ত্বেও, চাটুকারেরা সুমধুর ভাষায় লোকের তোষামোদ ক'রে চিরকাল কাজ হাসিল ক'রে আস্‌ছে। সুতরাং, চাটুকারিতা নিন্দনীয় ব্যাপার হ'য়েও সমাজে নিন্দনীয় নয়। মানপত্র বা অভিনন্দন-পত্র দেওয়ার সামাজিক রীতির স্বীকৃতিতে এর উদাহরণ মিল্‌ছে। এ-শ্রেণীর রচনায় আমরা যে-ভাষা ব্যবহার করি, তা একান্তই "সামাজিকতার ভাষা"। কেন না, চাটুবাক্যে আন্তরিকতার অভাবকে ঢে'কে দিয়ে অপরকে খুশি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। যাঁকে আমরা অভিনন্দিত করি, তিনি যে দোষ-ত্রুটিমুক্ত ফেরেশতা, তা' নয়। যাঁরা তাঁকে অভিনন্দিত করেন, তাঁরাও তা' জানেন। তবু, কোন মান-পত্রে কারও কোন দোষত্রুটির উল্লেখ আজ পর্যন্ত দেখিনি। মানপত্রের ভাষা শুন্‌লে মনে হয়, যাঁকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে, তিনি একটি মূর্তিমান গুণ। সমাজ এমন চাটুকারিতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিলেও মানপত্রের ভাষাকে "সামাজিকতার ভাষা" না ব'লে উপায় নেই।

ভাষাকে সামাজিক ক'রে নেওয়ার অনেক উপায় রয়েছে। অপরকে খুশি করার মতো সুন্দর ভাষা তৈরি করা একটা ব্যক্তিগত শিল্প হ'লেও, এ নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নয়। প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিবর্তন ক'রে অনেক সময় আমরা ভাষাকে সামাজিক রূপ দিয়ে থাকি। এই ধরুন, আইন-পরিষদে বক্তৃতা হচ্ছে। হঠাৎ বক্তা ব'লে বস্‌লেন,—"আমার পূর্ববর্তী বক্তার উক্তি মিথ্যে। পরিষদ-কক্ষের চারদিক থেকে চীৎকার শুরু হ'ল—Withdraw, Withdraw—আপনার উক্তি উঠিয়ে নিন, উঠিয়ে নিন।" হট্টগোলে ঘর ভ'রে গেল, আর কিছুই শোনবার উপায় রইল না। স্পীকার বা পরিষন্নিয়ন্তা বাধ্য হয়ে বক্তাকে আদেশ দিলেন,—"আপনার এ অশোভন উক্তি উঠিয়ে নিন।" বক্তা বাধ্য হয়ে বল্লেন,—"আমার উক্তিটি উঠিয়ে নিলাম।" হট্টগোল থেমে গেল, বক্তা ব'লে চল্লেন,—"আমি যা বল্‌তে চেয়েছিলাম, তা হচ্ছে আমার পূর্ববর্তী বক্তার উক্তি সত্য নয়।" এতে কেউ আপত্তি জানালে না। এর কারণ কি? 'যা সত্যি নয়'

তাই তো 'মিথ্যে'। তবু, উক্তি দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে,—'মিথ্যে' শব্দটি যেমন খারাপ শোনায়, 'সত্য নয়' কথাটি তেমন খারাপ শোনায় না। প্রকাশ ভঙ্গী পাল্‌টে যাওয়াতেই এমনটি সম্ভবপর হয়েছে। এমনভাবে 'সেও চোর'—এ-কথাকে 'তিনিও সাধু নন,' 'কিংবা 'আপনি বসুন'-এ আদেশকে 'বস্‌তে আজ্ঞা হোক,' অথবা 'তুমি কবে যাবে'—এ প্রশ্নকে 'কবে যাওয়া হবে' প্রভৃতি প্রকাশ ভঙ্গি দিয়ে ব্যক্ত কর্‌লে, সামাজিক ভাষাও অধিকতর সামাজিক হ'য়ে ওঠে।

'সামাজিকতার ভাষায়' সামাজিক বিবর্তনের প্রভাবও নেহাৎই কম নয়। সমাজ ও তার পরিবেশ পরিবর্তনে সামাজিকতার ভাষাও বদলে যায়। তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সম্প্রতি 'ধন্যবাদ' বা 'শোকরিয়া' ব'লে কারও প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা রেওয়াজ ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে চালু হয়েছে। কেউ কারও উপকার কর্‌লে তার জন্য তাকে এমনভাবে কৃতজ্ঞতা জানানোর রীতি কোন কালে আমাদের সমাজে ছিল না। এ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার Thank You কথার বাংলা বা উর্দু তরজমা। বিদেশ ঘুরে এসে আমাদের শিক্ষিত সমাজ নানা বিদেশী জিনিসের মতো এ-রীতিটিও আমাদের সমাজে আমদানী করেছেন। এখনও কিন্তু আমাদের জন-সাধারণ পরের কাছ থেকে উপকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হাত তুলে দোয়া করতে গিয়ে ব'লে থাকে—"আল্লাহ আপনার হায়াত দরাজ করুন," কিংবা "বেঁচে থাকুন" অথবা "চিরজীবী হউন" ইত্যাদি। এ-সবের সাথে প্রাণের যোগ ছিল, এখন শুধু মুখে ধন্যবাদ জানিয়েই শেষ। তবু, 'সামাজিকতার ভাষা' হিসেবে মন্দ নয়।

এ-সব দিক থেকে বিচার কর্‌লে দেখা যায়, 'সামাজিকতার ভাষা' 'নেহাৎ সরল, সহজ ও স্বাভাবিক ভাষা নয়। অপরকে অর্থাৎ সমাজের আর পাঁচ জনকে খুশি করাই এ-ভাষার মূল উদ্দেশ্য। আর পাঁচ জন খুশি হউন বা না হউন, অন্ততঃ তাঁরা নাখোশ না হোন, এটিও আর একটা লক্ষ্য। সমাজে বাস কর্‌তে গেলেই "সামাজিকতার ভাষা" ব্যবহার না ক'রে উপায় নেই। তবে, সব সময় দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়, যেন আমরা সামাজিকতার সীমা লঙ্ঘন না করি। এই সীমা লঙ্ঘন করলেই চাটুকারিতার অপবাদ আসবে, আর সীমা পর্যন্ত না পৌঁছালেই অসামাজিক আখ্যা লাভের আশঙ্কা সব সময় থাক্‌বে।*

* ১৬-১২-১৯৫৭ তারিখে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে প্রচারিত।

বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার

বাংলা বাঙালীব ভাষা। মূল ভাষাভাষীর তুলনায় যথেষ্ট স্বল্প সংখ্যক হইলেও, অনেক অবাঙালী অর্থাৎ বাংলার ভৌগোলিক সীমার বহির্ভূত ব্যক্তি বাংলা-ভাষা ব্যবহার করে। বাঙালীদের ন্যায় বাংলাই ইহাদেব কথ্য, লেখ্য ও সাহিত্যিক ভাষা। বিহার, যুক্ত প্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা-ভাষীর সংখ্যা প্রাদেশিক ভাষাভাষীর তুলনায় অল্প হইলেও, ইঁহারা প্রায়ই জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় উন্নত বলিয়া প্রতিবেশীদের মধ্যে ইঁহাদের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। বাংলা মাতৃভাষা নহে, অথচ দীর্ঘদিন বাংলায় অবস্থানের ফলে 'বুলি' অথাৎ মৌখিক ভাষারূপে বাংলা-ভাষা বুঝিতে, বলিতে, লিখাইতে বা লিখিতে, এক কথায়, ব্যবহার করিতে হয়, এমন বহিরাগত লোকের সংখ্যাও বাংলায় লক্ষাধিক হইবে। সুতরাং বাংলা-ভাষা বাংলার বাহিরে দুইভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—ভাষা হিসাবে ও বুলি হিসাবে। অধিকন্তু, অহমীয়া ও উড়িয়া-ভাষা বাংলা-ভাষার সন্তান বলিয়া, আসাম ও উড়িষ্যার প্রায় সকলেই বাংলা-ভাষা বুঝে এবং অল্প-স্বল্প বলিতে পারে।

বাংলা-ভাষার এই যে ব্যাপক প্রভাব, ইহাকে শুধু বাংলা-ভাষাব পরম সৌভাগ্য বলিয়া মৌখিকভাবে স্বীকার ও প্রশংসাবাদ করিলে যত সৌজন্যই প্রকাশ পাউক; তাহাতে জাতীয় স্বার্থের আসল কাজ হাসিল হইবে না। ইহা বাংলা-ভাষার সৌভাগ্যের পরিচায়ক হউক বা না হউক, সে-বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়াও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, **ইহার বিস্তৃতি** ও **অন্তর্নিহিত শক্তির** পরিমাণ ভারতীয় অন্য যে-কোন ভাষার চেয়ে অধিক। আমার এই উক্তিকে কোন প্রকারের উচ্ছ্বাস বা ভাবাবেগজনিত মন্তব্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, আসল ব্যাপারটিও একান্তই এইরূপ। ১৯৪১ ইংরেজীর আদম-শুমারীর হিসাব হইতে দেখা যায়, বাংলার লোক-সংখ্যা ৬১,৪৬০,৩৭৭; ইহার মধ্য হইতে অপর দেশাগত অন্য ভাষাভাষী ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ লোককে আনুমানিকভাবে বাদ দিলে,

বাংলা-ভাষীর সংখ্যা ৬ (ছয়) কোটির কম হয় না। তাহার উপর বিহারের পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ লোক বাংলা বলে বলিয়া বাংলা-ভাষীর সংখ্যার সহিত তাহাদের সংখ্যাও যোগ দিতে হইবে। আসামের সিলেট, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলার স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অবশিষ্ট বাংলা-ভাষী। ইহাদিগকে লইয়া বাংলা-ভাষীর আনুমানিক সংখ্যা অন্যূন ৭ (সাত) কোটি। হিন্দী ভাষীর সংখ্যাও প্রায় ৭ (সাত) কোটি। ভারতের আর কোন ভাষা-ভাষীর সংখ্যা আড়াই কোটির বেশী নাই। এমন অবস্থায় বাংলা-ভাষার বিস্তৃতির কথা সহজেই অনুমেয়।

অন্তর্নিহিত শক্তি না থাকিলে কোন ভাষাই বিস্তৃতি লাভ করে না। বাংলা-ভাষার বহু-বিস্তৃতির কারণও ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি। ভাষার স্বাভাবিক মাধুর্য ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির একটি প্রধান দিক। এই বিষয়ে নিজে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়াও অপর একটি বৈদেশিক পণ্ডিতের কথায় বলা যায়,—"বাংলা-ভাষা জর্মন ভাষার জটিল ভাবপ্রকাশক ক্ষমতার সহিত ইতালীয় ভাষার মাধুর্যের মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে।"—এফ্-এইচ্ স্ক্রাইন্ (Bengali unites the mellifluousness of Italian with the power possessed by German of rendering complex ideas—F.H. Skrine) এমন গঙ্গা-যমুনার মিলন একমাত্র বাংলা-ভাষাতেই সম্ভবপর—ভারতের অন্য কোন ভাষায় নহে।

ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয় সাহিত্যের সৃষ্টিতে। এই দিক হইতেও বাংলা-ভাষার সহিত ভারতীয় অন্য কোন ভাষার তুলনা চলে না। এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত ভাষাবিদ ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব কি বলিতেছেন, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। তিনি বলিতেছেন,—

> "সাহিত্যের শক্তির দিক্ হইতে বিচার করিলে ভারতের একটি মাত্র ভাষা সাধারণ ভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। তাহা বাংলা-ভাষা। আমি এই কথা বলি না যে, ভারতীয় অন্য কোন ভাষার সাহিত্য-সম্পৎ নাই। গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, উর্দু ও তামিল ভাষায় দিন দিন সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু যে-শক্তিতে এক ভাষা দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে, সে শক্তি ভারতীয় আর কোন ভাষার নাই।-------সহজত্বের দিকে দেখিলে উড়িয়া ও

আসামী ব্যতীত সমুদয় ভারতে এমন সহজ ভাষা আর নাই। লিঙ্গ-বচনের গোলযোগ ইহাতে নাই। বাংলা অক্ষর অতি পরিপাটি। পড়িবার কোন গোলযোগ হয় না, অথচ দ্রুত লিখনের উপযোগী।" —**ভারতের সাধারণ ভাষা**।

এখন দেখা যাইবে, আক্ষরিক সৌষ্ঠব, সহজপাঠ্য ও দ্রুত লিখনোপযোগী লিপি, ভাষাগত সারল্য ও মাধুর্য, বিশেষতঃ সর্ববিধ ভাব-প্রকাশের শক্তিমত্তা প্রভৃতিতে এই বাংলা-ভাষা অধিকারী বলিয়া, সাহিত্য-সম্পদে ভারতের অন্য কোন ভাষা ইহার সমকক্ষ নহে। কি বিশাল বিস্তৃতি, কি অন্তর্নিহিত সঞ্জীবনী শক্তি,—কোন বিষয়ে বাংলা-ভাষার সহিত ভারতের অন্য কোন ভাষাব যদি তুলনা না হয়, তবে ভারতেব নিকৃষ্টতর উর্দু বা হিন্দী ভাষা রাষ্ট্র-ভাষা হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, বাংলা-ভাষা সেই শ্রেণীর উপযুক্ততা হইতে বঞ্চিত বলিয়া মনে হইবার পশ্চাতে একমাত্র সংস্কৃতিগত দীনতা কিংবা (Inferiority Complex) বা আভ্যন্তরীণ আত্মাপকর্ষ-বোধ ব্যতীত আর কিছুই থাকিতে পারে না।

বাংলা-দেশ এখন রাষ্ট্রীয় গরজে পূর্ব ও পশ্চিম,—এই দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার এক অংশের সহিত অন্য অংশের রাষ্ট্রীয় সংযোগ এখন আর পূর্বের মত নাই; ইতোমধ্যেই পূর্ব-সংযোগের অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাও আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিবে না। ১৯৪৮ ইংরেজীর জুন মাস হইতে বাংলার রাষ্ট্রীয় সংযোগ সম্পূর্ণটিই বিচ্ছিন্ন হইবার কথা এবং হইবেও তাহাই। তখন বাংলার এক অংশ অন্য অংশের মুখ দেখিতে গেলে, হয় সমাজ-শাসনভীরু প্রেমিক-প্রেমিকার ন্যায় লজ্জাকাতর সঙ্কোচময় দৃষ্টি-বিনিময় করিতে বাধ্য হইবে, না হয়, একই হাসপাতালের পাশাপাশি শয্যায় শায়িত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আহত হিন্দু-মুসলিম প্রতিবেশীর ন্যায় পারস্পরিক যন্ত্রণাকাতর তীব্র ও উৎকট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিবে। এই অদ্ভুত দৃশ্য হয় বিশেষ উপভোগ্য, না হয় নিতান্তই অরুন্তুদ হইতে বাধ্য।

যাহা হইবার তাহা হইবেই। তাহাকে ঠেকাইবার অধিকার বা শক্তি কাহারও নাই। দেশের বর্তমান অবস্থায় এমন কথা চিন্তারও অতীত ব্যাপার। কিন্তু, ভাবিবার বিষয় এই,—বাংলা-দেশ বিভক্ত হইয়াছে; হয়ত ইহার এক অংশ আর এক অংশকে রাজনীতির ক্ষেত্রে শীঘ্রই ভুলিয়া

যাইবে বা ভুলিয়া যাইবার ভান করিবে। কিন্তু, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসী কি রাজনৈতিক বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি পরেও কোন দিন তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভুলিয়া যাইবেন, কিংবা ভুলিয়া যাইবার ভান করিতে পারিবেন? পশ্চিম-বাংলা হিন্দুস্থানের সহিত যুক্ত হইয়াছে বলিয়া পশ্চিম বঙ্গবাসী হঠাৎ শুভ্র-সূত্রের ঘর্মমলিন যজ্ঞসূত্র দোলাইতে দোলাইতে কদর্য পাগড়ি মাথায় সুদীর্ঘ চৈতন অর্ধ-আবরিত করিয়া রাতারাতি খৈনি টিপিতে আরম্ভ করিয়াছে; অথবা; পূর্ব-বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব বঙ্গবাসী এক মধুর প্রভাতে পাঞ্জাবী ধরনের উচ্চ শিখা বিশোভিত উষ্ণীষ এবং লম্বা-লম্বা চোগা চাপকান পরিধান করিয়া অনর্গল উর্দু বকিতে ও লিখিতে শুরু করিয়াছে;—এমন ব্যাপার একমাত্র ভৌতিক জগতেই সম্ভবপর,—এই বাস্তবলোকের বিশাল বক্ষে কল্পনারও অতীত বিষয়। এমন অবস্থায় বাংলা-ভাষাকে লইয়া রাজনৈতিকদের মুশ্‌কিলে পড়িবারই কথা এবং সত্য সত্যই লীগ ও কংগ্রেসী রাজনৈতিক মহল যে এ-ব্যাপার লইয়া বেশ একটু বিব্রত বোধ করিতেছেন তাহার আভাস স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। মনে হইতেছে, যতই দিন চলিতে থাকিবে, ততই মুশ্‌কিল আরও জটিল ও ঘোরালো হইয়া পড়িবে।

মোটকথা ভাষা লইয়া আর যত খেলাই চলুক, অন্ততঃ রাজনৈতিক খেলা চলে না। কেননা, ভাষার রাজনৈতিক খেলা পৃথিবীর প্রাচীনতম পাশা খেলার চেয়েও প্রাচীনতর এবং অধিক বিপজ্জনক। ক্ষমতা মদ-গর্বিত রাজনীতির চালে ইহাতে একবার মাতিয়া উঠিয়া পণ রাখিতে শুরু করিলে, রাজ্যশুদ্ধই তলাইয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষাই দায় হয়। সুতরাং, কোন জাতির বা লোক সমষ্টির নিজস্ব ভাষা লইয়া রাজনৈতিক দ্যূতক্রীড়া শুধু দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক নহে, মূর্খতারও অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। ভাষার ইতিহাসই এই উক্তির প্রধান সাক্ষী। আর্যদের সংস্কৃত ভাষা ভারতীয়। এই ভাষা অনার্যদের ভাষাকে গ্রাস করিতে পারে নাই;—তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা এখনও ভারতে জীবিত। তিন শতাব্দী ব্যাপী অসাধারণ চেষ্টার ফলেও ইরানে মুসলমানদের আরবী ভাষা অচল হইল। ইরানী মনীষা এদেশের জাতীয় জীবনের উদ্‌গাতা ফিরদৌসীর মধ্যস্থতায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল; ফলে আরবী বর্জিত "শাহনামা" রচিত হইল,—প্রাচীন ইরান প্রাণ পাইল। এত প্রাচীন

কালের কথা ,চিন্তা না করিলেও দেখা যায়, দুই শতাব্দীর অক্লান্ত চেষ্টায়ও ইংরেজী-ভাষা ভারতীয় কোন ভাষাকে গ্রাস করিতে পারিল না।

এমনটি হয় কেন, এই প্রশ্নই একান্ত স্বাভাবিক। ইহার উত্তরও অতি সুস্পষ্ট : আলো-বাতাসের ন্যায় মাতৃভাষা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। আলো-বাতাস হইতে বঞ্চিত করিলে তরুলতা ও জীব-জন্তু যেমন মরিয়া যায়, মাতৃ ভাষা হইতে বঞ্চিত করিলেও মানুষ তেমন মরিয়া যায়,—অবশ্য এই মৃত্যু শারীরিক নহে, আন্তরিক অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ। মানুষ আপনার স্বাভাবিক ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার প্রবল সঞ্জীবনী শক্তি ধীরে ধীরে কমিয়া আসে, মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতে থাকে,—অনতিবিলম্বেই মানুষ একটি কলের পুতুলে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত, সর্বাধিক মারাত্মক বিষয় হইল এই যে, তাহার হৃদয়ে Inferiority Complex বা আভ্যন্তরীণ আত্মাপকর্ষ-বোধ বদ্ধমূল হইয়া যায় বলিয়া সে কোন কালেও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, ইহাতে মানুষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একেবারেই ডুবিয়া যায়।

মাতৃভাষা মানুষের স্বভাব। স্বভাব বলিয়াই মাতৃভাষায় মানুষের অধিকার জন্মগত। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ন্যায় ভাষা-স্বাধীনতাও মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষকে স্বভাবই এই অধিকার দান করিয়াছে। সুতরাং, মানুষের এই অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে, সে মানুষের প্রকৃতির উপরই হস্তক্ষেপ করে। তরুলতার ক্ষেত্রে যেমন এ-জাতীয় হস্তক্ষেপ অসহ্য, মানুষের বেলায়ও এই শ্রেণীর হস্তক্ষেপ অত্যন্তই দুঃসহ। এই জন্যই মানুষ মরিয়াও তাহার ভাষাকে জিয়াইয়া রাখিতে চায়। বর্ত্তমান জগতের সুসভ্য ও উন্নত দেশসমূহে ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার বলিয়া স্বীকৃত; মাতৃভাষাও ঠিক তেমনই জন্মগত অধিকার বলিয়া নির্বিবাদে গৃহীত। এই অবস্থায় আমাদের দেশে মাতৃভাষার এই অধিকার স্বীকৃত না হইলে, আমরা সভ্যতা ও উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া পরিগণিত হইব।—এইরূপ হওয়া কি বাঞ্ছনীয় এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচায়ক?

বাংলা-ভাষাও বাঙালী মাত্রেরই স্বভাব এবং সেই কারণেই তাঁহার জন্মগত অধিকার,—তিনি পূব-বঙ্গীয়ই হউন, আর পশ্চিম-বঙ্গীয়ই হউন। রাজনৈতিক বিভাগের সহিত ইহার বড় একটা সম্পর্ক নাই। কেননা,

ইহার বেশির ভাগ কারবার বাঙালীর হৃদয় ক্ষেত্রে। বাংলা-ভাষায় বাঙালীর অধিকার আছে কি না, এমন সন্দেহপোষণ করার মত ধৃষ্টতা, বোধ হয়, কোন হাঁদা-বোকারামেরও নাই। কিন্তু, যখনই এই ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রশ্ন উঠে, তখনই চারিদিক হইতে এই অধিকার অস্বীকৃতির গগন-বিদারী নিনাদ বজ্রনির্ঘোষের মত ভাসিয়া আসিতে থাকে। মনে হয় যেন এই নিনাদ বাংলাভাষীর ক্ষীণকণ্ঠকে পরিপূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিয়া দিঙ্মণ্ডল পরিপ্লাবিত করিয়া দিবে। ইহার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে মনে হয়, বাংলা-ভাষাকে তাহার ন্যায্য অধিকার দানে বাধা দেওবার পেছনে কোন একটি সুচিন্তিত গুপ্ত দূরভিসন্ধি নিহিত। ইহা কি শাসন ও শোষণের দূরভিসন্ধি? এই শাসন ও শোষণ কাহার এবং শাসিত ও শোষিত কে?

বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা শুনিয়া কতকগুলি লোক বিদ্রূপের হাসি হাসিতে অথবা বিশেষ আশ্চর্য-বোধ করিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা মনে করেন যে, ভাষা কি একটি মানুষ? ইহার আবার রাষ্ট্রীয় অধিকার কি? ইঁহাদের নির্বুদ্ধিতার কথা চিন্তা করিতেও দুঃখ হয়। ভাষা যে মানুষ নহে, ইহা একটি শিশুও বুঝে। মানুষ না হইলেও কোন কোন বস্তুর স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় অধিকার যে আছে,---ঐ সকল লোককে ইহা বুঝানোই কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকাব তাঁহারা বিনা আপত্তিতে স্বীকার করেন। কিন্তু জগৎ কর্তৃক মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃতিও ত খুব বেশী দিনের কথা নহে। মানুষের এই অধিকার পূর্বে ছিল না; জগৎ মনে করিত রাজা-বাদশাদেরই শুধু রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে,---জনসাধারণের এ-বিষয়ে কোন অধিকার নাই। এই জন্যই আগে রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হইত, দেশের লোক নির্বিঘ্নে ঘুমাইত। এখন যুদ্ধ অর্থ জনসাধারণের সকলের সম্মিলিত শক্তির সংগ্রাম অর্থাৎ Total war. মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃতিই ইহার একমাত্র কারণ।

জগৎ যেই দিন মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সেইদিন হয় প্রকাশ্যে, না হয় গোপনে, না হয় প্রকারান্তরে মানুষের ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারও মানিয়া লইয়াছে। কেননা, ভাষা ব্যতীত মানুষ নহে এবং মানুষ ব্যতীত ভাষা নহে। যেইখানে মানুষ আছে, সেইখানেই ভাষা আছে এবং যেইখানে ভাষা আছে সেইখানেই মানুষ আছে। মানুষ ও

ভাষার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য বলিয়া, মানুষ সমাজে বা রাষ্ট্রে যে অধিকার পায়, তাহার ভাষাও সেই অধিকার পাইয়া বসে। সেই জন্যই ইংরেজদের রাজ্যে 'ইংরেজী', ফরাসীদের রাজ্যে 'ফ্রেঞ্চ', জর্মনদের রাজ্যে 'জর্মন', ইরানীদের রাজ্যে 'ফার্সী', জাপানীদের দেশে 'জাপানী', আরবীদের রাজ্যে 'আরবী', তুর্কীদের রাজ্যে 'তুর্কী' প্রভৃতি ভাষা রাষ্ট্র ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব-বঙ্গের লোকের মাতৃভাষা বাংলা—একচেটিয়া বাংলা। পূর্ব-বঙ্গের লোকেরা যদি পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া থাকে, তবে তাঁহাদের নিজস্ব ভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া উচিত। যাঁহারা লোকের এমন স্বাভাবিক অধিকারেও বাধার সৃষ্টি করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান না হইয়া পারা যায় না। নতুবা রাষ্ট্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া বিঘোষিত লোকের ভাষা যদি রাষ্ট্রের ভাষা হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, তবে নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, লোকগুলি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয় নাই; তাহারা পরের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। ফলতঃ, যে-দেশে মানুষের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই, সে-দেশেই দেশীয় ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা উঠিতে পারে না।

বলা বাহুল্য, পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে,—অন্ততঃ কাগজে পত্রে। এই অধিকারকে কেতাবের পৃষ্ঠা হইতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রূপ দিতে গেলেই, পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা উঠে। এই প্রশ্ন পূর্ব দিকে সূর্যোদয়, পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত, জলের নিম্নগতি প্রভৃতির ন্যায় অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ইহাকে গৃহ শত্রুর রাষ্ট্রবিধ্বংসী কর্মতৎপরতা বলিয়া যাহারা মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। অপরকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস যে ইহা নয়, তাহাই বা কে বলিবে? এইভাবে বহির্জগতের চক্ষে ধূলা দেওয়া যত সহজ, ঘটনাস্থলের লোককে বোকা বানানো তত সহজ নহে। এই জন্য এতদ্দ্বারা ঘটনাস্থলে অনুষ্ঠিত ব্যাপারের কোন উন্নতি হয় না।

আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা এখনও প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হই নাই, বা হইতে পারি নাই। তথাপি আমরা স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া গর্ব অনুভব করি। এই গর্ব কি আত্ম-প্রসাদমূলক অহমিকা? ইহা কি শুধু অন্তঃসারশূন্য আত্মপ্রবঞ্চনা! না, আমরা

সত্যই স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন হইয়াও কেন ভাষার পরাধীনতা হইতে মুক্তি পাইতেছি না কিংবা মুক্তি পাইবার জন্য কোন জোরালো প্রকৃতির চেষ্টা দেখিতেছি না? এই প্রশ্নের সহজ ও সরল উত্তর হইল,—আমরা স্বাধীন হইয়াও পরাধীনতার কথা ভুলিতে পারিতেছি না; পরের অনুগ্রহে বাস করিয়া পরের ভাষায় আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়া, দাসসুলভ মানসিকতার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতেই ভয় পাইতেছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় মুক্তির সহিত আমাদের চিন্তা ও কর্মধারার মুক্তিও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা, চিন্তা ও কর্মধারামুক্ত বিশাল জগতের স্বাধীন জাতির মধ্যে স্বাধীন-ভাবে বাঁচিবার অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইব।

জাতির নিজস্ব ভাষার প্রতি গভীর আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণই জাতীয় চিন্তাধারা মুক্তির প্রথম অভিব্যক্তি। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার গভীরতা, আন্তরিকতা ও ব্যাপকতার দ্বারা জাতির কর্মধারার গতিও নির্ণীত হয়। বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার এই ভাষা সংশ্লিষ্ট কর্মধারারই একটি দেদীপ্যমান রূপায়ণ। আমাদের মাতৃভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যেমন গভীর, আন্তরিকতাও তেমন ব্যাপক হইতে হইবে। এক কথায়, মাতৃভাষার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার পরিমাণ দিয়াই রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের মাতৃভাষার অধিকার সাব্যস্ত হইতে পারে,—নতুবা কিছুতেই নহে।

রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে যেমন অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ঠিক তেমনই তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও আবশ্যক মত ত্যাগ বরণ করিয়া লইতে হয়। একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি, লোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। কেননা, মানুষ তাহার ভাষা হইতে পৃথক নহে এবং ভাষাও মানুষ হইতে পৃথক নহে। মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে যে-শ্রেণীর বা যে-প্রকারের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও সেই জাতীয় ত্যাগ আবশ্যক হইতে পারে। যে-দেশ বিদ্রোহের পরে স্বাধীনতা অর্জন করে, সে-দেশে আপনা হইতেই দেশীয় ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। শান্তিপূর্ণভাবে যে-দেশ স্বাধীন হয়, সে-দেশে দেশীয় ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সময় ও ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যকতা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। তাহার একমাত্র কারণ, প্রভুস্থান অধিকারী জাতি

পরাধীন-জাতিকে এক সঙ্গে সর্ব-বিষয়ে স্বাধীনতা দান করিতে গিয়া স্বভাবত সঙ্কোচবোধ করিয়া থাকে বলিয়া, পরাধীন-জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সহিত ভাষাগত স্বাধীনতা লাভ নাও করিতে পারে। আবার, সদ্য পরাধীনতা-পাপমুক্ত স্বাধীন-জাতি রাষ্ট্রগত বিশৃঙ্খলা ঘটিবার ভয়ে স্বেচ্ছায় কিছুদিনের জন্য প্রভুস্থানীয় জাতির ভাষাকে রাষ্ট্রে রক্ষা করিতে বাধ্য হওয়াও কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে।

যেহেতু শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ব-বঙ্গ স্বাধীন হইয়া পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হইয়াছে, সেই হেতু পূর্ব-বঙ্গের মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে ত্যাগ স্বীকারের ও সময়ের আবশ্যক। তজ্জন্য হয়ত পূর্ব-বঙ্গ প্রস্তুতও ছিল। কিন্তু, ঘটনাচক্রের আবর্তে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তন প্রভু পরিবর্তনের আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হওয়ায়, চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃতির ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক দুঃখের বিষয় এই,—আমরা মুখে বলিতেছি, আমরা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাপ্রদীপ্ত প্রগতিশীল একটি জাতি, আর কাজে যাহা করিতেছি, তাহা মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। ইহা যেন চোরাবাজার-ঠেকানো আন্দোলনের ভুয়া-প্রচারণা,—যিনিই চোরা-বাজার বন্ধ করিতে অধিক গলাবাজী করেন, তিনিই চোরাবাজারের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা প্রচ্ছন্ন সহায়ক। বলিতে কি "মু মেঁ শেখ্ ফরীদ, বগল মেঁ ইঁট" লইয়া কোন জাতি বা লোক-সমষ্টি তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই;---পারিবেও না। ইহার জন্য জাতিকে অকপট হইতে হইবে, জাতি যাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, তাহা জাতিকে প্রকাশ্যে বলিতে হইবে এবং তদনুসারে উপর্যুক্ত কার্যের দ্বারা তাহার অনুভূতির রূপও দিতে হইবে।

মোটের উপর, মানুষের ন্যায় তাহার ভাষারও রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে; ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার ভাষাভাষী লোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতেই বর্তে; মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকারের ন্যায় তাহার ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারও ত্যাগ স্বীকার দ্বারা অথবা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এই নীতির দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে বলিতে হয়, যদি পূর্ব-বঙ্গের লোক মানুষ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহার ভাষা বাংলারও রাষ্ট্রীয় অধিকার আছে; যদি পূর্ব-বঙ্গবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার বলিয়া

কিছু স্বীকৃত হয় অথবা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাংলা-ভাষারও রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। রাষ্ট্র-ভাষা হইবার মত যোগ্যতা যদি বাংলা ভাষার না থাকিত, তবে কিছু বলিবার থাকিত না। এই ভাষা পশ্চিম-বঙ্গের রাষ্ট্র-ভাষায় পরিণত হইয়াছে। ইহাতে এই কথা একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে যে, বাংলা-ভাষার একটি ক্ষুদ্র অংশেরও রাষ্ট্র-ভাষায় পরিণত হইবার যোগ্যতা আছে। পূর্ব বঙ্গের বাংলাভাষীর সংখ্যা পশ্চিম-বঙ্গীয় বঙ্গভাষীর সংখ্যার চেয়ে অধিক। ক্ষুদ্রতর অংশের যে-যোগ্যতা স্বীকৃত, বৃহত্তর অংশের সে-যোগ্যতা নাই,—এই কথা বলিলে জগৎ শুনিবে কেন?

আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, হিন্দী, তামিল প্রভৃতি ভাষার ন্যায় বাংলা একটি বনিয়াদী ভাষা। তথাকথিত হিন্দুস্থানী বা উর্দুর ন্যায় ইহা কোন ভুঁইফোঁড় ভাষা নহে। প্রায় হাজার বৎসরের ঐতিহ্য এই ভাষার পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যসেবিগণের সম্মিলিত চেষ্টা ও সাধনায়, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ঐশ্বর্যে এই ভাষা আপন আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিশ্ব আজ এই ভাষার প্রাচীন আভিজাত্যব্যঞ্জক মূর্তিতে আধুনিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনীষা দেখিয়া একান্তই মুগ্ধ ও বিস্মিত। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির সহিত ইহার কোন তুলনাই হয় না। ভাব-প্রকাশের অফুরন্ত ক্ষমতায় প্রাণবন্ত বলিয়া, সৌন্দর্য ও সাবলীল গতির প্রাচুর্যে ইহা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মুকুটমণি। অধিকন্তু, পৃথিবীর যে-সমস্ত ভাষা এখন রাষ্ট্র-ভাষারূপে চলিতেছে, তাহাদের অধিকাংশের ভাব, ভাষা ও সাহিত্য-সম্পৎ তুলনায় বাংলা-ভাষার চেয়ে নিকৃষ্ট। এমন অবস্থায় বাংলা-ভাষা রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা-ভাষা গণ মন ও গণ-চেতনার সহিত সংশ্লিষ্ট; কারণ ইহা এই দেশের শতকরা ৯৯ জনেরও অধিক সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। বর্তমান যুগে, রাষ্ট্রের সহিত জনসাধারণের যোগাযোগ না থাকিলে, রাষ্ট্র অচল হইয়া যায়। রাষ্ট্রের নিজস্ব ভাষার প্রতিষ্ঠা দ্বারাই রাষ্ট্রীয় জনসাধারণের সহিত রাষ্ট্রের যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। যেই দেশের রাষ্ট্র-ভাষার সহিত রাষ্ট্রের জনসাধারণের যোগাযোগ নাই, সেই রাষ্ট্র অধুনা অচল এবং সেই রাষ্ট্র-ভাষা দেশে কোন প্রকারের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আমাদের দেশে ইংরেজীই তাহার নজীর।

প্রায় দেড় শতাব্দী যাবৎ আমাদের দেশে রোলার মেশিনের মত ইংরেজী ভাষাকে জনগণের মনের উপর দিয়া সমানে চালানো হইল, অথচ দেশে শতকরা দুই জনও আজ পর্যন্ত প্রকৃত ইংরেজী শিখিতে পারিল না। ইহার নাম যদি অকৃতকার্যতা না হয়, তবে অকৃতকার্যতা আর কাহাকে বলে?—এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী যেমন স্বাভাবিক, তেমন আবশ্যকও বটে,---অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে।

অবশ্য, এই স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও গণ-ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। ইহা সকল প্রসিদ্ধ ভাষাতেই অল্প-বিস্তর বর্তমান। এমন কি যে-দেশের শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত, সেই দেশের সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও গণ-ভাষায়ও প্রভেদ দেখা যায়। বাংলার সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং গণ-ভাষায়ও প্রভেদ রহিয়াছে। কিন্তু, ইংরেজীর সহিত বাংলার কিংবা বাংলার সহিত উর্দুর যেই জাতীয় প্রভেদ, আলোচ্য প্রভেদ সেই জাতীয় নহে। পারিভাষিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশিষ্ট ভাবপ্রকাশক শব্দকে বাদ দিয়া,---হয়ত তাহার হার শতকরা ২০ (বিশের) অনধিক---অবশিষ্ট শতকরা ৮০ (আশীটি) শব্দ সকল লোকেই বুঝিতে পারে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল ভাষীর মধ্যে জ্ঞান-বিলাস ও শিক্ষা-দীক্ষার আভিজাত্য বিদ্যমান। যত বড় গণতন্ত্রী রাজ্যই হউক না কেন, বিজ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ আজ পর্যন্ত সকলের ভাগ্যে ঘটে নাই। বাংলা-ভাষার বেলায়ও ইহার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া, বর্তমান বাংলা-ভাষার সহিত পূর্ব-পাকিস্তানের গণ-মন ও গণ-চেতনার কোন যোগ নাই, এমন ধূয়া তুলিয়া বাংলা-ভাষাকে তাহার ন্যায্য রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াসকে একেবারেই অমূলক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার বাংলাভাষী মাত্রেরই জন্মগত অধিকার। বাংলা-ভাষার এই রাষ্ট্রীয় অধিকার আজ পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে স্বীকৃত না হইলেও, একদিন না একদিন যে স্বীকৃত হইবে, তাহা আমরা বাংলা-ভাষার প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া একরূপ নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি। বাংলায় বাংলা-ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল কিনা, সে প্রমাণ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য,

তথাপি ইহা যে বিনা অনুষ্ঠানে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বাংলার গোঁড়া হিন্দুগণ যখন বাংলা-সাহিত্যের স্রষ্টাদের জন্য 'রৌরব' নরকের ব্যবস্থায় ব্যস্ত, তখন বাংলার মুসলমান আমীর ওমরাহগণ এই ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার বিনা অনুষ্ঠানে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, জন-সাধারণের সহিত ইহার যোগ রক্ষা, রাষ্ট্রের সকলের মধ্যে পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানের বাহনরূপে ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বাংলা-ভাষার মৌলিক রাষ্ট্রীয় অধিকার মানিয়া লইয়াছিলেন।

বাংলা-ভাষা যে মুসলমান আমলে বাংলাদেশে সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ আছে। "সরকারী" শব্দের দ্বারা রাষ্ট্র-ভাষা বুঝানো হইতেছে না। পাঠান আমলের গোড়ার দিকে আরবী-ভাষা, এবং মোগল-যুগে বরাবরই ফারসী-ভাষা এদেশের রাষ্ট্র-ভাষা ছিল—এ-দেশে আবিষ্কৃত অসংখ্য পাঠান ও মোগল শিলালিপিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতৎসত্ত্বেও এখনও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যদ্দ্বারা বাংলা-ভাষা বাংলা-দেশের মোগল-দপ্তরে অল্প-স্বল্প ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমান করা যায়। বাংলা-ভাষায় লিখিত প্রাচীন দলিল-পত্রাদি ইহার প্রমাণগুলির মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার যাদুঘরে পূর্ব-বাংলার স্বাধীন ভৌমিক মসনদ-ই-আলা ইসা খানের একটি কামান রক্ষিত আছে। ইহার গায়ে 'শ্রী ইছা খান" নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বের গোড়ার দিকে পূর্ব-বঙ্গে ইসা খানের আবির্ভাব ঘটে। এই হিসাবে দেখা যায়, বাংলা-ভাষা মোগল-যুগের গোড়ার দিকে পূর্ব-বঙ্গের স্বাধীন-রাষ্ট্রে ফারসীর সহিত পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়াছিল। মোগল-যুগের শেষের দিকে মুর্শিদাবাদের টাকশাল হইতে সম্রাট শাহ আলমের যত পয়সা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে বাংলা হরফে "এক পাই সিক্কা" কথাটি লিখিত। এই সমস্ত প্রমাণ অকাট্য। ইহা হইতে মনে হয় মোগল-যুগে বাংলা-দেশে বাংলা-ভাষা ফারসীর সহিত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়াছিল।

ইংরেজ আমলে নিম্ন-আদালত অফিসাদিতে বাংলা-ভাষার দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্বন্ধে কেনা অবগত আছেন? চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয়, বাংলা-ভাষাই ইংরেজী-ভাষাকে একরূপ একঘরে করিয়া রাখিয়াছিল।

আমাদের দেশের কেরানীরা ইংরেজ রাজত্বের গোড়া হইতেই আমলাতন্ত্র চালাইয়াছেন, অথচ নাম হইয়াছে ইংরাজের, কারণ, আফিসে কেরানীরা স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। ঠিক এইরূপে ইংরেজ আমলে এবং বর্তমান স্বাধীনতার সময়ে কোর্ট-কাচারী হইতে আরম্ভ করিয়া 'কৌন্সিল হাউস' অবধি বাংলা-ভাষাও তলে তলে রাষ্ট্র চালাইয়াছে ও চালাইতেছে। যখনই জন-সাধারণের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে, তখনই সকলকে বাংলা-ভাষার দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে,—এখনও হয়। তবে, আর রাষ্ট্র-পরিচালনায় নামে মাত্র অন্য ভাষার ব্যবহার করিয়া এই অভিনয় কেন? আমরা যদি এখন দেশের প্রভু হই, তবে অন্যের ভাষা আমাদের উপর, আমাদের রাষ্ট্রের উপর, আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিবে কেন? আমাদের অন্য অধিকার যদি স্বীকৃত হয়, তবে আমাদের সর্ব কাজে আমাদের ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার স্বীকৃত হইবে না কেন? 'অন্যায়', 'অত্যাচার', 'অবিচার' ও 'জুলুম' ব্যতীত অন্য কোন শব্দ ব্যবহারে এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেওয়া যায় কি?

ভাষাভাষী লোক-সংখ্যার দ্বারা ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার নির্ণয়, আধুনিক সভ্য জগতের একটি প্রধান নীতি। আজকাল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সংখ্যা একটি বিশেষ বড় কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংখ্যায় ভারি না হইলে ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকার ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ অধিকার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বড় একটা স্বীকৃত হয় না। ভাষার বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে না। বর্তমান পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রচিন্তা-নায়ক এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্দ্রষ্টার অপূর্ব স্বপ্ন 'সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ-সংস্থা'' (United Nations Organization) নামক পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানও ভাষাভাষী লোক সংখ্যায় নির্ভর করিয়া, এই প্রতিষ্ঠানে ব্যবহর্তব্য কতিপয় ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ইহাতে ভাষাভাষী লোক-সংখ্যার ভিত্তিতে যেই চারিটি প্রধান ভাষার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপ:---

স্থানের ক্রম	অধিকারপ্রাপ্ত ভাষার নাম	ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা
প্রথম	চীনা-ভাষা	৪৮৮,৫৭৩,০০০
দ্বিতীয়	ইংরেজী-ভাষা	২৪৭,৮৩৩,০০০
তৃতীয়	রুশীয়-ভাষা	১৬৬,০০০,০০০
চতুর্থ	স্পেনীয়-ভাষা	১০২,৭০০,০০০

ইহা হইতে দেখা যাইবে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সংস্থায়" ব্যবহৃত না হওয়ার একমাত্র কারণ,—ঐ-ঐ ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাল্পতা। সুতরাং সাংখ্যিক অনুপাত ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি সর্ব-জাতিস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ নীতি।

এইবার, এই নীতি বাংলা-ভাষার বেলায় কতখানি প্রযোজ্য, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। পাকিস্তানকে একটি 'ফেডারেশন' বা রাষ্ট্র-সম্মিলন বলিয়া সম্প্রতি অভিহিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ব-বঙ্গ পাকিস্তানের সম্মিলন-গঠনকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি হইয়া দাঁড়ায়। এই দিক হইতে বাংলার অবস্থা কিরূপ. তাহা নিম্নে দেখানো হইল :—

পাকিস্তানভুক্ত দেশসমূহ	এই সমস্ত দেশে প্রচলিত ভাষা	পূর্ণ অঙ্কে লোক সংখ্যা	শতকরা
১। পশ্চিম পাঞ্জাব	পাঞ্জাবী ও গুরুমুখী	১ কোটি ৫৭ লক্ষ	২৩.৪
২। সীমান্ত প্রদেশ	পোস্তু	২০ লক্ষ	৩.০
৩। বেলুচিস্তান	বেলুচী	২৬ লক্ষ	৩.৯
৪। সিন্ধু	সিন্ধী	৪৫ লক্ষ	৬.৭
৫। পূর্ববঙ্গ (সিলেটসহ)	বাংলা	৪ কোটি ২৩ লক্ষ	৬৩.০
	মোট	৬ কোটি ৭১ লক্ষ	১০০

এই হিসাব হইতে দেখা যায়, পাকিস্তানের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৬৩ জন লোকে একটি ভাষা বলে,—এবং সেইটিই বাংলা-ভাষা। অবশিষ্ট শতকরা মাত্র ৩৭ জন লোক পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, পোস্তু, বেলুচী ও সিন্ধী ভাষা বলে। এই ক্ষেত্রে যদি "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সংস্থার" নীতি প্রয়োগ করা যায়, (তাহা প্রয়োগ করা যে কেন যাইবে না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই) তবে নিঃসঙ্কোচে বলিতে হয়, সমগ্র পাকিস্তানে যদি কোন ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবাব যোগ্যতা থাকে, তাহা একমাত্র বাংলা-ভাষারই আছে, অন্য কোন ভাষার নাই।

তবে, এই স্থলে আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। পাকিস্তানের প্রদেশ-পঞ্চকের প্রত্যেকটির ভাষা পৃথক্। পূর্ব-বঙ্গ যদি Brute Majority (ব্রুট্ ম্যাজরিটি) পাশবিক অর্থাৎ নির্বিবেক সংখ্যাধিক্যের বলে ইহার ভাষা বাংলাকে সিন্ধু, সীমান্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তানের ভাষাগুলির উপর

জগদ্দল প্রস্তরের মত চাপাইয়া দিতে চায়, ঐ সমস্ত দেশ সহ্য করিবে কেন? প্রদেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কথাও ভাবিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার ভিত্তিতেই পাকিস্তান-হিন্দুস্থান বিভক্ত হইয়াছে এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতিই পাকিস্তানের নীতি। কেননা, হিন্দুস্থান এই নীতির পূর্ণ স্বীকৃতি কোন দিন দান করে নাই বলিয়াই, ভারত-বিভাগ সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে,—পাকিস্তানের স্বপ্ন সফল হইয়াছে। বাংলা যেমন পাকিস্তান কর্তৃক ব্যবহৃত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতির দাবী উত্থাপন করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী, পাকিস্তানভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রেরও সেই নীতি ব্যবহারের অনুরূপ অধিকার রহিয়াছে। অতএব, পূর্ববঙ্গে বাংলা-ভাষা রাষ্ট্র-ভাষা হইবার দাবী যেইরূপ ন্যায়সঙ্গত ও সমীচীন, পাকিস্তানভুক্ত অন্যান্য প্রদেশেও স্ব-স্ব ভাষার রাষ্ট্র-ভাষা হইবার দাবী সেইরূপ সঙ্গত।

এই ক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া, পাকিস্তান রাষ্ট্র-সম্মিলনভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্রের মধ্যস্থতায় একটিমাত্র ভাষার বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে, পাকিস্তানের সামগ্রিক সংহতি সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বোধ হয়, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই সমগ্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা একটিমাত্র হইবার ধারণা অনেকেই পোষণ করেন। এই ধারণার মূলে হয়ত কথঞ্চিত সত্য নিহিত আছে। আমরা সকলে একই রাষ্ট্রের নাগরিক, এই কথা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের একটি মাত্র ভাষা হইবার আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিভিন্ন ভাষাভাষী রাষ্ট্রের সম্মিলনে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে এক ভাষা ব্যবহার করিলে, রাষ্ট্রীয় সংহতি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা ব্যতীত কতকগুলি ব্যবহারিক সুবিধাও লাভ করিবে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-সংক্রান্ত কাজের সুবিধা অন্যতম। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভাষা ইংরেজী হইলে, কাহারও আপত্তি করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু, তাহা ইংরেজ শাসন হইতে সদ্যোমুক্ত এই রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতে হয়ত কেহ স্বীকার করিতে চাহিবে না। এই অবস্থায় প্রদেশসমূহে প্রাদেশিক ভাষার রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া, কেন্দ্রীয়-সরকার উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করিলে, কাহারও বিশেষ আপত্তির কারণ থাকা উচিত নহে। কেননা, উর্দু এক

হিসাবে পাকিস্তানভুক্ত কোন রাষ্ট্রের মাতৃভাষা নহে। তবে, ইহা বহুদিন হইতে পাঞ্জাবের আদালতের ভাষা এবং পাঞ্জাবের শিক্ষিত লোকের সাহিত্যিক ভাষা। ইহাতে পাঞ্জাবীরা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-বিভাগ গুলিতে প্রথম প্রথম কিঞ্চিৎ সুবিধা-ভোগ করিলেও শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী প্রদেশগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবীদের সমকক্ষতা লাভ করিবে বলিয়া খুবই আশা করা যায়। যেইটুকু প্রাথমিক অসুবিধা হইবে, তাহা রাষ্ট্রীয়-সংহতির অনুরোধে স্বীকার করিয়া না লইলে, পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে।

এই আশঙ্কা পোষণ করা সত্ত্বেও, আমরা উর্দুকে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃতি দিতে সঙ্কোচ বোধ করি। কারণ, ইহাতে আমাদের উদারতা শেষ পর্যন্ত আমাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ব্যতীত পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের একটি বিশেষ দুর্বলতারূপে পরিগণিত হইতে পারে। কেননা, আমরা মনে করি, নির্বিবেক-সংখ্যাধিক্যের' (Brute Majority) অভিশাপের চেয়ে 'সার্থক সংখ্যাল্পতার' (Significant Minority) দৌরাত্ম্যও ক্ষুদ্র অভিশাপ নহে।

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা

(কৃষ্টি, নভেম্বর, ১৯৪৭)

যুদ্ধোত্তর বিশ্বের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পাকিস্তান অন্যতম। আয়তন ও লোক-সংখ্যায় ইহা পৃথিবীর স্বাধীন মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ইহার অভ্যুদয়ও বিশ্বের একান্তই বিস্ময়-স্বরূপ। সুতরাং, ইহার প্রতি শুধু মুস্‌লিম জগতের উৎসুক দৃষ্টি যে নিবদ্ধ তাহা নহে, বরং নিখিল বিশ্বের কৌতূহলোদ্দীপক লক্ষ্যও ইহার প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। অধিকন্তু, আশা করা যাইতেছে যে, অচিরাৎ পৃথিবীর এই বৃহত্তম মুস্‌লিম রাষ্ট্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিশ্বের অন্যান্য মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। এহেন অপর্যাপ্ত সম্ভাবনা লইয়া যে-রাজ্য বিশ্বের রাষ্ট্র-সংঘে আপন ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে, যাহাতে তাহার সর্ব ক্রিয়াকলাপ সকল বিষয়ে আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠে, সে-সম্বন্ধে ইহার প্রত্যেক নাগরিক সচেতন ও সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। প্রধানতঃ এই কারণেই বক্ষ্যমাণ বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে।

পাকিস্তান একটি দ্বিধা-বিভক্ত রাষ্ট্র। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলে ইহা খণ্ডিত। পাঞ্জাবের অধিকাংশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ লইয়া ইহার পশ্চিম অঞ্চল গঠিত এবং আসামের কিয়দংশ অর্থাৎ সিলেট বা শ্রীহট্ট ও বাংলার অধিকাংশ লইয়া ইহার পূর্ব অঞ্চল সৃষ্ট। ভৌগোলিক দিক্ হইতে এই রাষ্ট্রের দুই অঞ্চলের সংস্থান আদর্শস্থানীয় নহে ; কেন না ইহার পূর্বভাগ পশ্চিমভাগ হইতে প্রায় এক হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ফলে, এই রাষ্ট্রের এক অংশের সহিত অপর অংশের যোগাযোগ রক্ষা করা একটা জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। জল, স্থল ও বিমান পথে শান্তির সময় এই যোগাযোগ রক্ষা করা কতকটা সহজ ; কিন্তু দেশে অশান্তি দেখা দিলে, সে যোগাযোগ রক্ষা করা একরূপ কঠিন। এই সমস্যার সুচারু সমাধান কখন সম্ভবপর হইবে, তাহা একমাত্র ভবিতব্যতাই বলিতে পারে।

সংস্কৃতির দিক হইতেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অবস্থা একরূপ নহে। পশ্চিম-পাকিস্তান অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ এক ভৌগোলিক প্রভাবে প্রভাবিত একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এই ভূখণ্ডের অধিবাসিবৃন্দের মানব গোষ্ঠীগত-বৈশিষ্ট্য, জীবন যাপন প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি অবিকল একরূপ না হইলেও, দুই তৃতীয়াংশ একরূপ। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তান অন্য এক ভৌগোলিক প্রভাবে প্রভাবিত অঞ্চল। ইহার মানব-গোষ্ঠীগত-বৈশিষ্ট্য, জীবন যাপন-প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি তিন-চতুর্থাংশ একরূপ। প্রকৃতিই এই অঞ্চলের লোককে এমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে উক্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক দিক্ হইতে কোন বড় প্রকারের অসামঞ্জস্য নাই।

তবে, ধর্মীয় দিক্ হইতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসূত্রে আবদ্ধ;—বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলদ্বয়ের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিয়াই চিন্তা করা হইতেছে। মনে রাখা উচিত, ধর্ম মানব-সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ বটে, কিন্তু ইহা তাহার সমস্তটুকু নয়। একমাত্র ধর্ম ব্যতীত মানব-সংস্কৃতির অন্যান্য দিক্, যেমন, ভৌগোলিক প্রভাব, মানব-গোষ্ঠীগত-বৈশিষ্ট্য, জীবন-যাপন-প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি দিক্ হইতে পাকিস্তানের উভয় অংশে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের ভাগই বেশী।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে কিংবা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম-বন্ধনের স্থান কোথায়? ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে, রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে রক্তের বন্ধন, স্বার্থের বন্ধন, সংস্কৃতির বন্ধন, সম্প্রীতির বন্ধন প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্ম-বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। যদি তাহা হইত, মিসরীয় মুসলমান ইরানের মুসলমান হইতে, তুরস্কের মুসলমান আরবের মুসলমান হইতে, আল্‌জিরিয়ার মুসলমান ভারতের বা আফগানিস্তানের মুসলমান হইতে, আমেরিকার খ্রীস্টান ইংলণ্ডের খ্রীস্টান হইতে, রুশিয়ার খ্রীস্টান ফ্রান্স বা জার্মেনীর খ্রীস্টান হইতে কখনও পৃথক্ হইত না। অথচ আজ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন।

ভাষার বেলায়ও এই মূলনীতির ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং, ভাষার বন্ধনও অচ্ছেদ্য বন্ধন নহে। ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, কোন দেশ ইহার নিজের ভাষা দিয়া অপর দেশকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। যদি তাহা সম্ভবপর হইত, ইংরেজী ভাষাভাষী মার্কিন জাতি

ইংরেজী-ভাষাভাষী ইংরেজ জাতি হইতে পৃথক্ হইত না। আরবী-ভাষাভাষী মিসরীয়গণও কি কখন আরবী-ভাষাভাষী আরবীয়দের কাছ হইতে সরিয়া পড়িয়া পৃথক্ রাজ্য গঠন করিত? ইংরেজী-ভাষাভাষী আয়ারল্যাণ্ডও কি কখনও ইংরেজদের কাছ হইতে সরিয়া পড়িত,? প্রকৃত পক্ষে, ধর্মই বলুন আর ভাষাই বলুন কিংবা অন্য যে-কোন বন্ধনের কথাই পাড়ুন, কোন কিছুই রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রে মানুষকে মানুষের সহিত, তৎসূত্রে দেশকে দেশের সহিত, কখনও অতীতে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, বর্ত্তমানেও বাঁধিয়া রাখিতেছে না এবং ভবিষ্যতেও বাঁধিয়া রাখিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

এতৎসত্ত্বেও, এক দেশের মানুষের সহিত অন্য দেশের মানুষের সম্বন্ধ যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে,—নূতন নূতন রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক যুগেও দেশ-দেশান্তরের লোক কত নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতেছে কিংবা গঠনের আয়োজন করিতেছে। ইহাও বা কি করিয়া সম্ভবপর হয়? বস্তুতঃ এক বা একাধিক দেশের মানুষের মধ্যে একই প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রেরণার প্রাবল্য ঘটিলে, সেই বা সেই-সেই দেশের মানুষ মিলিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিশ্বের সাম্প্রতিক সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলিই এই নীতির প্রধান ও আধুনিক উদাহরণ।

পাকিস্তানও একটি আধুনিক সম্মিলিত রাষ্ট্র। যে-সমস্ত রাজ্য বা দেশ লইয়া এই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশ শিক্ষিত অধিবাসী মনে করেন পাকিস্তান আধুনিক রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য হইতে মুক্ত নহে। সত্যই আধুনিক রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য লইয়াই পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রূপ গ্রহণ করিবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে, কোন্ প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রেরণার প্রাবল্য ঘটায়, বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত-প্রদেশ প্রভৃতি পাঁচ-পাঁচটি দেশ মিলিয়া এক রাষ্ট্রীয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইল? ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রেরণাকে যাঁহারা এই নবীন রাষ্ট্রের অন্তঃসলিলা ফল্গু বলিয়া মনে করেন, কিংবা প্রকৃত রাষ্ট্রীয়-বন্ধন বলিয়া নির্বিচারে স্বীকার করেন, তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি স্বচ্ছ ত নহেই, বরং অদূরদর্শিতার ঘোর কুয়াশাজালে সমাচ্ছন্ন। একই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ কয়েক কোটি মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতেই এই রাষ্ট্র পরিকল্পিত ও পরিমূর্তিত বলিয়া ইহার গঠনের মূলে শুধু ধর্ম ও সম্প্রদায়ই নিহিত,-‐এমন মনে করা

সুস্থ বুদ্ধি ও বলিষ্ঠ মননশীলতার পরিচায়ক নহে। নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, পাকিস্তান-রাষ্ট্র গঠনে ধর্ম বা সম্প্রদায় বড় নহে,—আত্মনিয়ন্ত্রণই বড়। কেন না, আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতির ভিত্তিতেই এই রাষ্ট্র পরিকল্পিত ও পরিমূর্তিত। মনে রাখিতে হইবে, আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি স্বার্থ-পরতার নীতি,—নিঃস্বার্থতার নীতি নহে। এই জন্য রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ আত্মপ্রাধান্য স্থাপন,—আত্মবিসর্জন নহে। কারণ, আপন-আপন ধর্মকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবন-যাপন-প্রণালী প্রভৃতির ন্যায় বিষয়গুলি সম্মানজনকভাবে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকার নামই আত্মনিয়ন্ত্রণ। যেখানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, ধরিয়া লইতে হইবে, সেখানে নিজের চিন্তাই প্রবল, অপরের চিন্তা দুর্বল। এই নীতিতে পাকিস্তান-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, এই রাষ্ট্রান্তর্গত দেশগুলি বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তান যদি নিজের কথাই বেশি করিয়া চিন্তা করে, তাহাতে অস্বাভাবিকতা দেখিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব-পাকিস্তান বর্তমানে নিজের কথাই বেশি করিয়া ভাবিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ,—নানা দিক্ হইতে আজ তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি আক্রান্ত। অধিকন্তু, ভাষার দিক হইতে এই নীতি আক্রান্ত হইবার যে-সম্ভাবনা সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষে বিচলিত হইবারই কথা। পূর্ব-পাকিস্তানের আপন ভাষা বাংলা। আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি অনুসৃত হইলে, পাকিস্তানের দিক্ হইতে বাংলা-ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা যায় না। কিন্তু, চতুর্দিকের হাবভাব দেখিয়া মনে হইতেছে, রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রে বাংলা উর্দু্র দ্বারা স্থানান্তরিত হইবে। এই সম্ভাবনাই পূর্ব-পাকিস্তানের জীবনী-শক্তির মূলে আঘাত করিয়াছে। সুতরাং, পূর্ব-পাকিস্তান বিচলিত না হইয়া পারে না।

সম্প্রতি অনেকেই উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারূপে চালাই-বার কথা চিন্তা করিতেছেন। আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক ইতি-মধ্যেই উর্দুর পক্ষে কিছুটা প্রচারণাও চালাইয়াছেন। আবার কেহ কেহ পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দুর প্রচুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নও দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উর্দু-ভাষার প্রতি কাহারও যে অশ্রদ্ধা আছে, তাহা নহে। উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করিলে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর লাভ-লোকসান

কতখানি, তাহা খতাইয়া না দেখিয়া, ইহাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা হইলে, নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। বিশেষ করিয়া, যে নবীন-রাষ্ট্রের মঙ্গল চিন্তায়—কেননা আমরা অমঙ্গলের কথা ভাবিতেই পারি না—উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে প্রবর্তিত করিবার কথা উঠিয়াছে, ইহার প্রচলনে সেই রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল কতখানি সাধিত হইবে, সে-বিষয় বিচার করিয়া না দেখা একান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানবাসী রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করিবে কিনা, জানি না। হয়ত বা তাঁহারা তাহা করিবেন না। তবে, এ-কথা একান্তই সত্য যে, যদি তাঁহারা উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলাকে উদ্বন্ধনে মারিবার ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিতে হইবে। কেননা, রাষ্ট্র-ভাষার পশ্চাতে থাকিবে এক বিরাট রাষ্ট্রশক্তি। এই ভাষার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকার শক্তি যে বাংলা-ভাষার নাই, সে-কথা মনে করি না। কিন্তু, তাহা জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচা,—আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে বাঁচা নয়। এই জাতীয় বাঁচার চেয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতিতে বাঁচার মূল্য অনেক। আমার দেশে আমি ঘরে-বাহিরে আমার ভাষায় কথা বলিতে পারিব না, আমার ভাষায় লিখিতে-পড়িতে পারিব না, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিব না, নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে মনের মত করিয়া সুখ-দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিব না,—ইহার চেয়ে বৃহৎ আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মহত্যা আছে কি ? সত্যই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মহত্যাকে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে কে আমাদিগকে বাঁচাইবে ?

বর্তমানে ইংরেজী আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা। আমাদের শতকরা নব্বই জন শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজী-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তাঁহারা ইংরেজী-সাহিত্যে বিশেষ পোক্ত হউন বা না হউন, অন্ততঃ ইংরেজী-ভাষা বড়, একটা ভুল লেখেন না। এই জন্য তাঁহাদিগকে যে-পরিমাণ মানসিক শক্তি দীর্ঘদিন ধরিয়া ক্ষয় করিতে হয়, তাহার ফলে তাঁহাদের মধ্য হইতে প্রায় শতকরা নব্বই জন বাংলা-ভাষায় নিতান্তই অজ্ঞ থাকিতে বাধ্য হন। বাংলা লেখা ও পড়ার অনভ্যস্ততার ফলে এবং শিক্ষা করার সুযোগের অভাবে, বিশেষ করিয়া ব্যবহারিক জীবনে বাংলার কোন মূল্য না থাকায় তৎপ্রতি ,উপেক্ষা বশতঃ, ইংরেজী শিক্ষিতগণ যখন স্বাভাবিক মানসিক

প্রেরণায় বাংলা লিখিতে চাহেন কিংবা অন্য কোন কারণে লিখিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহারা এতখানি বেগ পাইতে থাকেন যে, বাংলা তাঁহাদের কাছে একটি বিদেশী ভাষার চেয়েও অধিক কঠিন বলিয়া মনে হইতে থাকে। প্রধানতঃ এই কারণেই, বাংলা বানান, বাংলা হরফ, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখ হইতে এমন সব কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যাহা শুনিলে হাসি সংরবণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সমস্ত কথা তাঁহাদের দাস-সুলভ মানসকিতারই পরিচায়ক।

বাংলার দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, ইহারা পণ্ডিত-মূর্খ। এতৎসত্ত্বেও মান সম্মান, চাকুরি-বাক্‌রি বা সামাজিক প্রভাব প্রতি-পত্তি, এমন কি বৈবাহিক মাহার্য্যও ইহাদেরই একমাত্র প্রাপ্য। আর, সঙ্গে সঙ্গে, উপেক্ষা, বিদ্রূপ অবহেলা অসম্মান প্রভৃতিই হইল বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ললাট-লিপি। বাজার-দর বলিতে ত ইঁহাদের কিছুই নাই ; ইঁহারা যেন বিকাইতেই চাহেন না। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী জ্ঞানের মাপকাঠিই জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে এখন যোগ্যতার মান বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইংরেজী-ভাষা আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র-ভাষা না হইলে, এমনটি কখনও হইত কি? উর্দু আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হইলে, এইরূপ ব্যাপার যে হইবে না, এমন চিন্তা করাও নিছক বাতুলতা নয় কি?

রাষ্ট্র-ভাষায় অনভিজ্ঞতা এক মহা বিড়ম্বনার বিষয়। ইহা একটি ব্যক্তিগত এবং তৎসূত্রে জাতিগত অপমানের বিষয়ও বটে। এইখানে 'জাতিগত' শব্দের দ্যোতনা 'ধর্মীয়-জাতির' দ্যোতনা নহে,—এক ভাষা-ভাষী মানব গোষ্ঠীগত জাতীয়তার ব্যঞ্জনাই লক্ষ্য। রাষ্ট্রভাষা না জানিলে মানুষরূপে নিজের দেশেও বাস করা যায় না ; একটি আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন নাগরিকরূপে রাষ্ট্রে বাস করাও কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, শতকরা নব্বই জন ভারতবাসী। এহেন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অথবা জাতি শুধু শাসিত ও শোষিতই হইয়া থাকে, কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হয় না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে না থাকিলে ব্যক্তি ও জাতির সম্যক্ বিকাশ অসম্ভব। সুতরাং, উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলা-ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান বাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে।

ইংরেজীর ন্যায় উর্দুও পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর পক্ষে,—অবশ্য সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ স্বল্প-সংখ্যক বাংলা-ঘেঁষা উর্দুভাষী মুসলমান এবং শিক্ষিত লোকের কথা বাদ দিয়া,—একটি অপরিচিত বিদেশীয় ভাষা। বিদেশীয় ভাষার ন্যায় এক মহা-অভিশাপ জন-সাধারণের জন্য দ্বিতীয়টি নাই। দুইশত বৎসরের চেষ্টার পরেও, ইংরেজেরা আমাদের দেশে শতকরা ১২ (বার) জনের বেশী লোককে অক্ষরজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ইংরেজীকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে চালু করিতে গিয়াই এই দুর্দশা ঘটিয়াছে,—হয়ত সবটি নহে, বেশির ভাগ যে তাহাই একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ জাতিকে গলা টিপিয়া মারিতে হইলেই, তাহার উপর বিদেশীয় ভাষার ন্যায় একটি অভিশাপকে চাপাইয়া দিতে হয়। ইংরেজেরা তাঁহাদের ভাষার চাপ দিয়া আমাদিগকে এত দিন জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন,—শাসন ও শোষণ করিবার সুবিধার জন্য। এখন আমরা উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করিয়া কোন্ দুঃখে পুনর্মূষিক বনিয়া যাইব? ইহাতে পূর্ব-পাকিস্তান কি পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসন ও শোষণের বস্তুরূপে পরিণত হইবে না? ইহার নাম যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ হয়, তবে আত্মবিসর্জন আর কাহাকে বলে?

সে যাহা হউক, যতদূর মনে হয়, পাকিস্তান-রাষ্ট্রকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতে গিয়াই, উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে পূর্বপাকিস্তানে চালাইবার কথা উঠিয়াছে। এ-কথা একান্তই সত্য যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্থান-পতনে এবং উদয়াস্তে সম্পূর্ণটি না হইলেও বেশির ভাগ নির্ভরশীল। সুতরাং, পাকিস্তানের অভ্যুদয়ে এই রাষ্ট্রের বিষয়াদি সম্বন্ধে লোকের, বিশেষ করিয়া রাজনীতিবিদ্‌গণের চিন্তাধারা সামগ্রিকভাবে পরিচালিত হওয়া কিছুই অপ্রতাশিত ব্যাপার নহে। অধিকন্তু, বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয়গণের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজীর পক্ষপুটে দীর্ঘকাল বাস করিয়া পাকিস্তানের ন্যায় একটি নবীন রাষ্ট্রের একাধিক রাষ্ট্র ভাষার কথা চিন্তা করা অনেকখানি অস্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। অতএব কতকটা পূর্ব অভ্যাসবশে, কতকটা একত্ববোধের উৎসাহাতিশয্যে এবং কতকটা মুক্তবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তান এবং সেই সূত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে পাইবার জন্য চিন্তা করিতেছি।

এক রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র ভাষা অচল,—আমাদের এই চিন্তা কি মঙ্গলময় ও সুফলপ্রসূ? ইংরেজদের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীরাই রাষ্ট্রকে এইরূপ সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। আসলে কোন রাষ্ট্রকে, বিশেষ করিয়া কোন সংযুক্ত রাষ্ট্রকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করা সাম্রাজ্যবাদেরই লক্ষণ; ইহা কোন গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নহে। যে-জাতি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সে-জাতির ভাষা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে চালাইতে পারিলে শাসিত-জাতি ও দেশের উপর শাসকজাতির সাংস্কৃতিক প্রাধান্য এবং প্রতিপত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় বিজয় পূর্ণ হয় বলিয়া, শাসক-জাতির পক্ষে শাসিত-জাতির শোষণের পথ পরিষ্কার হয়। পাকিস্তান আর যাহা কিছুই হউক, এই জাতীয় সাম্রাজ্যবাদীর রাষ্ট্র নহে। সুতরাং, পূর্ব-পাকিস্তান উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশীয় ভাষা একান্তই অচল, অমঙ্গলময় ও কুফল প্রসূ।

যাঁহারা পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা মুক্তবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নহেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা প্রথমত ভুলিয়া যান যে, পাকিস্তান পৃথক্-পৃথক্ ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত বিভিন্ন ভাষাভাষী রাজ্যসমন্বিত একটি রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের পূর্বাংশে সর্বত্রই বাংলা এবং পশ্চিমাংশের নানা স্থানে নানা ভাষা প্রচলিত। ইহার প্রায় চারি কোটি লোক বাংলা-ভাষা বলে এবং অবশিষ্ট তিন কোটি লোক অন্যান্য ভাষা বলিয়া থাকে। সিন্ধী, লন্ধী, পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, বেলুচী ও পোস্ত প্রভৃতি পশ্চিম-পাকিস্তানী ভাষা জনসাধারণের মৌখিক ভাষা,—লেখা হইলেও, সাহিত্য-সম্পদে সম্পৎশালী নহে, সেই জন্যই রাষ্ট্রীয় ভাষার স্থান দখল করিতে অসমর্থ। প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলে ভব্য ও ভদ্রসমাজে দেশীভাষা চলে না,—তৎস্থলে চলে উর্দু। বলা বাহুল্য, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের সাহিত্যের ভাষাও উর্দু। অতএব, বলিতে পারা যায় যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের লোকের পক্ষে উর্দুকে তাহাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভাষা, বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয়-ভাষা বলিয়া গ্রহণ না করিয়া উপায়ান্তর নাই। যাঁহারা উপায়ান্তর-বিহীন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের ন্যায় যাঁহাদের অন্য উপায় রহিয়াছে, তাঁহারা অনন্যগতিদের শরণ লইবেন কেন? এইরূপ করা কি নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ নহে?

দ্বিতীয়তঃ, বাংলা-ভাষার অবস্থা তাহা নহে। নানা ভাষাভাষী লোক-সংখ্যার অনুপাতে বাংলা-ভাষা পৃথিবীর সপ্তম স্থানীয়। ইহার সাহিত্য-সম্পৎ পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ভাষা হিসাবে ইহার ন্যায় ভাব-প্রকাশের উপযোগী এবং আপন আভ্যন্তরীণ ক্ষমতায় শক্তিশালী ভাষা পৃথিবীতে খুব বেশি নাই। এই ভাষার স্বাভাবিক ক্ষমতা, অসাধারণ সৌন্দর্য এবং আধুনিক সাহিত্য-সম্পৎ সম্বন্ধে অবগত হইয়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রুশ দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার অধ্যাপনা ও চর্চার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং, বাংলার ন্যায় এমন উন্নততর একটি মাতৃভাষাকে ত্যাগ করিয়া বাংলার তুলনায় ভাষা ও সাহিত্য-সম্পদে নিকৃষ্ট উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা শুধু অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে, বরং স্বভাবেরও বিরোধী। মনে রাখিতে হইবে, মানুষের পক্ষে স্বভাবের পরিবর্তন অস্বাভাবিক বলিয়া অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ, আধুনিকতম গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের মূলনীতির কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। রাজনৈতিক কারণেই আধুনিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে। তাহার প্রধান উদাহরণ হইল রুশ-দেশ ও সুইজারল্যাণ্ড। এই সমস্ত রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্রভাষা প্রচলিত আছে। ইহাতে এই রাষ্ট্র-গুলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বা শক্তির কোন লাঘব ঘটে নাই। ফলকথা, রাষ্ট্র এক ব্যাপার, রাষ্ট্রভাষা অন্য ব্যাপার। রাষ্ট্র-ভাষার জন্য রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে না;—রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে আত্মরক্ষা, আত্মপ্রাধান্য, আত্মশক্তিবৃদ্ধি প্রভৃতি রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার হিসাবে। একটির সহিত অন্যটির যোগাযোগ ঘটিলে হয়ত সোনায় সোহাগা হইয়া থাকে; না ঘটিলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ রাষ্ট্রের পতন ঘটে বা রাষ্ট্র শক্তিহীন হইয়া পড়ে,—এমন ধারণা প্রাচীন, উদ্ভট ও অচল।

আমরা দেখিয়াছি, একরাষ্ট্রে একাধিক ভাষা অচল—এই শ্রেণীর ধারণা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ হিন্দুস্তানের কংগ্রেসী কর্ণধারগণও এই মত পোষণ করেন। তাই, তাহারা "হিন্দুস্থানী" নামক এক কৃত্রিম হিন্দী-ভাষাকে বহুভাষী হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার ধূয়া তুলিয়াছেন। কোন প্রকারের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনা তাহাদের মনের নিভৃত গুহায় লুক্কায়িত কিনা, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তবে, এ-কথা সত্য যে, ভারতীয় একত্ববোধের এই উদগ্র

ভক্তগণ কতকটা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর অনুকরণে ও শিক্ষার প্রভাবে এবং কতকটা মুক্তবুদ্ধি ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির অভাবে "হিন্দুস্তানীর" ন্যায় একটি খিচুড়ি ভাষাকে জাতীয়তার বা জাতীয় একতার দোহাই দিয়া রাষ্ট্র ভাষারূপে সমগ্র ভারতের বুকের উপর জগদ্দল-প্রস্তরের ন্যায় চাপাইয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। ইহার ফল যাহা হইবে, তাহার সম্বন্ধে এখনই নিরাপদে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়:— আগামী সপাদ শতাব্দীর মধ্যে তথাকথিত "হিন্দুস্তানী"-ভাষা বর্তমান খিচুড়ি প্রকৃতির সহজ মধ্যপথ ছাড়িয়া পূর্ণ বিশুদ্ধ হিন্দীতে পরিণত হইবে। ফলে, উত্তর ভারতীয় হিন্দী ভাষাভাষী দেশগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাধান্য লাভ করিবে। শিক্ষা-দীক্ষা, বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত দিক, দিয়াই উত্তর-ভারতীয় হিন্দী-ভাষাভাষী দেশসমূহ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিলাভ করিবে। আবার নূতন করিয়া উত্তর-ভারতীয় আর্য-গণ শুধু দাক্ষিণাত্য নহে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত সকল রাজ্য জয় করিবেন; আবার প্রাচীন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। তখন ভারতের এই যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত থাকে না মুক্ত হয়, সে কথা বলা যায় না।

কংগ্রেসের অনুকরণে মুসলীম-লীগও উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করিবার একটি প্রবল বাসনা পোষণ করিতেছেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। কেননা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উভয়ের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যদি এই কারণে পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দুকে প্রচলিত করিবার আয়োজন চলিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, আমরা এখনও অপরের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করিবার উপযুক্ত হই নাই। হিন্দুস্তান কি করিতেছে বা কি করিবে, তাহা না দেখিয়া অথবা তাহার অনুকরণ না করিয়া যদি আমাদের কিছুই করিবার সাহস ও ক্ষমতা না থাকে, তবে বর্তমান আজাদীর, এই স্বাধীনতার, এই মুক্তির মূল্য কি? পরাণুকরণ ও পরনির্ভরশীলতা শিশুসুলভ গুণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ যে বলিষ্ঠ চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছেন, রাষ্ট্র ভাষার বেলায় আসিয়া লীগ কি তাহা ভুলিয়া যাইবেন বা যাইতে পারেন? এমন অসম্ভব ব্যাপারও যদি সম্ভবপর হয়, তবে বলিতে হইবে, আমরা এখনও রাজনীতিতে শিশুপনার উর্দ্ধে উঠিতে পারি নাই। এমন শৈশব অবস্থায় কল্পনার দৃষ্টিতে সমস্তই সম্ভবপর; সুতরাং পাকিস্তানের

পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বাংলায়ও রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা না হইয়া উর্দু হওয়া সম্ভবপর।

কেহ কেহ মনে করেন, কংগ্রেসীদের "হিন্দুস্তানী" তথা হিন্দীর অনুকরণে পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষা করার কথা চলিতেছে না; ইহার অন্য একটি কারণ আছে এবং তাহা এই: হিন্দুস্তান উর্দুর পরিবর্তে "হিন্দুস্তানী" অর্থাৎ হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়া উত্তর-ভারতীয় উর্দুভাষী মুসলমানদের মনে দারুণ আঘাত হানিয়াছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র-গঠনে উর্দুভাষী মুসলমানদের দান অত্যধিক। অতএব পাকিস্তানেও যদি উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষা করা না হয়, তবে হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা দিবার মত আর কিছুই থাকে না।

পাকিস্তান-রাষ্ট্র-গঠনে উর্দুভাষী মুসলমানদের দান কতখানি, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয়-অবস্থা বিশেষভাবে স্থায়িত্বপ্রাপ্ত না হইলে, তাহার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপরও নহে। পাকিস্তান-বাসীর পক্ষে উর্দুভাষীদের ঋণের পরিমিত প্রতিদান কি হইবে এবং কি প্রকৃতির হইবে, তাহার সম্যক্ নির্ণয় এখন কিছুতেই করা যায় না। কালই ইহার সাক্ষী এবং ভাবী ঐতিহাসিকই ইহার বিচারক। কালে ইহার পরিমাণ নির্ণীত হইবে; তখন নিশ্চয়ই পাকিস্তান হিন্দুস্তানের মুসলমানের জন্য কি করিতে পারে কিংবা কি করিবে, তাহা জগৎ দেখিবে। এখন তাহার জন্য মাথা ঘামাইয়া বিশেষ লাভ নাই।

তবে, একথা একান্তই সত্য যে, বর্তমানে হিন্দুস্তানের মুসলমানদিগকে একমাত্র সান্ত্বনা-দান ব্যতীত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে বাস্তবে দিবার মত আর বিশেষ কিছু নাই। কেননা, দিবার মত অবস্থা এখনও এই রাষ্ট্রের হয় নাই। এই অবস্থায় এই সান্ত্বনার মূল্যও যে যথেষ্ট, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, কোন দেশ তাহার রাষ্ট্রীয় জীবন বিসর্জন দিয়া অপরের সান্ত্বনার সামগ্রী হইতে পারে না। নিজে মরিয়া অপরকে বাঁচাইবার মধ্যে একটা বিরাট মাহাত্ম্য ও আদর্শ নিহিত আছে সত্য, কিন্তু অপরের সান্ত্বনার জন্য নিজের আত্মবিসর্জনের মধ্যে কোন বিশেষ মাহাত্ম্য ও উচ্চ আদর্শ নিহিত নাই। পূর্ব-পাকিস্তানবাসী আবশ্যক হইলে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; তবে অনাবশ্যকতায় রাষ্ট্রীয় মৃত্যু আনয়ন করিবে কেন?

ইহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে। নিশ্চিতরূপে এই তথাকথিত সান্ত্বনার পথ উর্দুর সড়ক ধরিয়া আসিবে পূর্ব-পাকিস্তান-বাসীর মরণ,—রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ব-বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর-ভারতীয় পশ্চিম-পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্র-ভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র। পূর্ব-পাকিস্তানবাসী এই জাতীয় আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত কি? স্বাধীনতার অরুণ উষালোকে জাতি নানা ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভুল করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু মারাত্মক ভুল কখনও করে না। যে-জাতি গোড়াতেই এইরূপ মারাত্মক ভুল করে, সে-জাতি জগতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানবাসী তাহার বর্তমান রাষ্ট্রীয় সঙ্কট-মুহূর্তে এইরূপ ভুল করিবে না বলিয়া মনে করাই স্বাভাবিক।

এতৎসত্ত্বেও উর্দু-ভাষার প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানের কোন কোন রাষ্ট্রনায়ক আসক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। ইহারই বা কারণ কি? ইঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা পূর্ব-পাকিস্তানবাসী হইলেও উর্দুকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করেন। সংখ্যায় ইঁহারা একেবারে নগণ্য হইলেও, বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশে ইঁহাদের কেহ কেহ রাজ-নৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার বলে ইঁহারা উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইতে বদ্ধপরিকর কিনা জানা যায় না বটে, তবে উর্দুর প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা যে থাকিবে, তাঁহাতে আর আশ্চর্য কি? উর্দুভাষী হওয়ায় ইঁহারা নিজেদেরকে কুলীন বলিয়া একপ্রকারের অহেতুক গর্ব অনুভব করিয়া থাকেন। হয়ত তাঁহারা ভাবিয়া থাকিবেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হইলে তাঁহাদের পোয়া বার হইবে। প্রকৃত উর্দুভাষীরা কিন্তু তাঁহাদের বাংলা-ঘেঁষা উর্দু শুনিয়া হাসি সংবরণ করিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে ইঁহাদের কোন ভাষা নাই। ইঁহারা একটা মিথ্যা অহমিকার মোহে বিমুগ্ধ হইয়া উর্দুর সমর্থন করেন বা করিতে পারেন। অতএব, এই সমর্থন সর্বথা ও সর্বদা পরিত্যাজ্য।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভদ্র মহোদয়গণ বাংলা-ভাষী হইয়াও উর্দুর সমর্থন করিয়া থাকেন। ইঁহারা হয়, ময়ূরপুচ্ছে দাঁড়কাক, না হয় "হিজ্

মাস্টারস্ ভয়েস্" বা জোহুজুরের দল, না হয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবিহীন ভাগ্যান্বেষী। নতুবা পৃথিবীর উন্নততর ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম বাংলা ভাষাকে ত্যাগ করিয়া উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশী ভাষার আমদানী করার পক্ষে ওকালতী করা তাঁহাদের পক্ষে শোভা পায় না,—স্বাভাবিকও নহে। রাষ্ট্র-ভাষা করিবার জন্য যদি একটি বিদেশী ভাষারই আমদানী করিতে হয়, তবে ইংরেজীই বা কি দোষ করিল? ইহা ত এখনও রাষ্ট্রভাষারূপে আমাদের মধ্যে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষার স্থান হইতে বিচ্যুত করার পক্ষে যুক্তির অভাব নাই। এই ভাষার ধূম্রজালের অন্তরালে থাকিয়া ইংরেজ জাতি আমাদিগকে শাসন ও শোষণ করিয়াছে। এই ভাষা-জ্ঞানের মাপ কাঠিতেই এতকাল আমাদের বিদ্যাবত্তা, মান-সম্মান, উপযুক্ততা প্রভৃতিব মান নির্ণীত হইয়াছে। আমরা এখন ইংরেজ জাতির অধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন জাতিতে পরিণত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ জাগিয়াছে। সুতরাং, আমাদের পূর্ব-প্রভুদের শাসনের ন্যায় শোষণের বন্ধনও আমরা আর জিয়াইয়া রাখিতে চাহিনা। ভাল হউক, মন্দ হউক, মুক্তি চাই, আলো চাই, স্বাধীনতা চাই। অনুভূতি প্রধান হইলেও এই জাতীয় যৌক্তিকতা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

কিন্তু, মাঝখান হইতে উর্দুকে কেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হইবে, সেই যৌক্তিকতা ও সমীচীনতা বুঝিয়া উঠা ভার। পশ্চিম-পাকিস্তানের পক্ষে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা না করিয়া গত্যন্তর নাই; কেন না উর্দুই ঐ অঞ্চলের একমাত্র সভ্য ও ভব্য-ভাষা এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের ভাষা। সেই অঞ্চলের সুবিধার জন্যই কি পূর্ব-পাকিস্তানের ঘাড়ে উর্দুর ভুত চাপাইবার প্রয়াস চলিতেছে? যদি তাহা হয়, আমাদিগকে পূর্বাহ্নেই সাবধান হইতে হইবে। নতুবা, এই ভূত একবার আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিলে, সিন্দবাদের স্কন্ধারোহী ভূতের ন্যায় ইহাকে আর ঘাড় হইতে খসানো যাইবে না।

উর্দুর রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছুই নাই। ইহাব পশ্চাতে ইংরেজীর ন্যায় কোন রাজনৈতিক ঐতিহ্যও নাই। সাধারণতঃ ভারতের মুসলীম-আমলের একটি বিখ্যাত অবদান বলিয়া উর্দুকে স্বীকার কবা হইয়া থাকে। কিন্তু উর্দু মুসলমান আমলে কখনও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে নাই।

তখন ফারসীই ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা। আমাদের দেশে জনসাধারণের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার জন্য খ্রীস্টান মিশনারীগণ এবং হিন্দী-ভাষী পশ্চিমাগুলি যেই জাতীয় ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলিতে বাধ্য হয়, সেই জাতীয় ফারসী মিশ্রিত একটি হিন্দী ভাষার নামই উর্দু। মূল ফারসী বা মূল হিন্দী কোন ভাষারই অন্তর্নিহিত শক্তি উর্দূতে নাই। ইহা একটি কৃত্রিম ভাষা। কালক্রমে উত্তর ভারতীয় এবং দাক্ষিণাত্যের কোন-কোন স্থানের মুসলমানের মাতৃভাষায় পরিণত হওয়ায়, ভারতে ইহার একটা ভাষাগত স্থান হইয়া গিয়াছে। এই জাতীয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার চেয়ে ইংরেজীর ন্যায় পৃথিবীর একটি উন্নতম ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ করা সহস্রাংশে শ্রেয়। কিন্তু, কোন আত্মসম্বুদ্ধ নবজাগ্রৎ জাতি তাহা করিতে পারে না।

মুস্‌লিম ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন বলিয়া উর্দু-ভাষার একটা বিশেষ খ্যাতি আছে। ইহাকে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং তৎসূত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে যে-সাম্প্রতিক প্রবণতা ও প্রচারণা দেখা যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে উর্দুর এই খ্যাতির দানও খুব অল্প বলিয়া মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় এমন একটি অমূলক খ্যাতি একমাত্র উর্দুর ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন ভাষার ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রথম কথা হইল উর্দু কি করিয়া মুস্‌লিম ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন বলিয়া গণ্য হইতে পারে? তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে আরবী-ভাষা ইস্‌লামের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসাবে ভারতীয় মুসলমানদের কাছ হইতে বিদায় লইয়াছে? ভারতীয় মুসলমানেরা তাহা কখনও স্বীকার করিবেন না; অথচ উর্দুকেও আরবীর সমপর্যায়ে এক নিঃশ্বাসে ফেলিয়া দিবেন। এই জাতীয় বিশ্বাস বা তর্কের কোন যুক্তি নাই, উত্তর দেয়াও কঠিন।

দ্বিতীয়তঃ উর্দু হইল, উত্তর-ভারতীয় মুষ্টিমেয়, মুসলমানের মাতৃভাষা। ইহাতে বেশ কতকগুলি ভাল ভাল আরবী ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদও আছে,—তবে তাহার অধিকাংশই অবিশ্বস্ত। মৌলানা শিবলীর "সীরতুন্নবী" জাতীয় মৌলিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থের সংখ্যা উর্দুতে বেশী নাই। যাহা আছে, তাহা প্রায়ই "বেহেশ্‌তী জেওর"-জাতীয় সংহিতা-শ্রেণীর সঙ্কলনগ্রন্থ, শুধু "রেসালা" বা সংহিতা শ্রেণীর পুস্তিকা এবং অনুবাদ—তাহা বিশ্বস্তই হউক আর

অবিশ্বস্ত হউক,—লইয়া যদি কোন ভাষা অন্য একটি ভাষার মর্যাদার দাবী করিতে পারে, অর্থাৎ শুধু "রেসালা" ও "অনুবাদ" লইয়া যদি উর্দু আরবী ভাষার মর্যাদা পায় বা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকেনা। প্রকৃতপক্ষে শুধু অনুবাদ বা তজ্জাতীয় পুস্তক-পুস্তিকা লইয়া পৃথিবীতে কোন ভাষা মূলভাষার মর্যাদা লাভ করে নাই। উর্দুও কিছুতেই ইস্‌লামী ভাষা আরবীয় মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। উর্দুকে সেই মর্যাদা দিতে গেলে, ইহা একটি পচা ধর্মীয় ভাষা হইয়া দাঁড়ায়; কেননা গল্পের ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিহিত গর্দভের ন্যায় এই ভাষার গায়ে আরবী ও ফার্‌সীর ভাষার বর্ণমালা পরিহিত। এই কৃত্রিম পোশাকটি ফেলিয়া দিলেই, এই ভাষার স্বরূপ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে পাকিস্তানে চালু করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি দেখানো হইয়া থাকে;—তাহা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাব আদান-প্রদানের অজুহাত। ইহার ন্যায় এমন দুর্বল যুক্তি সচরাচর খুব বেশি দেখা যায় না। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, ভারতের অন্যান্য মুসলমানের সহিত (এখানে মনে রাখিতে হইবে, ভারতের অল্প সংখ্যক মুসলমানই উর্দুভাষী) পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানগণকে ভাবের আদান-প্রদান করিতে হইবে, তথাপি পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর পক্ষে উর্দু শিখার যৌক্তিকতা কোথায়? কোন ভিন্নভাষী লোকের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য পরস্পর যে পরস্পরের ভাষা শিখিতে হইবে, এমন আবশ্যকতা আধুনিক জগতে অনুভূত হয় না। যদি হইত, তবে রুশভাষী ষ্টেলিন কখনও ইংরেজী ভাষী চার্চিলের সহিত এবং চীনাভাষী চিয়াংকাইশেক রুশভাষী ষ্টেলিন ও ইংরেজীভাষী চার্চিলের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে পারিতেন না।

অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় মুসলমানদের সহিত পাকিস্তানের মুসলমানদের যোগাযোগ ছিন্ন হইবে এবং ছিন্ন হইতে বাধ্য। ১৯৪৮ সালের জুন মাস হইতে এই যোগসূত্র ছিন্ন হইবে এবং ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবধান দূর হইতে দূরতর হতেই থাকিবে। তখন পাকিস্তানের মুসলমানদের ভারতীয় মুস্‌লিম-প্রীতি এবং ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানী মুসলিম-প্রীতি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাইবে। এখন হইতে চারিদিকে

তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তখন পাকিস্তানের মুসলমানদের সহিত ভারতীয় মুসলমানদের যে-যোগাযোগ থাকিবে ও ভাবের আদান-প্রদান চলিবে, তাহা হইবে তুর্কী, আরব, মিসর, ইরান প্রভৃতি মুস্‌লিম-দেশ সমূহের সহিত ভারতীয় মুসলমানদের বর্তমান যোগাযোগ ও সম্বন্ধের অনুরূপ একটি ব্যাপার। এখন আমরা তুর্কী, আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের মুসলমানদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য আরবী, ফার্‌সী ও তুর্কী ভাষাসমূহ না শিখিয়াও কাজ চালাইতেছি। ভারতীয় মুসলমানদের সহিত তখনকার যোগাযোগ রক্ষা ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য উর্দু না শিখিলেও, বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। আমরা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাবেই ভাবী ভারতীয় মুস্‌লিম-যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদানকে বড় করিয়া দেখিতেছি। এই জাতীয় দুর্বলতাকে পবিত্যাগ করিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, পশ্চিম-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না হইয়া গত্যন্তর নাই। তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমাদিগকে যদি উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশী ভাষার জিঞ্জির পরিধান করিতে হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানেরও পূর্ব-পাকিস্তানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে গিয়া বাংলা শিক্ষা করা উচিত। কেননা আমাদের ন্যায় তাহাদেরও রাষ্ট্রীয় গরজ রহিয়াছে এবং তাহার ফলেই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান মিলিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, আমাদের গরজে আমরা, যদি উর্দু শিখি, তাঁহাদের গরজেও তাঁহারা বাংলা শিক্ষা করিতে বাধ্য। তাহা হইলেই ন্যায় বিচার হইবে,----নতুবা রায় এক্‌তরফা হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রকৃতপক্ষে, ধর্মের নামে যাঁহারা অকারণ উর্দুপ্রীতি পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা একান্তই ভ্রান্ত। আমাদের উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে এ-কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও, নিছক ধর্ম-বিধানের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে, একথা আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আল্লাহ্ তায়ালা কুর্‌আন্-শরীফে বলিতেছেন, কুর্‌আন্‌কে আরবী-ভাষায় অবতীর্ণ করিবার কারণ,----ইহা যেন আরবের সকল লোক বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া তদনুসারে কাজ করিতে পারে। অন্য কথায় আরবের সকল লোকের বোধগম্য যে-ভাষা, সেই ভাষায় কুর্‌আন্ অবতীর্ণ হয়। সত্যই কোন জাতির মধ্যে কোন রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় বা অন্য যে-কোন আদর্শের

প্রচার ও প্রসার করিতে হইলে, সেই জাতির নিজের ভাষায় তাহার প্রচার ও প্রসারের চেষ্টাই স্বাভাবিক ও ঐশ্বরিক নিয়ম। নূতন রাষ্ট্রের আদর্শের প্রচার ও প্রসার করিতে গিয়া উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে চালু করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৫ (পঁচানব্বই) জন লোক তাহা বুঝিবে না। ইহা কি ঐশ্বরিক বিধানের পরিপন্থী নহে?

তাহা হইলে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে? কোন রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, এই প্রশ্ন যে কেন উঠে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। রাষ্ট্রের ভাষা অর্থাৎ রাজ্যের জন-সাধারণের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা। ইহার জন্য আবার মাথা ঘামাইতে হয়, প্রচার ও প্রচারণার আবশ্যক হয়,---ইহাই অস্বাভাবিক। খোদার উপর খোদকারী করিতে হইলে, স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে গেলেই, এই জাতীয় ব্যাপারের আশ্রয় লইতে হয়। এই নীতি (এবং ইহাই ঐশী ও স্বাভাবিক নীতি) অনুসারে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা উর্দু হইতে পারে না। কেননা, এইখানকার একমাত্র ভাষা হইল বাংলা,----উর্দু নয়।

বাংলা-ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করার পক্ষে সকলের চেয়ে বড় আপত্তি দুইটি। ইহার একটি হইল---এইরূপ করিতে গেলে পাকিস্তানের ভাষাগত এবং তৎসূত্রে রাষ্ট্রীয় একতা বিনষ্ট হইবে। আমরা দেখিয়াছি, রাষ্ট্রীয় ও ভাষাগত ব্যাপার এক নহে, এবং ভাষাগত ঐক্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনয়ন করে না। রুশ বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্র হইলেও ইহার অনেক প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষা রাষ্ট্র-ভাষারূপে প্রচলিত। রুশদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য তাঁহারা একটি মাত্র রাষ্ট্র-ভাষা গ্রহণ করেন নাই।[১] পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ক্ষুদ্র সুইট্জার-ল্যাণ্ডেও তিন তিনটি রাষ্ট্র-ভাষা প্রচলিত। সুতরাং, পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা রূপে গ্রহণ করিলে সমগ্র পাকিস্তানের একতা বিনষ্ট হইবে,---এই যুক্তি একান্তই অচল ও মধ্যযুগীয় মানসিকতার পরিচায়ক।

ইহার বিপক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি হইল,---বাংলা সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন, যেমন উর্দু ফারসী-ভাষার প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া মুস্‌লিম-সংস্কৃতির বাহন। উর্দু যে প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মুস্‌লিম-সংস্কৃতির বাহন নয়, তাহা উপরে খুব ভালরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলা সংস্কৃত-প্রভাবে প্রভাবিত এবং তৎসূত্রে হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন হইয়া

গিয়াছে কিনা, তাহাই বিচার্য। পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা সত্তর জনেরও অধিক অধিবাসী মুসলমান। সুতরাং, বাংলা যদি হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন হইয়া থাকে, তবে ধর্মীয় অনুভূতিপ্রধান-কারণে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রচলিত করিতে গিয়া মুসলমানদের আপত্তির কারণ দেখা দিলে, তাহাকে অন্যায় বলা চলে না। সত্যই তাহা অন্যায় নহে।

কিন্তু, এ-ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপার অন্যরূপ। বাংলা সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দের প্রভাবে প্রভাবিত একটি ভাষা, যেমন উর্দু ফারসী ও ফারসীজাত শব্দের প্রভাবে প্রভাবিত আর একটি ভাষা। বাংলা ব্যাকরণের যে-অংশ শুধু শব্দ গঠনের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেই অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশের সহিত বাংলা ও সংস্কৃত-ভাষার ব্যাকরণের কোন বিশেষ সংস্রব নাই। উর্দু ব্যাকরণের বেলায়ও অনুরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। এই জাতীয় প্রভাবের জন্য কোন ভাষাকে কোন বিশিষ্ট জাতির ভাষা বলিয়া উল্লেখ করা নিতান্তই খোশ-খেয়ালের পরিচায়ক; ইহাকে কোন ভাষাবিদের পরিণত চিন্তার বিচার ফল বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। সুতরাং এ জাতীয় বিচার একান্তই ভাষা-ভাষা বিচার এবং তাই বলিয়া সর্বথা অগ্রাহ্য।

পক্ষান্তরে কোন বিশিষ্ট জাতির চিন্তাধারা ও বিশ্বাস পরম্পরায় পরিপুষ্ট যে-ভাষা (তাহা সেই জাতির নিজের ভাষাই হউক বা অপরের ভাষাই হউক), তাহাকেই সেই জাতির প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এই জন্যই কুর্‌আন্‌-হাদিস্‌ ইংরেজী-ভাষায় অনুদিত হইলেও মুস্‌লিম-প্রভাবে প্রভাবিত,---ইংরেজদের প্রভাবে প্রভাবিত নহে; কিংবা, উপনিষৎ আরবী-ভাষায় অনুদিত হইলেও হিন্দু-প্রভাবে প্রভাবিত,---মুস্‌লিম-প্রভাবে প্রভাবিত নহে। এই দিক্‌ হইতে বিচার করিতে গেলে, বাংলা-ভাষাকে হিন্দু-সংস্কৃতির বাহন বলা যেরূপ অন্যায়, উর্দুকেও মুস্‌লিম-সংস্কৃতির বাহন বলিয়া উল্লেখ করা তদ্রূপ অবিচার। হয়ত বাংলা-সাহিত্যের অধিকাংশ সাধক হিন্দু বলিয়া, তুলনামূলক বিচারে ইহাতে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব কিঞ্চিদধিক পরিদৃষ্ট হইবে এবং হয়ত উর্দু সাহিত্যের বেশির ভাগ লেখক মুসলমান বলিয়া তাহাতেও তুলনামূলক বিচারে মুস্‌লিম-প্রভাব কতকটা অধিক পরিমাণে দেখা যাইবে;----কিন্তু তাই বলিয়া বাংলা হিন্দুর এবং উর্দু মুসলমানের ভাষা, এই জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস নিতান্তই আজ-গুবী। বাংলা-সাহিত্যে শক্তিশালী মুস্‌লিম লেখকের আবির্ভাব ঘটিলে,

সাহিত্যের বর্তমান মুস্‌লিম ভাব-দৈন্য অল্পকালের মধ্যেই বিদূরিত হইবে ও হইতে বাধ্য। মুস্‌লিম রাজনীতির ক্ষেত্রে এতদিন কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নার আবির্ভাব না ঘটায়, পাকিস্তান রাষ্ট্র-গঠন যেরূপ সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই, সেইরূপ এতদিন বাংলা-সাহিত্যে শক্তিশালী মুস্‌লিম লেখকের জন্ম হয় নাই বলিয়া বাংলা ইসলামী প্রভাব হইতে কতকাংশে বঞ্চিত রহিয়াছে। রাজনৈতিক মুক্তির সহিত পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের চিন্তার মুক্তি ঘটিয়াছে; অনতিকাল মধ্যে এই মুক্তি আরও প্রবল আকার ধারণ করিবে, রাজনৈতিক বন্ধনের মধ্যে দীর্ঘদিন বাস করিয়াও যদি পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমান হিন্দু না হইয়া যান, এখন স্বাধীনতা লাভের পরে বাংলা-ভাষার সাধনা তাঁহাদিগকে হিন্দু-ভাবাপন্ন করিয়া ফেলিবে,---এমন চিন্তা অবচেতন মনের নিভৃত গুহায় পোষণ করাও কি বাতুলতা নহে? জাতি এখন স্বাধীন। সুতরাং, তাহার স্বাধীন জাতীয়তা ও চিন্তাধারার ছাপ তাহার সাহিত্যের অঙ্গে অঙ্গে ঠিক্‌রিয়া পড়িবে। ইহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

কোন আত্ম-সংবিৎলব্ধ জাতি ধারকরা বস্তু লইয়া গৌরব-বোধ করিতে পারে না। উর্দু পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর পক্ষে একটি সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাষা। বর্তমান স্বাধীনতার প্রভাতে আত্ম-সংবিৎলব্ধ পূর্ব-পাকিস্তানবাসী কিরূপে উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া গৌরববোধ করিবে? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ আজ আত্মচেতনা প্রবুদ্ধ। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসী কর্ণধারগণের সাম্রাজ্যবাদমূলক যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া আজ পশ্চিম-বঙ্গ বাংলা-ভাষাকে, আসাম অহমীয়া-ভাষাকে এবং যুক্ত-প্রদেশ হিন্দী-ভাষাকে তাহাদের স্ব-স্ব প্রদেশের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে। সমগ্র পাকিস্তানে যাহারা আজও একটিমাত্র ভাষাকে অর্থাৎ উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষারূপে চালাইবার পক্ষপাতী, তাহারা এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির কাছ হইতে নূতন শিক্ষা লাভ না করিলে, গোড়াতেই যে মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল করিবেন, হয়ত কিছুদিন পরে আর তাহার সংশোধন করিবার সময় পাইবেন না, কিংবা উপায় থাকিবে না।

পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা-ভাষাকে শিক্ষার বাহন রাখিয়া উর্দুকে রাষ্ট্র-ভাষারূপে চালাইবার কথাও কোন কোন রাজনৈতিক খেলোয়াড়ের মুখ হইতে শুনা যাইতেছে। জাগ্রৎ জাতীয় অনুভূতির তুষ্টি সাধনার্থে এই

জাতীয় প্রচারণার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু ইহার ন্যায় এমন ফাঁকা রাজনৈতিক ভাঁওতা দ্বিতীয়টি আছে কিনা, তাহা আমার জানা নাই। ইহার পশ্চাতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ হইতে দূরে সরাইয়া রাখার একটি বিরাট অদৃশ্য অভিসন্ধি লুক্কায়িত। বলিতে কি, রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞানের ব্যাপকত্ব ও গভীরতার দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্রই রাষ্ট্রীয়, এমন কি, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের যোগ্যতা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে-ভাষার বাহনে জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ হইবে, তাহাতে জ্ঞানের ব্যাপকত্ব ও গভীরতা যতটুকু আশা করা যায়, অন্য একটি ভাষায় তাহা হওয়া কি কখনও সম্ভবপর? সুতরাং উর্দু না জানার অজুহাতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে হইবে। ফলে, উর্দুওয়ালারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মধ্য দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানকে লুঠিয়া লইবার ব্যাপক আয়োজন করিবেন। এই জাতীয় প্রচারণার ন্যায় রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা আর একটিও নাই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই জাতীয় প্রচারণায় ভুলিতে পারে না।

মোটের উপর, বাংলাকে ছাড়িয়া উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে পূর্ব-পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করিলে, তাহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে বাংলার মুসলমান ইংরেজী ভাষাকে গ্রহণ না করিয়া যে-জাতীয় আত্মঘাতী ভুল করিয়াছিলেন, পূর্ব-পাকিস্তানবাসী এইবার উর্দুকে গ্রহণ করিলে অবিকল ঐ জাতীয় আর একটি রাজনৈতিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন। এখনও এই ভুল করা হয় নাই, এখনও সাবধান হইবার সময় আছে। যাহাতে এই জাতীয় আত্মঘাতী এবং জাতিঘাতী ভুল অদূর ভবিষ্যতে না হইতে পারে, এখন হইতে সেই বিষয়ে সকলের সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।*

*রচনাকাল----নভেম্বর ১৯৪৭ ইং

প্রকাশ: কৃষ্টি, কার্তিক, ১৩৫৪ (নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশিত এবং ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিতরিত)। ইহার সূত্র ধরিয়াই ঢাকায় 'ভাষা-আন্দোলন' দানা বাঁধে।

“আরবী হরফে বাংলা” সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাস্য

বিগত ২৫শে (পঁচিশে) চৈত্রের মফস্বল সংস্করণের ‘আজাদে’ জনাব অধ্যক্ষ শৈখ শরফু-দ-দীন্ সাহেব “আরবী হরফে বাংলা” নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তা’তে ইতিহাসের নামে, সংস্কৃতির নামে, জাতীয় সংহতির নামে, বিশেষ ক’রে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে এমন কতকগুলি উক্তির অবতারণা করা হ’য়েছে, যার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না উঠ্‌লে, উক্তিগুলি অভ্রান্ত ও সত্য ব’লে জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হ’বার আশঙ্কা র’য়েছে। এই আশঙ্কার কিঞ্চিৎ নিরসন ক’র্‌তে গিয়েই, নীচের কথা কয়টির অবতারণা।

অধ্যক্ষ মহোদয় এর আগে ২-৫-৪৮ তারিখে “নতুন লিপিতে বাংলা” নাম দিয়ে এই ‘আজাদে’ই বাংলার জন্য আরবী হরফের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর এক দফা আলোচনা করেছিলেন। সে-আলোচনা সম্বন্ধে আমরা ব্যক্তিগতভাবে অবগত ছিলাম। তবু, সে-কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করার বিশেষ কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করিনি। কারণ, তখন মনে করে-ছিলাম, এ-সব নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার চেয়ে না করাই ভালো।

এখন দেখ্‌ছি আর চুপ ক’রে থাকা যাচ্ছে না। মত বিরোধ ঘটলেই তা’কে যা’রা পথ-বিরোধ ব’লে ধ’রে নিয়ে বেফাঁস কথা বলতে শুরু করেন, তাঁদেরকে নিয়ে আর কি করা যায়? অধ্যক্ষ মহোদয়ের মতো যাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের গায়ে ‘কমিউনিজম’, ‘ধর্মদ্রোহিতা’, ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’ প্রভৃতির ন্যায় সস্তায় কিস্তিমাৎ-করা বুলির লেবেল বা ছাপ এঁটে দি’য়ে, রাষ্ট্রশক্তিকে ওঁদের পেছনে লেলিয়ে দেবার চেষ্টায় মশগুল, তাঁদেরকে তাঁরই নিজের কথায় ‘বে-সামাল’-এর পর্যায়ভুক্ত করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। জ্ঞানের উচ্চ মঞ্চ থেকে তিনি স্বয়ং যদি রাগে গরগর কর্‌তে কর্‌তে অজ্ঞতার ‘তাহাতচ্ছরা’য় নেমে পড়েন, তখন কে আর কি করে,—সব ভাই যে নাচার।

যাক ; এখন মূল বিষয় সম্বন্ধেই বলি। অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখেছেন,—"কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বোর্ডের এই প্রস্তাবে (অর্থাৎ আরবী হরফে বাংলা, তথা পাকিস্তানের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা লেখার প্রস্তাবে) পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা আনন্দের সঙ্গে মোবারকবাদ জানাচ্ছে"—"পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা" বল্‌তে তিনি কি শুধু নিজেকে এবং তাঁহার দলীয় গোটা কয়েক লোককেই বোঝাতে চেয়েছেন? এই যে পূর্ব-বাংলার পরিষদ-ভবন থেকে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিলেন যে, বাংলা-ভাষার জন্য আরবী হরফ ব্যবহারে এখানকার লোক দ্বিমত। যাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তিনি তাঁদেরকে কি বেমালুম হজম ক'রে ফেল্লেন? তাঁরাও সকলে মিলে 'মোবারকবাদ জানাচ্ছে',—এ-খবর তাঁকে কে দিল?

এরপর, তিনি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে যে-উক্তি করেছেন, তা' আরও বেয়াড়া। তিনি লিখেছেন,—"খ্যাতনামা কবি আলাওল তাঁর সংস্কৃতবহুল কবিতা ও কাব্য আরবী-হরফেই লিখেছিলেন।" এখন এ উক্তিটিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা যা'ক। নীচের বিষয় কয়টা থেকেই উদ্ধৃত উক্তিটি করার সম্ভাবনা আছে, তাই একে একে তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমতঃ, যদি বক্তার কাছে আলাওলের হাতের আরবী-হরফে লেখা কোন বাংলা কবিতা ও কাব্য থাকে, তবে তিনি তার উপর নির্ভর ক'রে অমন উক্তি কর্‌তে পারেন। এ-অবস্থায় পাঠককে বিশ্বাস দেওয়াতে গেলে সন, তারিখ ও প্রমাণসহ তার অবিকল 'ফোটোগ্রাফিক' প্রতিলিপির আবশ্যক। আমরা অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে এই অবস্থার জন্য ঐভাবেই উক্ত উক্তিটির সমর্থন চাই।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তা যদি কোথাও আলাওলের হাতের লেখা আরবী কবিতা ও কাব্য দেখে থাকেন, তবে তাঁর সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে তিনি অমন উক্তি কর্‌তে পারেন। এই অবস্থায় পাঠকের বিশ্বাসের জন্য উক্তির সমর্থনে স্থান, কাল ও পাত্র,—এই তিন বিষয়ের সঠিক বিবরণ জানা দরকার, যেন আবশ্যক মত সর-জমিনে তদারক করা চলে। এই অবস্থার জন্য তাঁর কাছ থেকে আমরা এ-শ্রেণীর প্রমাণ চাই।

তৃতীয়তঃ, বক্তার ঐ উক্তির পশ্চাতে যদি কোন পুস্তক বা ব্যক্তির সমর্থন থাকে, তবে তিনি অমন কথা ব'লতে পারেন। এই অবস্থায় সে পুস্তক ও ব্যক্তির বিশদ বিবরণ আবশ্যক, যেন দরকার মতো প্রামাণ্য কি না পরখ ও পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়। অধ্যক্ষ মহোদয় যদি এ-জাতীয় সমর্থন নিয়ে ঐ উক্তি ক'রে থাকেন, আমরা তার কাছ থেকে এ-ধরনের প্রমাণই চাইব।

চতুর্থতঃ, বক্তা জনশ্রুতির সমর্থনেও অমন উক্তি করতে পারেন। সে-অবস্থায় বক্তা তাঁর উক্তির ভিত্তিকে জনশ্রুতি ব'লে স্বীকার ক'রলেই সমস্ত লেঠা চুকে যায়; কেননা জনশ্রুতিতে কদাচিৎ জ্ঞানিলোকেরা বিশ্বাস ক'রে থাকেন। অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর ঐ-উক্তির ভিত্তি জনশ্রুতি ব'লে স্বীকার করবেন কি? এতে যে-সৎসাহসের দরকার, তা হয়ত তাঁর কাছে আছে।

পঞ্চমতঃ, বক্তার ঐ-উক্তি 'আপ্তবাক্য'ও হ'তে পারে। তবে তো কথাই নেই; আপ্তবাক্যের আর প্রমাণ কি? মহাপুরুষ এবং মিথ্যাপ্রচারক, অর্থাৎ কিনা ভণ্ড-ব্যক্তি---এই দুই শ্রেণীর মানুষের কাছেই 'আপ্তবাক্যে'র ভাণ্ডার। সে-ক্ষেত্রেও আপ্তবাক্য কোন্ শ্রেণীর, তা' পাঠক নিজেই বুঝে নেবেন,---ওতে আর কারও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হ'বে না।

উপরে যে-সমস্ত বিষয় চাওয়া হ'ল, বক্তা সে-চাহিদা না মেটাতে পার্‌লে বুঝ্‌তে হ'বে, তাঁর উক্তি ডাহা মিথ্যা,- -বিশেষ ক'রে তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু ন'ন। তার পক্ষে মতলববাজ প্রচারক হওয়াও বিচিত্র নয়। জনাব অধ্যক্ষ সাহেবকে আমরা আর যা' কিছু বলেই জানি, অন্ততঃ প্রচারক ব'লে এদ্দিন মনে করিনি। কয়েক বছর আগেও তাঁর গবেষণার খ্যাতি কিছু কিছু ছিল। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে সত্যানুসন্ধিৎসাই সকলে আশা করে। তিনি আমাদের সে-আশা পূর্ণ করবেন কি?

আমাদের কথাটাও এখানে প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি। বিগত বিশ বছর থেকে আলাওলের পুঁথি পত্রাদি নিয়ে কিছু কিছু নাড়াচাড়া করেছি। তার ফল পূর্ব-পাকিস্তানবাসী "আরাকান রাজসভায় বাংলা-সাহিত্য" নামক পুস্তকের মারফৎ কিছুটা পেয়েছেন। আলাওলের রচিত.---হাতে লিখিত নহে,---প্রায় দেড় শতাধিক বাংলা-পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন জায়গায় দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছে। কিন্তু, আজ অবধি তাঁর পুরো নামটিও

আবিষ্কার কর্‌তে পারিনি। তাঁর নিজের লেখা দূরে থাকুক, অপরের দ্বারা নকল করা পুঁথির পাণ্ডুলিপির একটিও পৌণে দুই শতাধিক বছরের আগের নয়। যাঁরা ঢাকায় বসে মাননীয় মন্ত্রী বাহার সাহেবের বদৌলতে আরবী হরফে লেখা আরবী "পদ্মাবতী"-এর একখণ্ড পাণ্ডুলিপি দে'খে মনে করেছেন যে তা আলাওলেরই হাতের লেখা, তাঁরা পাণ্ডিত্যের "আলম্‌-ই-বর্‌যখ্‌" না, "আলম্‌-ই-মলকূৎ"-এর অবস্থায় আছেন,---তা'জানি না। তবে, তাও আমাদের দেখা পুঁথির একটি; এর বয়স হচ্ছে দেড় শ' বছরের অনেক নীচে; অথচ আলাওল "পদ্মাবতী" লিখেছিলেন অর্থাৎ রচনা করে-ছিলেন ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে।

এমন অবস্থায় মান্যবর অধ্যক্ষ মহোদয়ের উক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হওয়ার কথা। আমরা যদি সে-সন্দেহ পোষণ করি, বিশেষ অন্যায় ক'রেছি ব'লে এখনতক মনে হয় না। আমাদের ভুল বা সন্দেহ ভাঙ্গার দায়িত্ব তাঁরই হাতে। আশা করা যাচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে একটা সঠিক উত্তর এবার মিলবে।

এখানেই তাঁর বেয়াড়া উক্তির সমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর প্রবন্ধের চতুর্থ অনুচ্ছেদে দেখা যায়,---"উর্‌দূ এবং অন্যান্য বহু আর্য ভাষাতেই আরবী লিপির উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে।" তা' হ'লে কি উর্‌দূ আর্য-ভাষা হ'য়ে গেল? "নাউযু-বি-'ল্লাহ্‌"! এ আবার কি শুন্‌লাম!! উর্‌দূ কি তবে এরি মধ্যে 'ইসলামী-ভাষার' উপাখ্যান ছেড়ে 'আর্য-ভাষায়' দীক্ষা নিলে? এই কিছু দিন আগেও তো কতকগুলি লোক উর্‌দূকে বাংলার মত আর্য-ভাষা মনে ক'রে বাংলাকে উর্‌দূর সমান আসন দিতে চেষ্টা করায় "ফিফ্‌থ্‌-কলামিস্ট্‌" বা গৃহ-শত্রু বলে গণ্য হ'য়েছে।

যা'ক সে কথা। উরদূ-সমেত অন্যান্য আর্য-ভাষায় আরবী হর্‌ফের উপযোগিতা প্রমাণ কর্‌তে গিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় লিখ্‌ছেন, "ইরানীরা পারশ্য ভাষায় নিজস্ব কিউনিফর্ম্‌ লিপি ত্যাগ কোরে আরবী লিপি গ্রহণে প্রচুর লাভবান হোয়েছেন।" ইরানীরা নিজেদের অক্ষর ইচ্ছা ক'রে ছে'ড়ে দিয়ে আরবী হরফ নিয়েছিল, না, আরবী-বিজয়ীরা ইরানীদের ঘাড়ে আরবী হরফ চাপিয়ে দিয়েছিলেন? এতে ইরানীরা লাভবান হয়েছে, না, ক্ষতি স্বীকার করেছে? আরব বিজয়ের পর, তিন শত বছর পর্যন্ত ইরানে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি হয়নি কেন? এ-সব জটিল প্রশ্ন

না তু'লেও বলা যেতে পারে, ভাষা গুলানো, অক্ষর পাল্‌টানো, সংস্কৃতি ছড়ানো প্রভৃতি ব্যাপার যে-উপায়ে মধ্যযুগে আংশিক অথবা পূর্ণভাবে সার্থক ক'রে তোলা সম্ভবপর হয়েছে, সে-উপায়ে এখন সম্ভবপর কি না তা' বিস্তৃত আলোচনাসহ জানতে চাই। মধ্যযুগীয় রীতি যদি এখনতক চল্‌তো, তা' হ'লে হিন্দুস্থানের সাথে পাকিস্তানের দোস্তির কথা আজ এত বড় হ'য়ে দেখা দিত কি? অন্তঃ-ডোমিনিয়ন আলাপ-আলোচনারই বা প্রয়োজন হ'ত কোথায়?

ইরান,—সে অনেক দূরদেশের কথা। সে দেশের লোককে বোঝাতে গেলে বিশেষ বেগও পে'তে হয়। তাই অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্চম অনুচ্ছেদে ঘরমুখো হ'য়ে লিখেছেন,—"বাংলা-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাথমিক যুগে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বাঙ্গালী মুসলমান কবিরাও আরবী হরফে কবিতা রচনা ও কাব্য-চর্চা কোরেছেন।" তাঁর এ-উক্তি তাঁর আর সব উক্তিকে মাৎ ক'রে দিয়েছে। সত্যই এর কোন তুলনা নেই,—একেবারে 'বে-মিছিল'। বোধহয়, অল্প-বিস্তর সকলেই জানেন যে, "বাংলা-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাথমিক যুগ" হচ্ছে চর্যাপদের যুগ—খ্রীস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলের কোন্ মুসলিম কবি আরবী হরফে বাংলা লিখেছিলেন, তা' নিশ্চয় অসাধারণ গবেষণার বিষয়। জনাব শৈখ শরফু-দ-দীন্ সাহেব এক সময়ে গবেষক ছিলেন। বোধহয়, এই অভূত-পূর্ব আবিষ্কারটি তাঁহার তখনকার গবেষণারই ফল। আমরা তাঁর এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অবহিত হ'তে চাই। মনে হয়, এ-সম্বন্ধে জাতিরও জান্‌বার অধিকার আছে।

অতঃপর, খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আসা যা'ক। তখন কোন্ মুসলান বাঙ্গালী কবি বাংলা-অক্ষরে বা আরবী-হরফে কোন্ কাব্য বা কবিতা লিখেছিলেন, সে-খবর জানারও প্রয়োজন রয়েছে। তখন কিন্তু "বাংলা-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাথমিক যুগ" নয়,—এ হচ্ছে সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম দিক। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এসেও কোন মুসলিম কবি আরবী-হরফে বাংলা লিখেছেন কি না, বিনা প্রমাণে তা' কে মেনে নেবে? আমরা কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন নজির পাইনি।

মোটের উপর, "বাংলা-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রাথমিক যুগ" বল্‌তে অধ্যক্ষ মহোদয় কি বুঝেছেন এবং আর পাঁচ জনকেও কি বুঝিয়ে বোকা বানাতে

চেয়েছেন, তা' তাঁর কাছ থেকেই সন-তারিখ সহ স্পষ্ট উক্তির সাহায্যে জানতে চাই। নতুবা এমনতরো ধোঁকাবাজ উক্তিতে জনসাধারণকে দেওয়া হ'বে একটা বড় রকমের ধাপ্পা।

পরিশেষে, আমি এ-কথাও নিঃসঙ্কোচে বলে রাখ্‌ছি, শীগ্‌গিরই পূর্ব-পাকিস্তানে 'উরদূ-অক্ষর' ওরফে 'আরবী-হরফে' বাংলা লেখার একটা জোর চেষ্টা চল্‌বে। তার জন্য এরি মধ্যে প্রচারণা চল্‌ছে মন্দ নয়। ফল যে কি দাঁড়াবে ব'লে কাজ নেই। তবে, প্রচারণাটাকে নেহাৎ 'ফাও' বলেই মনে হচ্ছে। যাঁদের কাছে যুক্তি হচ্ছে ন্যায়ের ফাঁকি, তর্ক হচ্ছে প্রলাপ, জ্ঞান হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, আর বিজ্ঞান হচ্ছে বাস্তবতাবর্জিত মায়ার খেলা, তাঁদের সাথে বাধ ঘটাবে কে? তথাপি প্রচারণা চালাতে হয়, চালাও; তবে মিথ্যার বেসাতি দিয়ে কেন? ---এই-ই জিজ্ঞাস্য।*

*** মন্তব্যঃ**

অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই এই প্রতিবাদটি "দৈনিক আজাদ" কাগজে (কাগজটি তখনও সগৌরবে নামের নীচে ছাপ্‌ত 'বঙ্গ ও আসামের একমাত্র মুস্‌লিম্‌ দৈনিক') মুদ্রণের জন্য ১৫-৪-১৯৪৯ তারিখে প্রেরিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেড় মাসের মধ্যেও প্রকাশিত না হওয়ায়, ইতিমধ্যে আমি রাজশাহী থেকে যখন ঢাকা যাই. তখন সম্পাদকের কাছে প্রতিবাদটির মুদ্রণ সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ করি। তিনি আমার কাছে এর প্রাপ্তি স্বীকার করেন ও 'আজাদে' প্রকাশ করবেন ব'লে আশ্বাস দেন। তিনি এ-আশ্বাস রক্ষা করেন নি; প্রতিবাদটিও ফেরত দেন নি। আমার হাতে প্রতিবাদটির যে-প্রতিলিপি ছিল, তার থেকে এটি মুদ্রিত হ'ল।

মুহম্মদ এনামুল হক

২-৮-১৯৭৬

আধুনিক বাংলা-বানানের মূলনীতি

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ আধুনিক বাংলা বানান-পদ্ধতি কোন ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভাবিত বানান-সংস্কারের ফল নহে। ইহা প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগের একটি ভাষাবিদ্-গোষ্ঠীর সমবেত প্রচেষ্টা মাত্র। এই সংস্কারের প্রকৃত ভিত্তি ভাষাতাত্ত্বিক, মূল প্রকৃতি প্রগতিশীল, যাবতীয় প্রচেষ্টা সামগ্রিক ও বর্তমান-ফল সর্বস্বীকৃত। বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ-সম্ভারের বানানে তখন যে অরাজকতা চলিতেছিল, তাহার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষাবিদ-গোষ্ঠীকে সচেষ্ট হইতে হয়। ফলে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজশেখর বসুর পরিচালনায় প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া বাংলা-ভাষার বানান সংস্কার চলিতে থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সভা-সমিতিতে নানা আলোচনার পর, ভাষাবিদ্-গোষ্ঠী সংস্কারকে যেভাবে স্বীকার করিয়া লইলেন, তাহারই পূর্ণ রূপ এখন প্রচলিত। বাংলা-ভাষার এই বানান সংস্কারের ফল সুদূরপ্রসারী হইল,---ভাষার পঠন, পাঠন, শিক্ষা, লিখন ও মুদ্রণ সহজতর হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রে এতদিন যে নৈরাজ্য চলিতেছিল, তাহার অবসানের সূত্রপাত হইল।

বলা বাহুল্য, আধুনিক বাংলা-বানান আয়ত্ত করা নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ হইলেও, যাঁহারা প্রাচীন বানানে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে খুব সহজ নহে। কারণ, দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন ও প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এতৎসত্ত্বেও, বর্তমানে বাংলা-ভাষার লেখায় নূতন বানান-পদ্ধতি নিঃসঙ্কোচে গৃহীত হওয়ায়, এই বানান-পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে এখন আর কোথা হইতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

নূতন বাংলা-বানানে জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবার জন্যই, সুপণ্ডিত ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাজশেখর বসু তাঁহার "চলন্তিকা" নামক অভিধানটি এই বানানে মুদ্রিত করেন। ইহার বহুল প্রচারে উৎসাহিত হইয়া, সম্প্রতি শ্রী শৈলেন্দ্র বিশ্বাস "সংসদ বাঙ্গালা অভিধান" নামে আর একখানি অভিধান নূতন বানানে সংকলন করেন। ইহাকে

"চলন্তিকার" উন্নততর সংস্করণ বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহা বাংলা শিক্ষিত সমাজে এমন সমাদর লাভ করে যে, ১৯৬১ সালে ইহার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ইহাকেই মোটামুটি নির্ভরযোগ্য নূতন বানান-সমন্বিত বাংলা অভিধান বলা চলে।

বিশিষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ বাংলা-ভাষার শব্দ-সম্পৎ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করিতে না পারিলে, নূতন বানান-সংস্কারের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করা যায় না। কেননা, এই সংস্কার মূলতঃ শব্দ-ভিত্তিক। অতএব, নূতন বাংলা-বানান আয়ত্ত করিতে হইলে, সর্বাগ্রে বাংলা শব্দ-সম্ভার সম্বন্ধে অবহিত হইতে হয়। নতুবা অধিকাংশ শব্দের বানানের জন্য 'চলন্তিকা' বা 'সংসদ' অভিধান না দেখিয়া উপায় নাই। শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনীর পক্ষে ইহা সম্ভবপর নহে। তাই নিম্নে এই বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচিত হইলঃ----

বাংলা ভাষায় চারি শ্রেণীর শব্দ আছে, যথা--'তৎসম' বা সংস্কৃত, অর্ধ-তৎসম' বা আধা-সংস্কৃত, 'তদভব' বা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, 'বিদেশী' বা অন্য দেশ হইতে আগত এবং 'দেশী' বা খাঁটি বাংলা। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল ইসলাম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ লেখকের সাধারণ রচনায় ব্যবহৃত একশত শব্দের মধ্যে ন্যূনাধিক ২৫-টি শব্দ 'তৎসম', ৫-টি শব্দ 'অর্ধ-তৎসম', ৬০-টি শব্দ 'তদ্ভব', ৮-টি শব্দ 'বিদেশী' ও ২-টি শব্দ 'দেশী' দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দের উক্ত সংখ্যাগুলি একটি মোটামুটি হিসাব মাত্র। ভাষার 'ওজঃ'-গুণ, বিষয়-বস্তুর প্রকার ভেদ এবং লেখকের সংস্কার ও সংস্কৃতির তারতম্য অনুসারে ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ--সংখ্যার ন্যূনাধিক্য ঘটিতে পারে। এতৎসত্ত্বেও, বর্তমান পাক-ভারতের বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ-সম্ভারে 'তদ্ভব' শব্দের সংখ্যাই সর্বাধিক। সম্প্রতি পাকিস্তানী বাংলায় বিদেশী অর্থাৎ ফারসী-আরবী শব্দ ব্যবহারের একটা সাধারণ প্রবণতা দেখা দিলেও, এই প্রবণতা এখনও ভাষার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করিয়া 'তদ্ভব' শব্দের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এমন কি, পূর্ব-পাকিস্তানী বাংলার মূল-প্রবণতা যতখানি বিদেশী শব্দের দিকে নহে, ততোধিক 'তদ্ভব' শব্দের দিকেই দেখা যাইতেছে। ইহা ভাষার প্রগতিশীলতার পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

উপরে 'তদ্ভব' শব্দের সংক্ষেপে পরিচয় দিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন, সেগুলিকেই 'তদ্ভব' শব্দ বলা হয়। ইহার দ্বারা এই জাতীয় কোন ধারণা পোষণ করা অন্যায় হইবে যে, বাংলা-ভাষা,---নতুবা ইহার শব্দ-সম্ভারের শতকরা ৬০-টি 'তদ্ভব' নামে চিহ্নিত শব্দ, সংস্কৃত ভাষা হইতে জাত। জানিয়া রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, বাংলা সংস্কৃত-ভাষা নহে; এমন কি, ইহার 'তদ্ভব' নামে চিহ্নিত শব্দগুলিও সংস্কৃত-ভাষা হইতে বিবর্তিত হয় নাই। তবে, উক্ত উক্তির সার্থকতা বা তাৎপর্য কি?

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা-ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার একটি বিবর্তিত রূপ। এই ভাষার রূপ স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন ছিল। খ্রীস্টপূর্ব চারি শত বৎসরের কাছাকাছি সময়ে বর্তমান পশ্চিম-পাকিস্তানের অন্তর্গত তক্ষশিলা নামক স্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে মহাপণ্ডিত পাণিনির আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায় তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন আঞ্চলিক আর্য-ভাষা সংগৃহীত ও সংশোধিত হইয়া তাঁহার 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণে একটি স্থায়িরূপ লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের এই সংশোধিত ভারতীয় আর্য-ভাষার নাম 'সংস্কৃত-ভাষা'। ইহা কোন শ্রেণীর ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা অর্থাৎ 'কথ্য-ভাষা' বা 'চলিত-ভাষা' ছিল না, বরং ইহা তাহাদের 'চলিত-ভাষার পরিমার্জিত রূপ বা 'সাধু-ভাষা' রূপে লেখার অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা ছিল। বর্তমানে বাংলা 'সাধু-ভাষা'র সহিত বাঙালীর যে-সম্বন্ধ, খ্রীস্টপূর্ব চারি শত অব্দে, ভারতীয় আর্যজাতির সহিত 'সংস্কৃত-ভাষা'র সম্বন্ধ অবিকল ঐরূপই ছিল। এখন নানা আঞ্চলিক কথ্য বাংলা-ভাষার প্রতিনিধিমূলক কোন সর্বাঞ্চলবোধ্য সাহিত্যিক ভাষা যদি থাকে, তবে বাংলা 'সাধু-ভাষা'ই যে সে-ভাষা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই প্রাচীন যুগে 'সংস্কৃত-ভাষা'ও আর্য-জাতির কথ্য-ভাষার সর্বাঞ্চলবোধ্য একটি প্রতিনিধিমূলক, সাহিত্যিক ভাষা।

বলাবাহুল্য, যাহার বা যাহাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তাহার বা তাহাদের সবটুকুর অনুকল্প কোন প্রতিনিধিই নহে। প্রাচীন আর্য-ভাষার প্রতিনিধি হইলেও, সংস্কৃত-ভাষা যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা-ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার বিবর্তিত রূপ বলিয়া, এই বিবর্তনের ইতিহাস উদ্ঘাটনের

জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি 'সংস্কৃত-ভাষা' আমাদের বিশেষ সহায়ক। ফলে, 'তৎসম' বা তাহার সমান অর্থে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার সমান,—এই কথা না বলিয়া সংক্ষেপে' সংস্কৃতের সমান' বা শুধু 'সংস্কৃত' এই কথা বলিলেই মোটামুটি-ভাবে কাজ চলিয়া যায়। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, 'তৎসম'-শব্দের দ্বারা অবিকৃত "সংস্কৃত"-শব্দই বুঝানো হয়। অতএব, বাংলা-ভাষার শব্দ-সম্পৎ হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার শব্দকে বাছিয়া বাহির করিয়া 'তৎসম-শব্দ' নামে চিহ্নিত করার ফলে, 'তৎসম' ও 'সংস্কৃত' শব্দ দুইটি সমার্থক হইয়া পড়িয়াছে। তাই, বাংলা-ব্যাকরণে 'তৎসম' এমন একটি সজ্ঞাবাচক শব্দ, যাহা অবিকৃত-সংস্কৃত-শব্দকেই বুঝায়।

বাংলা-ভাষার শব্দ-সম্পদে বিকৃত সংস্কৃত শব্দও আছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, 'বিকৃত' ও 'বিবর্তিত' এক কথা নহে,—সমার্থক কথা বা শব্দও নহে। সংস্কৃত হইতে বিবর্তিত হইয়া কোন শব্দ বাংলা, উড়িয়া, হিন্দী, মৈথিলী, উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, পশ্‌তু প্রভৃতি কোন আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষায় আসে নাই। আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক আর্য-ভাষারই বিবর্তিত রূপ,—এই ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইলেও, সংস্কৃতের বিবর্তিত রূপ নহে। কারণ, পণ্ডিতপ্রবর পাণিনি যখন খ্রীষ্টপূর্ব চারিশত অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক আর্য-ভাষাকে সংস্কৃত-ভাষার আদলে ঢালিয়া পুনর্গঠিত করিলেন, তখন সংস্কৃত মুখের ভাষা হইতে পুঁথির ভাষায় পরিণত হইয়া বিবর্তন-শক্তি হারাইয়া ফেলিল এবং কালক্রমে প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক আর্য-ভাষার অশ্মীভূত (fossilised) রূপে পরিণত হইল। অতঃপর, যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ মধ্যভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষায় কৃতঋণ (borrowed) শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহার কিছু সংখ্যক শব্দ ধ্বনিতে এবং কিছু সংখ্যক শব্দ অভিধায় সংস্কৃত হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ লাভ করে। এই 'ভিন্নতা'-টুকুকেই 'বিকৃত' নামে চিহ্নিত করা হইতেছে। এই বিকৃতির একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, এই 'বিকৃতি' লোকের মুখে স্থায়িরূপ লাভ করিয়াছে,—কালক্রমে আরও বিকৃত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করে নাই। সংস্কৃত হইতে এই কৃতঋণ শব্দগুলি ভাষায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই গৃহীত হইয়াছে। অতএব, যে-সমস্ত সংস্কৃত-শব্দ কিঞ্চিৎ ধ্বনিগত অথবা অর্থগত কিংবা ধ্বনি ও অর্থ

এতদুভয়গত বিকৃতি বা পরিবর্তন লইয়া বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা-দিগকেই ব্যাকরণের পরিভষায় অর্ধ-তৎসম' শব্দ নামে চিহ্নিত করা হয়। অর্ধ-তৎসম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) ধ্বনিগত বিকৃতির অর্ধ-তৎসম শব্দ :---

সংস্কৃত শব্দ	অর্ধ-তৎসম রূপ
বিষ্ণুপুর	বিষ্টুপুর (বিষ্টুপুরী তামাক)
কৃষ্ণ	কেষ্ট, কেষ্টা
বৃক্ষ	বিরিক্ষি
প্রথম	পেরথম
মিত্র	মিত্তির
ত্রিরাত্র	তেরাত্তির
ব্যবসায়	ব্যবসা

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি

(খ) অর্থগত বিকৃতির অর্ধ-তৎসম শব্দ :----

সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত অর্থ	বাংলা অর্থ
সাধ্য	সাধনীয়, সাধনযোগ্য	ক্ষমতা
ভয়ানক	ভয় উৎপাদনকারী	অত্যধিক
ইতর	অপর	নিম্নশ্রেণীর, নীচজাতের
রাগ	প্রেম, রং, রঞ্জক দ্রব্য	ক্রোধ, রোষ
সন্দেশ	সংবাদ	এই নামের মিঠাই
বন্দী	স্তাবক, স্তুতিকারী	কারারুদ্ধ
কবিরাজ	কবিশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠকবি	আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য
সঙ্গতি	সামঞ্জস্য	স্বচ্ছলতা, ধন
কুটুম্ব	জ্ঞাতি, পরিবার	বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তি
নির্ঘাত	প্রচণ্ড, ভীষণ	অব্যর্থ, মোক্ষম

(গ) ধ্বনি ও অর্থ উভয়বিধ বিকৃতির অর্ধ-তৎসম শব্দ :—

সংস্কৃত শব্দ	সংস্কৃত অর্থ	অর্ধ-তৎসম রূপ	বাংলা অর্থ
আপ্ত	নিজ, আপন	আপ্ত (বাক্য)	অভ্রান্ত
ঘোষ	গম্ভীর শব্দ	ঘোষা	দোহাবের আবৃত্তি
মিষ্ট	মধুর, স্বাদযুক্ত	মিষ্টি	মিঠাই
চক্র	চাকা	চক্কর	পাক, ঘূর্ণন

এইবার 'তদ্ভব'-শব্দের কথা বলা যাইতে পারে। বাংলা-ভাষায় এই জাতীয় শব্দই সংখ্যায় সর্বাধিক---শতকরা প্রায় ষাট। প্রাচীন লৌকিক আর্য-ভাষাকে সংশোধিত বা পরিশোধিত করিয়া যে 'সংস্কৃত-ভাষার' উদ্ভব হইল, তাহা আর বিবর্তিত হয় নাই। প্রাচীন লৌকিক আর্য-ভাষার ধারাই লোকের মুখে মুখে পরিবর্তিত, তথা বিবর্তিত, হইতে হইতে প্রথমে 'প্রাকৃত-ভাষার', তৎপর 'অপভ্রংশ-ভাষার,' অতঃপর আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বাংলা আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ বলিয়া যে-সমস্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষার শব্দ 'প্রাকৃত' ও 'অপভ্রংশ' ভাষার ধারা বাহিয়া বাংলা-ভাষায় আসিয়া বর্তমান রূপ গ্রহণ করিয়াছে, সে-সমস্ত শব্দকেই 'তদ্ভব'-শব্দ বা তাহা হইতে অর্থাৎ প্রাচীন আর্য-ভাষা হইতে উদ্ভূত শব্দ বলা হয়। উদাহরণ :—

হস্ত > হত্থ > হাথ > হাত ; পাদ > পাঅ > পা

গ্রাম > গাব > গাঁও > গা ; মস্তক > মত্থঅ > মাথঅ > মাথা

নস্ক=(নাসিকা) > নক্ক > নাক ; মুখ > মুহ > মুঅ > মু

চক্ষুঃ > চক্‌খু > চাখু > চাউখ > চোখ।

লষ্টি=(যষ্টি) > লট্টি > লাঠি

এখন দেখা যাইবে, 'তদ্ভব'-শব্দের দ্বারা 'সংস্কৃত' হইতে উৎপন্ন বা জাত শব্দ বুঝায় বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক আর্য-ভাষা হইতে উৎপন্ন বা জাত অর্থাৎ বিবর্তিত শব্দই বুঝায়। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়াই এই 'তদ্ভব'-

শব্দগুলি এখন বাংলা-ভাষায় ইহাদের বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। ফলে, ইহাদের বানানে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এই বানান-বিভ্রাট দূর করিয়া একটা শৃঙখলা স্থাপন বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হওয়ায়, বানান-সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভূত হয়।

বাংলা-ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যেগুলিকে বাধ্য হইয়া অজ্ঞাতমূল বলিয়া স্বীকার না করিয়া কোন উপায় নাই। এই শব্দগুলি কোন্ ভাষা হইতে বাংলা-ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ এই মত পোষণ করেন যে, শব্দগুলি কোল, মুণ্ডা, সাঁওতালী প্রভৃতি দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা হইতে প্রাপ্ত শব্দ। যেহেতু, দ্রাবিড-গোষ্ঠীভুক্ত অনার্য-জাতি বাংলাদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে বাস করিত এবং বাঙালীর রক্তে তাহাদের রক্ত মিশিয়া গিয়াছে অথবা আজও তাহারা বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী, সেহেতু তাহাদের ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলা-ভাষায় স্থান পাওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নহে। বাংলা-ভাষায় এই জাতীয় শব্দের পরিমাণ শতকরা দুইয়েব বেশী নহে। অতএব, যে-সমস্ত শব্দ বাংলা-ভাষায় অজ্ঞাতমূল বলিয়া অনার্য শব্দরূপে অনুমিত, সে-সমস্তকেই 'দেশী' শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। উদাহরণ---ফর্সা, পেট, দর্মা, বর্গা, পেটোয়া, ঝাঁপি, ঝাঁটা, গলদা, চাঙ্গারি, কয়াল, গচ্ছা, বাতা, দামড়া, ঠাটা, ঠোঙ্গা, খড়ম ইত্যাদি।

সংস্কৃতি, প্রশাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এক জাতিব সহিত অন্য জাতির সংস্রব ঘটিলেও সংশ্লিষ্ট জাতিদ্বয়ের মধ্যে ভাষাগত প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। বাঙালী জাতির সহিত মুসলমান, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি নানা জাতির সংস্রব নানাভাবে ঘটিয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই সংস্রব দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায়, বাংলা-ভাষায় ফারসী, আরবী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ইংরেজী, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি নানা ভাষার কিছু কিছু শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়া এই ভাষায় স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। এই শব্দগুলির মধ্যে অনেক শব্দ এমনভাবে বাংলা-ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, অনেক সময় এইগুলিকে অন্য ভাষার শব্দ বলিয়াই চিনা যায় না। এইগুলিকে স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (Naturalised) শব্দ বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। এমন কতিপয় শব্দ এইরূপ:---

বই	আরবী	'বহী'	শব্দের স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত শব্দ
পর্দা	ফারসী	'পরদহ্'	
সন	আরবী	'সনহ্'	
জমিদার	ফারসী	'জমীন্দাব'	
হুজুক	আরবী	'হুজূম'	
সান্ত্রি	ইংরেজী	'সেন্ট্রি'	
জাঁদরেল	,,	'জেনারেল'	
বালাম	,,	ভলিউম	
জজ	,,	'জাজ্'	
ভোট	,,	'ভোট'	
রোঁদ	,,	'রাউণ্ড'	
এন্তার	পর্তুগীজ	'এন্তারো'	
পেরেক	,,	'প্রেগো''	
সাবান	,,	'সবও'	
চাবি	,,	'চ্যাভে'	
পেঁপে	,,	'পপয়া'	
গামলা	..	'গামেল্ল'	

বাংলা-ভাষায় এইরূপ বহু বৈভাষিক শব্দ স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা প্রাপ্তির পথে। বাংলা-ভাষা হইতে এইগুলিকে বিতাড়িত করিলে, অথবা ইহাদের মূল খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইহাদিগকে শুদ্ধি করিতে থাকিলে ভাষাব স্বাভাবিক চলচ্ছক্তি রুদ্ধ হইয়া যাইতে থাকিবে। বলাবাহুল্য, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষা আবশ্যকবশতঃ চিন্তা বা শব্দ-সম্পৎ ধার করিয়া থাকে। বিনা আবশ্যকতায় অর্থাৎ আপন ভাষায় ভাব প্রকাশক শব্দ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বৈভাষিক শব্দের আমদানী করিতে থাকিলে, ভাষার জীবনী-শক্তি ক্ষয় পাইতে থাকে। মোটের উপর এই দুই প্রক্রিয়ার কোনটিই ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে হিতকর নহে। অতএব, বাংলা ভাষায় যে-সমস্ত বৈভাষিক শব্দ স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে, সেই সমস্ত শব্দকেই 'বিদেশী' শব্দ নামে চিহ্নিত করা হয়। ইহাদের সংখ্যা শতকরা প্রায় আট।

এইবার তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের নূতন বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

ক। তৎসম-শব্দ

১। অর্থগত বিকৃতির 'অর্দ্ধ-তৎসম'-শব্দকে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির বেলায় 'তৎসম'-শব্দের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

২। তৎসম শব্দের বানান 'সংস্কৃত'-শব্দের বানানের অনুরূপ হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ বানান অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে; যথা---

শুদ্ধ সংস্কৃত বানান	অশুদ্ধ বাংলা বানান
অন্ত্যেষ্টি	অন্তেষ্টি
অন্তঃস্থ-বর্ণ	অন্তস্থ-বর্ণ
আশিস্	আশীষ্
আকাঙ্ক্ষা	আকাংখা
ইতঃপূর্বে	ইতিপূর্বে*
ইতোমধ্যে	ইতিমধ্যে*
উচ্ছ্বাস	উচ্ছাস
বিদ্বান	বিদ্যান
বঙ্কিম	বংকিম
তত্ত্বকথা	তত্বকথা
মহত্ত্ব	মহত্ব
বন্দ্যোপাধ্যায	বন্দোপাধ্যায়
মৎসজীবী	মৎস্যজীবি
মরীচিকা	মরিচীকা
মনোমোহন	মন্মোহন

দ্রষ্টব্য :---*এই চিহ্নযুক্ত শব্দ দুইটির বানান 'চলিত'-বাংলায় বহুপ্রচলিত। এই অজুহাতেই 'চলিত'-বাংলায় ইহাদের বানান শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। 'সাধু'-ভাষায় সংস্কৃত বানানেই শব্দ দুইটিকে লিখিতে হইবে।

৩। 'তৎসম'-শব্দের সন্ধিতে 'ঙ'-স্থানে 'ং' অনুস্বর হইবে।

সংস্কৃত শব্দের যে যে স্থানে 'ঙ'-বর্ণ অনুস্বর হয়, তাহা এইরূপ :—

সন্ধিসম্ভাব্য শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ম' ও দ্বিতীয় শব্দের আদ্য ব্যঞ্জন ক, খ, গ, ঘ হইলে সন্ধিতে 'ম'-এর স্থানে 'ং' অনুস্বর অথবা 'ক'-বর্গীয় বর্ণের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ 'ঙ' হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আগে, এমন কি বর্তমানেও, সন্ধিবদ্ধ অবস্থায় 'ং' অনুস্বর ব্যবহৃত না হইয়া কেবল 'ঙ'-ই ব্যবহৃত হইত বা হইয়া থাকে। বানান, লেখন ও মুদ্রণ কার্যকে সহজতর করিবার উপায়রূপে সংস্কৃত ভাষায়ও অশুদ্ধ নহে, অথচ সহজ,---এমন 'ং'-যুক্ত বানানই নূতন বানান পদ্ধতিতে গৃহীত হইয়াছে সুতরাং, এই সমস্ত ক্ষেত্রে 'ং'-যুক্ত বানানই বিধেয়, যথা---

		পূর্ব বানান		নূতন বানান
অহম্+কার	=	'অহঙ্কার'	স্থলে	'অহংকার'
সম্+কট	=	'সঙ্কট'	,,	'সংকট'
সম্+ক্রান্তি	=	'সঙ্ক্রান্তি'	,,	'সংক্রান্তি'
সম্+গত	=	'সঙ্গত'	,,	সংগত
সম্+গীত	=	'সঙ্গীত'	,,	সংগীত
সম্+ঘটন	=	'সঙঘটন'	,,	সংঘটন
সম্+ঘাত	=	সঙঘাত'	,,	সংঘাত
ভয়ম্+কর	=	'ভয়ঙ্কর'	,,	ভয়ংকর
শুভম্+কর	=	'শুভঙ্কর'	,,	শুভংকর
ক্ষয়ম্+কর	=	'ক্ষয়ঙ্কর'	,,	ক্ষয়ংকর
পারম্+গম	=	'পারঙ্গম'	,,	পারংগম
হৃদয়ম্+গম	=	'হৃদয়ঙ্গম'	,,	হৃদয়ংগম

দ্রষ্টব্য :--- সুসংহত একক শব্দে 'ঙ' স্থানে অনুস্বর হইবে না ; যথা---
অঙ্ক, গঙ্গা, সঙ্গ, লিঙ্গ, বঙ্গ, পঙ্ক, ভঙ্গ, রঙ্গ, বঙ্কিম, পঙ্কিল, রঙ্গন, পঙ্গপাল, পঙ্গু, ভঙ্গুর, ইত্যাদি।

৪। 'তৎসম' শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জন-বর্ণ দ্বিত্ব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে রেফের পর ব্যঞ্জন-বর্ণের দ্বিত্ব-প্রাপ্তি ব্যতিক্রম মাত্র। অথচ ইহাই এতদিন বাংলা তৎসম শব্দেব বানানে অনুসৃত হইতেছিল। নূতন বানানে তাহা বর্জন করিতে হইবে; যথা---

পূর্ব বানান	নূতন বানান	পূর্ব বানান	নূতন বানান
কর্ম্ম	কর্ম	মূর্ত্তি	মূর্তি
অর্দ্ধ	অর্ধ	শৌর্য্য	শৌর্য
ঊর্দ্ধ্ব	ঊর্ধ্ব	কর্ত্তৃকারক	কর্তৃকারক
কর্ত্তা	কর্তা	নির্দ্ধারণ	নির্ধারণ
সূর্য্য	সূর্য	বর্দ্ধমান	বর্ধমান
চক্রবর্ত্তী	চক্রবর্তী	পূর্ব্বাঞ্চল	পূর্বাঞ্চল
অর্জ্জুন	অর্জুন	বীর্য্যশালী	বীর্যশালী
বার্দ্ধক্য	বার্ধক্য	মর্ত্ত্যলোক	মর্তলোক
ভট্টাচার্য্য	ভট্টাচার্য	হর্য্যক্ষ	হর্যক্ষ

দ্রষ্টব্য :--- নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে যেই 'য'-ফলা আছে, তাহা 'সূর্য্য', শৌর্য্য', 'বীর্য্য' প্রভৃতি শব্দে ব্যবহৃত রেফের পর দ্বিত্ব-প্রাপ্ত য'-এর রূপান্তরিত 'য'-ফলা নহে। এইগুলি 'কৃৎ' বা 'তদ্ধিত' প্রত্যয়-জ্ঞাপক 'য'-ফলা। সুতরাং এই 'য'-ফলা রক্ষিত হইবে। যথা---

দীর্ঘ+ষ্ণ্য =দৈর্ঘ্য

অর্ঘ+য =অর্ঘ্য

সুহৃৎ+ষ্ণ্য =সৌহার্দ্য

হৃ+য =হর্ম্য

বিচিত্র+ষ্ণ্য =বৈচিত্র্য

অর্হ+য =অর্হ্য

৫। 'তৎসম' শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গ বাংলায় বর্জিত হইতে পারে, যথা :---

অন্তর	=	অন্তঃ	—	—	অন্ত
পুনর	=	পুনঃ	—	—	পুন
আয়ুস্	=	আয়ুঃ	—	—	আয়ু
সদ্যস্	=	সদ্য :	—	—	সদ্য
বক্ষস্	=	বক্ষঃ	—	—	বক্ষ
মনস্	=	মনঃ	—	—	মন
ক্রমশ্স্	=	ক্রমশঃ	—	—	ক্রমশ
ইতস্ততস্	=	ইতস্ততঃ	—	—	ইতস্তত
বিশেষতস্	=	বিশেষতঃ	—	—	বিশেষত

৬। বিসর্গান্ত্য তৎসম শব্দের সহিত অন্য শব্দের সন্ধি হইলে, বিসর্গ-সন্ধি যথানিয়মে প্রতিপালিত হইবে ; যথা---

আয়ুঃ+কাল	=আয়ুষ্কাল	;	প্রাতঃ+কাল	=প্রাতঃকাল
পুনঃ+আগত	=পুনরাগত	;	সদ্য+জাত	=সদ্যোজাত
বক্ষঃ+উপরি	=বক্ষোপরি	;	অতঃ+এব	=অতএব
অতঃ+পর	=অতঃপর	;	মনঃ+ঈষা	=মনীষা
পুনঃ+পুনঃ	=পুনঃপুন	;	অন্তঃ=দাহ	=অন্তর্দাহ

৭। হসন্তান্ত্য তৎসম শব্দের হস্ চিহ্ন রক্ষিত হইবে অথবা বিকল্পে বর্জিত হইতে পারিবে ; যথা ---

ত্বক্----ত্বক ; দিক্---দিক ; বিদ্বান্---বিদ্বান ; পরিষৎ—পরিষদ্ ; সম্পৎ---ষম্পদ্ ; উদ্ভিদ্---উদ্ভিদ ; শ্রীমান্—শ্রীমান ; সম্রাট্—সম্রাট

খ। অ-তৎসম শব্দ

বাংলায় বর্ণ-বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরণের বেলায় 'অ-তৎসম' অর্থাৎ 'তদ্ভব' 'দেশী' ও 'বিদেশী' সকল প্রকারের শবদকেই এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে হ বে। ধ্বনিগত এবং ধ্বনি ও অর্থ এতদুভয়বিধ 'অর্ধ-তৎসম' শবদও 'অ-তৎসম' শব্দের অন্তর্গত।

২। 'অ-তৎসম' শব্দের বানানেও রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্ব হইবে না ; যথা :---

ক) ---'অর্ধ-তৎসম'-শব্দে :-- নির্জলা, নির্ঝঞ্ঝাট, ইত্যাদি

খ) ---'তদ্ভব'-শব্দে :--- ধর্না, ঝর্না, আর্শি, তের্ছা (তির্যক)

গ) ---'দেশী'-শব্দে :--- ফর্সা, ভর্সা, বর্গা, দর্মা---ইত্যাদি

ঘ) ---'বিদেশী'-শব্দে :-- আর্দালি, উর্দি, উর্দু, শার্শি (ফ্রেন্স chassis) দর্জি, পর্দা, কার্নিস, বর্মা, জর্মন, ফর্মা, কর্জ, গর্দা, শর্ত, বাবুর্চি, শীর্নি, আর্জি ---ইত্যাদি।

৩। 'অ-তৎসম' শব্দের শেষে 'হস্'-চিহ্নের ব্যবহার প্রযোজন অনুসারে বিধেয়। যেমন---'তাহার কোন কাজে মন নাই'। এখানে 'কোন' শব্দ স্বরান্ত। কিন্তু, যদি বলি, 'তাহার কোন্ কাজে মন নাই' অর্থাৎ সকল কাজে মন আছে। এখানে 'কোন' শব্দের শেষে হসন্ত আবশ্যক মোটের উপর, ভুল উচ্চারণ বশতঃ ভুল অর্থবোধ জাগাইবার সম্ভাবনা থাকিলে শব্দের শেষে বা মধ্যে হসন্ত ব্যবহার করিতে হইবে ;

যেমন----খট্কা, তদ্বির, কট্মট্, চুপ্চাপ্, তখ্ৎ (কিন্তু---তক্ত, গঞ্জ,) স্পঞ্জ্ ইত্যাদি।

৪। 'অ-তৎসম' শব্দে ই, ঈ উ, ঊ এর ব্যবহার বিধি নিম্নরূপ হইবে :—

(ক) ---'তদ্ভব' ও ধ্বনিগত বিকৃতির 'অর্ধ-তৎসম' শব্দে 'ই', 'ঈ', 'উ', ''ঊ-এর ব্যবহার পূর্ণরূপে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বকেই অনুসরণ করিবে। কারণ বাংলা-ভাষায় স্বাভাবিক দীর্ঘ স্বর-ধ্বনির উচ্চারণ বহুপূর্বেই লোপ পাইয়াছে। অবশ্য, এই সমস্ত ক্ষেত্রে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুসরণে বিকল্পে 'ঈ' ও 'ঊ' এর ব্যবহার স্বীকৃত হইয়াছে বটে, তবে তাহাতে বানান-বিভ্রান্তি কিছুতেই কমিবে না। কারণ, একটা সর্বস্বীকৃত শৃঙ্খলা বিধানের যে মূল-উদ্দেশ্য লইয়া বানান-সংস্কারে হাত দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। অতএব, এই সমস্ত ক্ষেত্রে বাংলা স্বর-ধ্বনিতত্ত্বের অনুসরণে সর্বদাই 'ই' বা 'উ' ব্যবহারই বিধেয় ; যথা---

পূর্ব / পুব ; চূর্ণ / চুন ; বাটিকা / বাড়ি ; কুম্ভীর / কুমির ;
পানীয়/ পানি ; দ্যূত/ জুয়া ; তূলিকা/ তুলি ; চূড়া/চুল ;
শীর্ষ / শিষ ; পক্ষী / পাখি ; ঊনবিংশ / উনিশ ;
দীপশলাকা / দিয়াশলাই / দেশলাই ; কীলক / খিল ;
যষ্টি=লষ্টি / লাঠি ; কূপ / কুয়া ; তর্দূ / তাড়ু—ইত্যাদি

ব্যতিক্রম :--- হীরক / হীরা ; নীলক / নীলা
কীর্তনীয়া / কীর্তুনে, কীর্তনে

(খ) ---স্ত্রীলিঙ্গবাচক তদ্‌ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অন্ত্য হ্রস্ব-'ই' লিঙ্গ জ্ঞাপনের সুবিধার জন্য সর্বত্র দীর্ঘ 'ঈ' হইবে ; যথা---

বাঘিনী, মাষ্টারনী, মাসী, পিসী, সাহেবানী, ঠাকুরানী, সাপিনী মেথরানী, কলুনী, গোপিনী, অভাগিনী, খুকী, মামী, বুড়ী, ছুঁড়ী---ইত্যাদি

ব্যতিক্রম :--- ঝি, দিদি, বিবি।

(গ) ---জাতি বা শ্রেণীবাচক তদ্‌ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অন্ত্য হ্রস্ব 'ই' দীর্ঘ---'ঈ' হইবে ; যথা---

ঢাকী, কেরানী, ইরানী, জাপানী, সিংহলী, বর্মী, শ্যামী, কাজী, মার্কিনী, আন্দামানী, মিসরী, ফরাসী, আফগানী, বাঙালী, মালয়ী, পাকিস্তানী, ভারতী, আনসারী, জাফরী, হাশমী---ইত্যাদি।

(ঘ) ---ভাষা-বাচক তদ্‌ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অন্ত্য হ্রস্ব-'ই' দীর্ঘ-'ঈ' হইবে ; যথা---

ইংরেজী, আরবী, ফার্সী, হিন্দী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, মরাঠী, গুজরাটী, বর্মী, শ্যামী, কেনেড়ী, সাঁওতালী, আসামী, মৈথিলী---ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম :--- পালি, খাসি।

(ঙ) ---বিশেষণ-বাচক তৎভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের অন্ত্য---'ই' দীর্ঘ---'ঈ' হইবে ; যথা---

রাগী, দাগী, রেশমী, পশমী, সানাী, রূপালী, বিলিতী,

ভাটিয়ালী, বেনারসী, খাসী, সূতী, রূপশালী, বেশী, কর্মী, রাজী, পাজী, জারী---ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম :---কচি, মিহি, মাঝারি।

(চ) ---মনুষ্যেতর জীববোধক, যে-কোনবস্তু, ভাব ও কর্ম-বাচক এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল 'ই' হইবে; যথা---

মনুষ্যেতর জীব :---বেঙাচি, পাখি, বেজি---ইত্যাদি

বস্তু :---সুজি, কাঠি, লাঠি, ঘড়ি, বাড়ি, ছড়ি, শাড়ি, গাড়ি, হাঁড়ি, জাফরি, খিড়কি, সিঁড়ি---ইত্যাদি।

ভাব :---পাগলামি, বদ্‌মাইসি, জ্যেঠামি, পাকামি, বাড়্‌তি, কম্‌তি, ঘাট্‌তি, চল্‌তি, উঠ্‌তি, ভর্তি, দুষ্টামি, খুশি, খালি, জালি, কন্‌কনি, ঝন্‌ঝনানি, টনটনি, ঝনঝনি, সরাসরি, তাড়াতাড়ি, হুড়াহুড়ি---ইত্যাদি।

৫। 'অ-তৎসম' শব্দে বর্গীয়-'জ' ও অন্তঃস্থ-'য' এর ব্যবহার নিম্নরূপ :--- যে-সমস্ত 'তদ্‌ভব'-শব্দের 'তৎসম'-রূপে অন্তঃস্থ-'য' রহিয়াছে, সে-সমস্ত শব্দের মূলের অন্তঃস্থ-'য' স্থলে প্রাকৃতের বর্গীয 'জ' হইবে। কারণ, 'তৎসম' শব্দের অন্তঃস্থ-'য' প্রাকৃতে বর্গীয়-'জ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াই বাংলায় প্রবেশ করে। আর, যে-সমস্ত তদ্‌ভব'-শব্দের 'তৎসম-' রূপে বর্গীয়-'জ' রহিয়াছে, সে-সমস্ত শব্দের মূল বর্গীয়-'জ' রক্ষিত হইবে; যথা---

কার্য>কাজ; যবাগু>জাউ; যন্ত্র>জাঁত+আ=জাঁতা, যন্ত্রিকা>জাঁতি; যূথিকা>জুঁই; যোগ>জো; যুক্তি>জুত্ ('জুত' পাচ্ছিনা) যোত্র>জোত>(জমি); জতু / জউ, জৌ; যুগ+আল>জুয়াল>জোয়াল। জ্যোতিঃ>জোত (চোখের 'জোত'); জীব+ওয়ালা জিওল, জিয়ল; জুড়্>বাং. জোড়+আ=জোড়া।

৬। 'অ-তৎসম' শব্দে মূর্ধন্য-'ণ' ও দন্ত্য-'ন' এর ব্যবহার :---

'অ-তৎসম' শব্দে মূর্ধন্য-'ণ' ও দন্ত্য-'ন' এর ব্যবহার নিম্নরূপ :---

মূর্ধন্য-'ণ' ধ্বনির ব্যবহার কেবল 'তৎসম' শব্দেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কারণ বাংলা-ভাষায় মূর্ধন্য উচ্চারণ নাই। সুতরাং, কেবল 'তৎসম'-শব্দ ব্যতীত অন্য সমস্ত শ্রেণীর শব্দে দন্ত্য-'ন' ব্যবহৃত হইবে; যথা---

কর্ণ>কান ; স্বর্ণ>সোনা ; স্কন্ধ>কান+আ=কানা (যেমন---মেরেছ্ কল্‌সির কানা ;---তাই বলে কি প্রেম দেব না) ; পর্ণ>পান ; কাপণ (অন্ধ)>কানা ; রাজ্ঞী>রানী ; ব্রাহ্মণ>বামুন ; ঝর্না ; কোরান ; কার্নিস ; কর্নওয়ালিস ; জর্মন ; ইরান ; ফর্মান ; কোর্‌বানি---ইত্যাদি।

। 'তদ্‌ভব'-শব্দে ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার :---

সুপ্রচলিত 'তদ্‌ভব' শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অতিরিক্ত 'ও'-কার বা ঊর্ধ্ব-কমা যোগ যথা-সম্ভব বর্জন করা উচিত। তবে, যদি অর্থগ্রহণে বিঘ্ন ঘটে, কতিপয় সুপ্রচলিত শব্দের অন্ত্য অক্ষরে 'ও'-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা দেওয়াই ভাল ; যথা---

ভাল	(কপাল)	—	ভালো	(উত্তম)
মত	(সম্মতি)	—	মতো	(তুল্য, অনুরূপ)
কাল	(মৃত্যু)	—	কালো	(কৃষ্ণ বর্ণ)
হল	(লাঙ্গল)	—	হ'ল	(হইল)
বল	(শক্তি)	—	বলো	(কও)
পড়	(পাঠ কর)	—	প'ড়ো	(পড়ুয়া)
পড়	(পতিত হও)	—	পড়ো	(পতিত)
পুরাণ	(প্রাচীন শাস্ত্র)	—	পুরানো	(প্রাচীন)

৮। 'অ-তৎসম' শব্দে ঙ, ং, ঙ্গ-এর ব্যবহার :---

অনুস্বর 'ং' ও 'ঙ' বর্ণের উচ্চারণ অতীতে যাহাই থাকুক না কেন, অধুনা ইহাদের বাংলা উচ্চারণ একই। কিন্তু, এখন পর্যন্ত অনুস্বর 'ং' অথবা উঅঁ 'ঙ' বর্ণের উচ্চারণ 'ঙ্গ' নামক সংযুক্ত ধ্বনির সমান নহে। তাই দেখা যায়, 'রং' বা 'রঙ্' লিখিলে যে উচ্চারণ ধরা পড়ে, 'রঙ্গ' লিখিলে সে উচ্চারণ ধরা পড়ে না। শব্দটির শেষ ব্যঞ্জন-ধ্বনির সহিত স্বর বর্ণ যোগ করিলে এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে, যেমন--- 'রং-এর', 'রঙ্গের' 'রঙের'। এই সমস্ত জায়গায় উচ্চারণে ও লেখায় 'রং-এর' অথবা 'রঙ্গের' চেয়ে 'রঙের' যে সহজ,

তাহাতে সন্দেহ নাই। এমনটি ঘটিবার মূল কারণ, অনুস্বর 'ং' সর্বদা হসন্ত্য-ব্যঞ্জন, উঅঁ 'ঙ' সর্বদা স্বরান্ত্য-ব্যঞ্জন, এবং 'ঙ্+গ'=ঙ্গ অর্থাৎ হসন্ত্য-'ঙ' ও স্বরান্ত্য-'গ' ব্যঞ্জনের সংযুক্ত ধ্বনি। ফলে, অনুস্বরের সহিত স্বরধ্বনির যোগ যেমন অসম্ভব, উঅঁ-র সহিত স্বরধ্বনির যোগ তেমন সহজ ও স্বাভাবিক; অধিকন্তু, সংযুক্ত 'ঙ'-এর সহিত তো কোন স্বরধ্বনি যোগ চলেই না। তাই স্বরান্ত্য 'গ'-এর সহিত স্বরধ্বনির যোগ করিতে হয় বলিয়া সংযুক্ত 'ঙ্+গ'=ঙ্গ-এর 'গ'-ধ্বনিই উচ্চারণে প্রাধান্য লাভ করে। অতএব, স্থির হয় যে, 'অ-তৎসম-শব্দে অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দে হসন্ত্য অনুনাসিক-ধ্বনি থাকিলে, তাহাকে অনুস্বর 'ং' দ্বারা এবং স্বরান্ত্য অনুনাসিক-ধ্বনি থাকিলে, তাহাকে উঅঁ 'ঙ' দ্বারা লিখিতে হইবে; যথা----

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, 'বঙ্গালা	লিখিতে	হইবে	'বাংলা' রূপে
'বাঙ্গালী,' 'বঙ্গালী,' 'বাঙ্গলী'	,,	,,	'বাঙালী' ,,
'ভাঙ্গন'	,,	,,	'ভাঙন' ,,
'আঙ্গিনা'	,,	,,	'আঙিনা' ,,
'রঙ্গ'	,,	,,	'রং' ,,
'রঙ্গীন'	,,	,,	'রঙীন' ,,
'সঙ্'	,,	,,	'সং' ,,
'সঙ্গীন'	,,	,,	'সঙীন' ,,
'রঙ্গের'	,,	,,	'রঙের'' ,,
'ঔরঙ্গজীব'	,,	,,	'ঔরংগ্জীব

৯। 'অ-তৎসম' শব্দে শ, ষ, স এর ব্যবহার:---

(ক) 'তদ্ভব'-শব্দে 'তৎসম'-শব্দের শ, ষ, স বজায় রাখিতে হইবে; নতুবা বহু শব্দে বানান ও অর্থ বিভ্রাট ঘটিবে:---

অংশু>আঁশ; আমিষ>আঁষ+টিয়া=আঁষ্‌টে; সর্ষপ>সরিষা; মশক>মশা; শিম্ব>শিম; শিরস্থান>শিথান; শারিকা>শারি; শম্বুক>শামুক; শ্রাবণ>শাঙন; মহিষ>মোষ; শ্যালক-জায়া>শালাজ; স্পর্শ>পরশ; শাটিকা>শাড়ি; শেফালিকা>শিউলি; শৃগালকোলি>শেয়াকুল;

বংশী > বাঁশী; পিতৃঃস্বসা > পিসী; মাষকলায় > মাষকলাই;
মাতৃঃস্বসা > মাসী; সংক্রম > সাঁকো;

ব্যতিক্রম ঃ---মনুষ্য > মিন্‌সে, শ্রদ্ধা > সাধ, ভ্রাতৃশ্বশুর > ভাসুর।

(খ) দেশী বা অজ্ঞাত মূল শব্দে সর্বত্র এক বানানের অনুসরণ সম্ভব নয়। কেননা, মূল অজ্ঞাত বলিয়া কোন বানানের আদর্শই সম্মুখে উপস্থিত না থাকায়, ইহাদের বেলায় সুপ্রচলিত বানান রক্ষা করাই উচিত বিবেচিত হইল; যেমন---

ফর্সা, উস্‌খুস্‌, উস্‌কানি, ভরসা

অথবা

ফরশা, উশ্‌খুশ্‌, উস্কানি, ভর্ষা,

(গ) 'বিদেশী'---শব্দের কোন ধ্বনিতে মূর্ধন্য-ধ্বনির উচ্চারণ দেখা যায় না। এই জন্য বিদেশী শব্দে মূর্ধন্য-'ষ' ব্যবহৃত হইবে না। বিদেশী শব্দের মূল-ধ্বনি 'S বা 'س'-এর স্থানে বাংলায় দন্ত্য-'স' এবং sh বা 'ش'-এর স্থানে তালব্য-'শ' লিখিতে হইবে। বলাবাহুল্য, 'বিদেশী'-শব্দের 'S' বা 'س'-এর জন্য বাংলায় 'তালব্য'-'ছ' বর্ণের ব্যবহার যে-কোন ধ্বনিতত্ত্বের বিপরীত। কারণ, 'S' বা 'س' উষ্ম দন্ত্য-ধ্বনি এবং 'ছ' মহাপ্রাণ তালব্য ধ্বনি।

س=S ঃ---	জিনিষ	(جنس)	স্থলে	জিনিস
	সবজী	(سبزی)	,,	সব্‌জি
	মুছলমান	(مسلمان)	,,	মুসলমান
	শাদা	(ساده)	,,	সাদা
	সব্‌জ্‌	(سبز)	,,	সবুজ
	খুশী	(خوشی)	,,	খুশি
	পোষাক	(پوشاک)	,,	পোশাক
	সহর	(شهر)	,,	শহর
	সরম	(شرم)	,,	শরম
	সরবত	(شربت)	,,	সরবৎ

খৃষ্টাব্দ (Christan year) ,, খ্রীষ্টাব্দ
ষ্টেশন (Station) , স্টেশন
আগষ্ট (August) আগস্ট
পোষ্ট (Post) পোস্ট

দ্রষ্টব্য ঃ--- ১) ফারসী ও আরবীর ث ও ص মূলে যাহাই থাকুক না কেন, বাংলায় এই বর্ণ দুইটির উচ্চারণ س-এর মতো বলিয়া, এই বর্ণ দুইটিও বাংলা দন্ত-'স' দিয়া লিখিতে হইবে ঃ---

আসল (اصل) ; খাস (خاص) ; হদিস (حديث)
মাসুল (محصول) ; (غياث الدين) গয়াসুদ্দীন
— ইত্যাদি ।

২) যে-সমস্ত ইংরেজী শব্দে C-এর উচ্চারণ 'K' নহে, সে-সমস্ত ইংরেজী শব্দকে দন্ত্য 'স' দিয়া লিখাই প্রশস্ত ঃ Police=পুলিস ; Cemcnt=সিমেণ্ট ; Pencil= পেন্‌সিল ; Notice=নোটিস্---ইত্যাদি ।

১০। কতকগুলি 'তদ্‌ভব' ও 'দেশী' শব্দের চলিত রূপ কলিকাতা অঞ্চলে বিকৃত হইয়া উচ্চারিত হয়। ফলে, এই জাতীয় বানান বিকৃতিও নিতান্ত কম নহে। এই সমস্ত শব্দের বানানে শৃঙ্খলা-বিধানের জন্য নিম্নের দুইটি নিয়ম প্রণীত হইল ঃ---

(ক) যে-সমস্ত 'তদ্‌ভ'ব ও 'দেশী' শব্দেব মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ সাধু ভাষার অনুরূপ হইবে ; যথা---

পিত্তল > পিতল — 'পেতল' নহে
অভ্যন্তর > ভিতর — 'ভেতর' ,,
উপরি > উপর — 'ওপর' ,,
পশ্চাৎ > পিছন — 'পেছন' ,,

(খ) যে-সমস্ত 'তদ্‌ভব' ও 'দেশী' শব্দের মৌখিক বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের মতই হইবে, যথা---

কুয়া > কুয়ো ; সুতা > সূতো ; জুতা (দেশী শব্দ) > জুতো ;
মিছা > মিছে ; সত্যই > সত্যি ; উঠান > উঠন ;
উনান > উনন ; পুরানা > পুরনো ; নূতন > নতুন ;

১১। অধিকাংশ বাংলা শব্দ হসন্তান্ত্য। এই জন্য, কতকগুলি ক্রিয়া-পদের কৃদন্ত রূপের সাধুরূপ লিখিত হইলে, উচ্চারণে ভুল হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক। এই ভুল উচ্চারণ বর্জনের উপায়রূপে বাংলা ভাষার সাধারণ ধ্বনিতত্ত্ব অনুযায়ী এই সমস্ত শব্দের শেষ 'অ'-স্বরকে 'ও'-স্বরে পরিণত করাই বিধেয় ; যথা---

কাঁদান=কাঁদানো ; হাসান=হাসানো ; হারান=হারানো।

এইরূপ-----ঘাটানো, ছাপানো, আগানো, খাওযানো, মন-মাতানো, ঘুম-ভাঙানো, কল-চালানো-ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ----অনেকেই 'করিয়ো', 'দিয়ো', 'লইয়ো' প্রভৃতি বানান লিখিয়া থাকেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্তঃস্থ-- 'য়' অনাবশ্যক। এই জাতীয় শব্দের বানান এইরূপ হইবে, 'করিও,' 'দিও', 'নিও', প্রভৃতি। ℨ

ℨ ভাষা একটা সর্বজনমান্য-শৃঙ্খলা বা discipline। ভাষার লিখন-পদ্ধতি, শিক্ষা-প্রণালী, সৃষ্টির ধারা, শক্তি বৃদ্ধির উপায়, এক কথায় ভাষার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি উক্ত সর্বজনমান্য-শৃঙ্খলার উপব একান্তভাবে নির্ভরশীল। দুঃখের বিষয় এই,—কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কাবের নামে বাংলাদেশে বর্তমানে (আগস্ট, ১৯৭৬) **"যদৃচ্ছা-বানান"** চলিতেছে। ইহাতে বাংলা-ভাষার শৃঙ্খলার মূলে কুঠারাঘাত হানা হইতেছে। এখনও বাংলাদেশের বাঙালীদের পক্ষে সাবধান হইবার সময় আছে। যদি তাঁহারা আবশ্যকীয় সাবধানতা এখন হইতে অবলম্বন না করেন, তবে দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-ভাষার যেই অভূতপূর্ব সম্ভাবনা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার আশা ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে জাতিও মরিবে,—দেশও বাঁচিবে না।

বাংলা-ভাষার সংস্কার

(সমালোচনামূলক প্রবন্ধ)

ভারতীয় পুলিস-বিভাগীয় কর্মচারী এবং খুলনার বর্তমান পুলিস-সাহেব মিষ্টার 'অবূ-ল্-হসনাৎ সম্প্রতি "বাংলা-ভাষার সংস্কার" নাম দিয়া একখানি সতের পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। আমাদের নিকট এই পুস্তিকার একখণ্ড মতামত প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল, তিনি এই পুস্তিকায় যে-সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা বিশেষজ্ঞ না হইলেও, একেবারে অজ্ঞ নহি। বাংলা-দেশে একমাত্র ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ব্যতীত এ-বিষয়ে অন্য কোন পণ্ডিতের মতামতের কোন বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না। আমাদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর লোকের মতামতের কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক, পুস্তিকাখানি যখন মতামত প্রকাশের জন্যই আমাদের কাছে পাঠানো হইয়াছে, তখন অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমরা মতামত প্রকাশ করিতে বাধ্য।

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে পুলিস-সাহেব মহোদয় বাংলা-ভাষার সংস্কারের জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব লইয়া বাঙালীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলিকে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, মোট তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক ভাগের আবার কতিপয় উপ-বিভাগও রহিয়াছে। পুস্তিকাখানিতে বিশৃঙ্খলভাবে সমস্ত প্রস্তাব যদৃচ্ছা আলোচিত হওয়ায়, পুস্তিকাখানির মূল বিষয়-বস্তু কি, তাহা চট্-করিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না। পুস্তিকাখানি পড়িলেই মনে হয়, অনেকগুলি বেয়াড়া-চিন্তা একসঙ্গে তালগোল পাকাইয়া লেখকের ধারণাকে অস্পষ্ট ও ঘোলাটে এবং সময় সময় ধোঁয়াটে করিয়া তুলিয়াছে। বিষয়-বস্তুকে যথাসাধ্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য, আমরা নীচে বড় বড় বিভাগ তিনটির নাম করিতেছি, যথা :--

(ক) বাংলা-ভাষা-সংস্কার।

(খ) বাংলা-শব্দের বানান-সংস্কার।

(গ) বাংলা-ভাষার বর্ণমালা-সংস্কার।

উপর্যুক্ত বিভাগ তিনটিই বিষয়-বস্তুর দিক হইতে অত্যন্ত গুরুতর। গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে, আলোচনা যে পুস্তিকাখানিতে নিতান্তই যৎসামান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মতে প্রত্যেকটি বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল; এ-ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই বলিয়া, সমস্ত বিষয় সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয় নাই। তথাপি, বিষয়গুলি যে আলোচনা-সাপেক্ষ নয়, সে কথা বলা চলে না।

এইখানেই বলিয়া রাখিতে হয়, উক্ত তিন প্রকারের সংস্কার এক ব্যাপার নহে। ইহাদের একটির সহিত অপরটির যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু সেই যোগাযোগ বিষয় তিনটিকে এক ব্যাপারে পরিণত করে না। কারণ, ভাষা-সংস্কার এক ব্যাপার, বানান-সংস্কার অন্য ব্যাপার, বর্ণমালা-সংস্কার আর এক ব্যাপার। আমরা অতি সংক্ষেপে ব্যাপার তিনটিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি; নতুবা তালগোল-পাকানো চিন্তা অনেকের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইতে পারে। আলোচ্য পুস্তিকায় এইরূপ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের আশঙ্কা।

ভাষা-সংস্কারঃ----মানুষের মধ্যে আকারে-প্রকারে, ইশারা-ইঙ্গিতেও ভাব-প্রকাশ চলে; কিন্তু তাহা ভাষা নহে। মানুষ যখন অপরের বোধগম্য কথার সমাবেশে অপরের নিকট ভাব-প্রকাশ করে, তখন ঐ কথাগুলির সমষ্টিই তাহার ভাষায় পরিণত হয়। এইরূপভাবে ভাব-প্রকাশের যে ভাষা, তাহা একটি চিরাচরিত ধারার অনুসরণ করিয়া সামনের দিকে আগাইয়া যায়। ব্যাকরণ ভাষার এই চিরাচরিত ধারার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দেয়। এই জন্যই ভাষাকে অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণ হয়,---ব্যাকরণকে অনুসরণ করিয়া ভাষা হয় না। অন্য কথায়, ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গি পালটাইলেই ব্যাকরণ বদলায়। ভাব-প্রকাশের চিরাচরিত ধারার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না ঘটিলে, ভাষার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে না। এই মনোভাব-প্রকাশক চিরাচরিত ধারার নামই ব্যাকরণে পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি বা Syntax। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাষায় পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিই সেই ভাষার ব্যাকরণ। কারক, প্রত্যয়, ক্রিয়া-বিভক্তি, শব্দ-বিভক্তি প্রভৃতি পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিরই খুঁটিনাটি পরিচয় মাত্র। সুতরাং ভাষা-সংস্কারের অর্থ ভাষার পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিরই সংস্কার অর্থাৎ কারক, প্রত্যয়, ক্রিয়া-বিভক্তি, শব্দ-বিভক্তি ইত্যাদিরই সংস্কার। শুধু শব্দের গঠন-সংস্কারে অর্থাৎ শব্দের দৈহিক আকৃতির সংস্কারে, ভাষার

চিরন্তন প্রকৃতি সংস্কৃত হয় না, ইহার বাহ্যিক আবরণমাত্র পরিবর্তিত হয়। নিম্নের উদাহরণ হইতে আমাদের মন্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে:---

১। "কে না বাঁশী বায়ে বড়ায়ি কালিনী নই কূলে"।

২। কে না বাঁশী বায় বড়াই কালিন্দী নদী কূলে।

৩। হে বড়াই, কালিন্দী নদীর কূলে বাঁশী বাজাইতেছে, সে কে?

প্রথম বাক্যটি খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়েব মধ্যযুগীয় বাংলার খাঁটি নিদর্শন। দ্বিতীয় বাক্যটিতে আমরা কেবল কতিপয় শব্দেব সংস্কার করিয়াছি; এতৎসত্ত্বেও বাক্যটি প্রথম বাক্যের অর্থবোধে কোন প্রকারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহায্য করিয়াছে কি? না করিবার একমাত্র কারণ, বাক্যটিতে প্রথম বাক্যটির পদ-বিন্যাস-পদ্ধতির অর্থাৎ ব্যাকরণের পরিবর্তন ঘটে নাই। ব্যাকরণের দিক হইতে উভয় বাক্য মধ্যযুগীয় বলিয়া আমাদেব ন্যায় বর্তমান যুগের লোকের নিকট উভয় বাক্যই অবোধ্য। যেই মাত্র তৃতীয় বাক্যে পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি পালটাইয়া, নূতন ছাঁচে বাক্যটিকে ঢালিয়া দেওয়া হইল, অমনি বাক্যটি আমাদেব নিতান্তই আপনার হইয়া উঠিয়াছে।

প্রধানতঃ এই কারণেই বাংলা বাক্য "আমি দিয়াছি তাহাকে এক বই সেই দিন (I gave him a book that day) বাংলা কথায় লিখিত হইলেও বাংলা নহে,---ইংরাজী; কথার গাঁথুনি বা ব্যাকরণ অনুসারে একেবারেই ইংরাজী। কেননা যেই ভাব ঐ বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে বাঙালী তাহার চিরাচরিত প্রকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া ঐরূপে বলে না; সে আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঐ-ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া বলে, "আমি সেইদিন তাহাকে একখানি বই দিয়াছি।" ঠিক সেইরূপ "I that day htm a book gave" ইংরাজী হইলেও, ইংরাজী নহে, বাংলা। "আমি every morning-এ garden-এ walk করি"----এই বাক্যটিতে বহু ইংরাজী কথা থাকিলেও বাংলা; কেননা "আমি প্রত্যেক সকালে বাগানে ভ্রমণ করি"---এই বাক্যটির সহিত ইহার পূর্ব বাক্যের ব্যাকরণগত তফাৎ কিছুই নাই।

আশা করি, এখন পরিষ্কাররূপে দেখা যাইবে যে, ভাষার সংস্কার করিতে হইলে, ভাষার চিরাচরিত প্রকৃতিবিরুদ্ধ সংস্কার করা চলে না। ভাষার প্রকৃতিকে মানিয়া লইয়াই প্রত্যেক জীবন্ত ও জাগ্রত ভাষা সংস্কৃত হইয়াছে,

হইতেছে ও হইবে। কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা দলবিশেষের দ্বারা ভাষার প্রকৃতি বদলানো সম্ভবপর কি না, তাহার বিচার কালই করিয়া থাকে। তবে, অসাধারণ প্রতিভাশালী জাতীয় সাহিত্যিক বা জাতীয় কবির আবির্ভাব ঘটিলে, এই বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন সম্ভবপর বটে, কিন্তু তাহাও নিতান্তই সময়-সাপেক্ষ। কেননা, সমগ্র জাতির চিন্তা ও ভাবধারার প্রকাশের মধ্য দিয়াই, সেই জাতির ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গি নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বানান-সংস্কার ঃ----পরস্পর পরস্পরকে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্যই মানুষের ভাষার আবিষ্কার। এই জন্যই বোধ-গুণ ভাষার শ্রেষ্ঠ গুণ। এই বোধ-গুণের জন্যই ভাষার দুইটি দিক রহিয়াছে: একটি শুনিয়া ও শুনাইয়া বুঝার দিক, আর অন্যটি দেখিয়া ও দেখাইয়া বুঝার দিক। যে-ভাষার ইতিহাস আছে, যে-ভাষার রূপায়ণ অর্থাৎ সাহিত্য আছে, সে-ভাষার শ্রুতি ও দৃষ্টির দিকের মধ্য হইতে কোন্‌টির যে প্রয়োজন কম, এই কথা সঠিকভাবে বলা বড়ই কঠিন। শুধু শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া কোন বড় সাহিত্য জন্মলাভ করিতে পারে না; অন্ততঃ তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের জানা নাই। এই জন্যই শ্রুতিমূলক সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতির ভাষায় বড় সাহিত্য নাই। শব্দ ভাষার শ্রুতিমূলক দিকের জন্য যেমন প্রয়োজন, ইহার দৃষ্টি-মূলক দিকের জন্যও তেমন প্রয়োজন। বানান শব্দেরই রূপায়ণ বটে, কিন্তু ভাষার শ্রুতিমূলক দিকের জন্য ইহার বিশেষ কোন আবশ্যকতা অধুনা অনুভূত হয় না। দৃষ্টিমূলক বোধই যখন বানানের প্রধান বেসাতি, তখন শব্দের বানানগত চেহারা দেখিয়াই অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে পারাই বানানের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর উন্নততম ভাষার শব্দের বানানের তাহাই প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে গিয়া শব্দ ধীরে ধীরে যে-রূপায়ণ অর্থাৎ লিখনরীতি লাভ করে, তাহাতে শ্রুতির প্রভাব কম নয়। কালক্রমে শব্দের মধ্যে শ্রুতির প্রভাব হয়ত সর্বত্র স্বীকৃত হয় না; কিন্তু ভাষার ধ্বনি-বিজ্ঞানে (Phonetics) শব্দের সেই ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়। এই কারণেই অধুনা দুই অর্থবোধক দুই শব্দ একরূপ, কিংবা অনেকখানি একরূপ উচ্চারিত হইলেও, লেখায় ভিন্নরূপ ধারণ করে। এইজন্য "পুস্তক পড়া" এবং "কাপড় পরা" কথাদ্বয়ের "পড়া" বা "পরা" শব্দ একটি "র" অথবা "ড়"-এর দ্বারা লেখা চলে না। কেননা, "পড়া" শব্দ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, "পঠন"

শব্দ হইতে এবং "পরা" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, "পরিধান" শব্দ হইতে। শব্দ দুইটিতে শ্রুতির প্রভাব এখনও রহিয়াছে,--বাংলা-দেশের বহুস্থানে "ড়" "র" অক্ষরদ্বয় খুব স্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হয়।

মোটের উপর, ভাষার যেমন ইতিহাস আছে, প্রকৃতি আছে, নিজস্ব ধারা আছে, ভাষার শব্দের রূপায়ণেরও অর্থাৎ লিখন-পদ্ধতিরও ঠিক তেমনই ইতিহাস আছে, প্রকৃতি আছে, নিজস্ব ধারা আছে। কোন ভাষায় শব্দের বানান-সংস্কার করিতে হইলে, গায়ের জোরে কোন সংস্কার করা চলে না। শব্দের ইতিহাস, প্রকৃতি ও পরিবর্তনের ধারার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়াই বানান-সংস্কার করিতে হয়। এইসব বিষয়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখার নামই শব্দের ব্যাকরণ-বাঁচানো। তাই বানান-সংস্কার সম্বন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয়, সেখানে সেটা করাই কর্তব্য। তাতে জীবে (অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ও নতুন প'ড়োদের প্রতি) দয়ার প্রমাণ হয়। এক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচার-নিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা।" আমরাও বানান-সংস্কার-সম্বন্ধে কবি-গুরুর সহিত সম্পূর্ণ একমত। ব্যাকরণ বাঁচাইয়া বানান-সংস্কারের প্রচেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন। ইহার পর হইতে কবিগুরু যেমন তাঁহার লেখায় আমরাও তেমন আমাদের লেখায় তাহা হুবহু গ্রহণ করিয়াছি। ইত্যধিক সংস্কারও যে চলিতে পারে, সে-বিষয়ে আমরা আগ্রহান্বিত হইলেও, বিশেষজ্ঞদের পানে তাকাইয়া ভবিষ্যতের ভরসায় রহিয়াছি। ব্যাকরণ বাঁচাইয়া যুক্তিসংগতরূপে বাংলা-বানান সংস্কৃত হউক, ইহাই আমাদের কামনা। আলোচ্য বানান-সংস্কারের পরীক্ষায় আমরা প্রধানতঃ এই মাপ-কাঠিই ব্যবহার করিব।

এই মাপকাঠির ব্যবহার-ফলে, শব্দ-বিজ্ঞান আলোচনা করিতে গিয়া, পণ্ডিতগণ 'তৎসম', 'অর্ধ-তৎসম', 'তদ্ভব', 'দেশী' ও 'বিদেশী'---এইরূপ ভাগে বাংলা-শব্দকে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রত্যেক ভাগের শব্দের বানানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে; নতুবা বানানে গোলমাল বৃদ্ধি ব্যতীত কমিবে না এবং কমিতেও পারে না। এই কারণে, "সংগীত" যেরূপ বানানে লেখা চলে, "সঙ্গে" অথবা "গঙ্গা" সেরূপ বানানে লেখা চলে না; কারণ "ঙ্গ' মাত্রই "ংগ" করিয়া সহজ করা যায় না। কেননা, একটি

(গঙ্গা, সঙ্গে) শব্দের প্রকৃতিগত বানান এবং অপরটি (সংগীত=সম্+গীত=সঙ্গীত ; অহংকার=অহম্+কার=অহঙ্কার) শব্দের সন্ধিঘটিত বর্ণ-বিন্যাস। অনুরূপ কারণেই তদ্ভব "হাত", "হাতি" প্রভৃতি শব্দ লিখিতে "ত", অথচ "মাথা" "পুঁথি বা পুথি" প্রভৃতি শব্দ লিখিতে "ত" না হইয়া "থ" হয়। মনে রাখা উচিত, সব-কয়টি শব্দে "তত" বা "থ" সংস্কৃত "স্ত" ভাঙিয়া গঠিত (দ্রষ্টব্য :---হাত<হস্ত ; হাতি<হস্তী ; মাথা<মস্তক ; পুঁথি বা পুথি<পুস্তিকা)। যিনি শব্দের বানান-সংস্কারে প্রয়াসী, তাঁহাকে শব্দের ইতিহাস, উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি প্রভৃতির ধারার কথা মনে রাখিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। এইসব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে অগ্রসর না হইয়া, ভাবাবেগে কোন বিশিষ্ট ধারণার বশবর্তী হইয়া সংস্কার-প্রয়াসী হইলে, উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

বর্ণমালা-সংস্কার :----বাংলা-বর্ণমালা বাঙালী জাতির বা বাংলা দেশের নিজস্ব সম্পৎ নহে ; এমন কি এই বর্ণমালার একটি বর্ণও বাংলার নহে। বাংলা তাহার ভাষার ষোল আনা না হইলেও, অন্ততঃ পনের আনা তিন পয়সা উত্তর-ভারত হইতে লাভ করিয়াছে,---এই কথা সর্ববিদিত। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পৈতৃক-উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তর-ভারতীয় বর্ণমালাও লাভ করিয়াছি। এই বর্ণমালার মূল, অশোক-লিপিতে ধৃত ব্রাহ্মী-বর্ণমালা। সংস্কৃত-ভাষাও দেবনাগরীরূপে এই ব্রাহ্মী-অক্ষরকেই গ্রহণ করিয়াছে। আমরা আমাদের ভাষায় উত্তর-ভারতীয় প্রাকৃত অপভ্রংশ যেমন গ্রহণ করিয়াছি, সংস্কৃত-ভাষাও তেমন সমানতালে দুই হাতে বরণ করিয়াছি। তাহার ফলে, মূল ব্রাহ্মী বর্ণমালার রদবদল করা ভাষায় সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান বাংলা-ভাষায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভাব পূর্ব হইতে কোন অংশে কম ত নহেই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশি এবং বেশি বলিয়াই বাংলা-ভাষা বর্তমানে এত জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। নূতন ভাব-প্রকাশক কোন শব্দ এখনও আমদানি করিতে হইলে বাংলায় সংস্কৃত ধাতু হইতে তৈয়ারী শব্দ যেমন খাপ খায়, অন্য কোন শব্দ তেমন খাপ খায় না। বাংলা-ভাষায় যদি পরিভাষার সৃষ্টি করিয়া ভাষাকে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত করিতে হয় এবং ভাষাকে যদি আরও বহুপ্রকারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়, তবে এখনও ভাষাগত সুবিধার জন্য, ভাব-প্রকাশের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য, সংস্কৃত-ভাষার শরণাগত না হইয়া গত্যন্তর নাই বলিয়াই আমার ধারণা।

এমন অবস্থায় বাংলা-বর্ণমালা-সংস্কার, বনাম বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা হ্রাস করা যায় কি না, সে-বিষয় আমাদের ধারণারও অতীত। তৎসম শব্দের বানান-বিকৃতি ঘটাইবার অধিকার আমাদের আছে কি না, তাহা কে বলিবে? অধিকার যদি সাব্যস্তও হয়, তাহাতে দৃষ্টির দিক হইতে ভাষা বুঝিবার যে গোলযোগ ঘটিবে, ভাষার রাজ্যে যে-অরাজকতা ঘটিবে, তাহাকে কিভাবে সামাল দেওয়া যাইবে, তাহার কোন উপায় আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিতে চায় না।

বাংলা-বর্ণমালার সংস্কার দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বাংলা সংযুক্ত অক্ষর, দোতালা-তেতালারূপে সুসজ্জিত অক্ষরেরও সংস্কার সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু, বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমানো যায় কি না, তাহাই ভাবিবার বিষয়। কেননা. বর্ণমালার বা সংযুক্ত অক্ষরের দৈহিক আকৃতি-সংস্কার এক ব্যাপার, বর্ণমালার সংখ্যা-হ্রাস করিয়া ইহার সংস্কার সাধন অন্য ব্যাপার। বাংলা-ভাষার বর্ণমালার আকৃতি-সংস্কার যুগে যুগে হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিখিত বাংলা-পুঁথি দেখিলেই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সেইদিনও ছাপার কাজের সুবিধার জন্য স্বনামখ্যাত "আনন্দ-বাজার-পত্রিকা" বাংলা ছাপার অক্ষরের, বিশেষ করিয়া সংযুক্ত অক্ষরের আকৃতি-সংস্কার করিয়াছেন। কিন্তু, বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। যাহা আজ পর্যন্ত হয় নাই, তাহা যে হইতে পারে না বা কখনও হইবে না, তাহা বলার মত ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তবে, তাহা এখন সম্ভবপর কি না, সে প্রশ্ন মনে দারুণভাবে জাগ্রৎ হওয়া স্বাভাবিক।

এইখানে, এক ভাষার বর্ণমালাকে অন্যভাষার বর্ণমালায় লেখার অর্থাৎ প্রত্যক্ষরীকরণের (Transliteration) কথা উঠিতে পারে। যে-ভাষায় মৌলিক-বর্ণ বা আসল-হরফ কম, সে-ভাষায় অধিক সংখ্যক বর্ণযুক্ত ভাষাকে লিখিয়া দিলে, তথাকথিত বানান ও বর্ণ-বিভ্রাট কমিয়া যায় বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা থাকিতে পারে। বোধ হয়, এইরূপ কোন ধারণার বশবর্তী হইয়াই খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে, বাংলার কতিপয় মুসলমান আরবীহরফে বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। এই জাতীয় কয়েকটি পুঁথি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তাহাতে বাংলা-ভাষার লিখন-রীতির যে-দুর্ভোগ ঘটিয়াছে তাহা বলিবার নয়। বাংলায় ইহা চলিল না। এই সেই দিনও (মাত্র আট-দশ বৎসর আগে), চট্টগ্রাম

হইতে মৌলবী জুলফক্কার আলী সাহেব আবার বাংলা-হরফের পরিবর্তে আরবী-হরফে বাংলা লিখিবার চেষ্টা পান এবং স্বয়ং অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া আপন খেয়াল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেও, কেহ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বিশেষ কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, এইরূপ ব্যাপার বাংলায় চলে না। কারণ, কেহই এখন নূতন করিয়া বাংলায় হিন্দী এবং উর্দূর অপ্রীতিকর বিবাদ সৃষ্টি করিতে রাজী নহে বলিয়াই মনে হয়।

বাংলাকে আন্তর্জাতিক ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য, কেহ কেহ বাংলা-ভাষাকে Romanize বা ইংরাজী-হরফে লেখারও পক্ষপাতী। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা দেখা যায় নাই। সুতরাং, এ-বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। তবে, বাংলাকে Romanize করিলে বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমিবে না; কেননা বিশিষ্ট বিশিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করার ফলে, ইংরাজী বর্ণমালার সংখ্যা তাহাতে যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।

আশা করি, এখন দেখা যাইবে, উক্ত ত্রিবিধ সংস্কার এক ব্যাপার নহে। ভাষার সহিত এই ত্রিবিধ সংস্কারের একটি সাধারণ যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের সংস্কারের জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। এই নীতির আবিষ্কার করিতে হইলে, ভাষার প্রকৃতি, গতি ও প্রগতির বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিতে হইবে; অন্য কথায়, ভাষার প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্তমান অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির প্রতি নিয়মানুবর্তিতামূলক নৈষ্ঠিক-দৃষ্টি রাখিয়া আবিষ্কর্তাকে অগ্রসর হইতে হইবে; নতুবা কাজ হাসিল হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই কম বলিয়া মনে হয়। এমন কি, বিপন্ন ও বিব্রত হইবার আশঙ্কাও যে ইহাতে খুব কম আছে, তাহা নয়। এই সমস্ত ব্যাপারে নিতান্ত সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হয় এবং মনে রাখিতে হয়:---

"ভাবিয়া যে করে কাজ সুখ তার হয়।
না ভেবে করিলে কাজ মরণের ভয়।।"

আলোচ্য পুস্তিকাখানির আলোচনার ভূমিকারূপে উপর্যুক্ত বিষয় কয়টি নিবেদনের পর, এইবার আমরা এক-একটি করিয়া প্রস্তাবগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(ক) বাংলা-ভাষা-সংস্কার

প্রথমতঃ, বাংলা-ভাষা-সংস্কার-সম্বন্ধেই আলোচনা করা যা'ক। বাংলা-ভাষার সংস্কার আবশ্যক ; সে-সম্বন্ধে বাংলার চিন্তাশীল লেখক ও পাঠকদের মধ্যে দ্বিমত আছে বলিয়া মনে হয় না। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছর হইতে বাঙালী এই সংস্কারের আবশ্যকতা অতিমাত্রায় অনুভব করিতেছেন। তাহার ফলে, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া চুনোপুঁটিটি পর্যন্ত সকলেই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে-রূপেই হউক, বাংলা-ভাষার সংস্কারে অল্প-বিস্তর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। প্রকাশ-ভঙ্গির উৎকর্ষ-সাধনে, ভাব-প্রকাশের প্রাচুর্যে, ভাষার গতিবেগ-বর্ধনে, উন্নত ভাষাসমূহের বিবিধ সম্পদ্-আহরণে, সহজ-সরল-ক্ষমতাশালী বাংলা-কথার প্রচলনে, বাংলা-বাগ্বিধি (idioms), বাক্যাংশ (phrases) পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি (syntax) এবং প্রবাদ ও প্রবচন প্রভৃতির সমাবেশে, ভাষাকে সুস্পষ্ট ও সমৃদ্ধ করিতে করিতে ভাষার যে-সংস্কার বাঙালী এ-পর্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফলেই, প্রস্তাবক মহোদয় বলিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার বৈজ্ঞানিক-বিষয়-সম্বলিত পুস্তক-প্রণয়নে বক্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া, তাঁহাকে বিশেষ কোন ভাষাগণ সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা বোধ করিতে হয় নাই, এবং বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিবার মত পারিভাষিক শব্দ বাংলায় বিদ্যমান নাই বলিয়া যে ভ্রান্ত-ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার সময় আসিয়াছেন। বলিতে কি, আমরাও বাংলা-ভাষার সংস্কারপন্থী এবং মনে-প্রাণে ইহার অধিকতর সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করি। কিন্তু, আমরা কর্মক্ষেত্রে যেমন বিপ্লববাদী নহি, ভাষা-সংস্কারের ক্ষেত্রেও তেমন বৈপ্লবিক মানসিকতা পোষণ করি না। ভাষার প্রাচীন ইতিহাস, বিবর্তনের ধারা, গতি-প্রকৃতি, নাড়ী-নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া, যাহাতে ইহার নিয়মতান্ত্রিক প্রগতির পথ ব্যাহত না হইয়া বরং খোলসা হয়, তজ্জন্য আমরা চিরদিনই সচেষ্ট ও সমুৎসাহী। যিনিই ভাষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেই হইবে ; নতুবা পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রস্তাবক মহোদয় ইংরাজী-ভাষা হইতেই তাঁহার মাতৃভাষা বাংলার সংস্কার-সাধনে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে ইহা এইরূপ,--"ইংরাজী-ভাষার সংস্কার-প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমেরিকায়

বানান-সমস্যার সমাধান করিবার আন্তরিক ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পও দেখা যাইতেছে। এমন কি, সহজবোধ্য Basic English-এর প্রচলন-প্রচেষ্টায়ও বহুলোক আগ্রহশীল। এইরূপ আগ্রহ আধুনিক যুক্তিবাদী মানব-মনে স্বতঃই স্ফূর্ত হইবার কথা।" এই উক্তিতে দুইটি সংস্কারের কথা---ভাষা ও বানান-সংস্কারের কথার উল্লেখ আছে; বর্ণমালার সংখ্যা-সংস্কারের কথার কোন উল্লেখ নাই। বানান-সংস্কার-সম্বন্ধে আলোচনা-কালে আমরা ইংরাজী বানান-সংস্কারের কথা উল্লেখ করিব।

ইংরাজী-ভাষার সংস্কারের চিন্তা না করিয়াও, আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীর সমস্ত জীবন্ত, জাগ্রত ও চালু ভাষার সংস্কার চলিতেছে। হিব্রু, গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃতের ন্যায় যে-ভাষা মৃত-ভাষারূপে পরিণত হয় নাই, সেই ভাষা ঐ ভাষাভাষী লোকের জীবনের পারিপার্শ্বিকতা, জীবন-যাপন-প্রণালী, মানসিক চিন্তাধারা ইত্যাদির অর্থাৎ এক কথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সংস্কৃত হইতে বাধ্য হইতেছে। আজ পর্যন্ত শুধু কুর্‌আন ও হদীথ্ যেই আরব-জাতির আদর্শ, সেই আরব-জাতির ভাষাও কুর্‌আন-হদীথের ভাষা হইতে আরব ও মিশরে সংস্কৃত হইয়া চলিয়াছে। বাংলা-ভাষাও সংস্কৃত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইংরাজী-ভাষা-সংস্কারের রূপ নির্দেশ করিতে গিয়া, প্রস্তাবক মহোদয় বলিতেছেন, সহজবোধ্য "মৌলিক-ইংরাজীর" (Basic English) প্রচলন-প্রচেষ্টায়ও বহুলোক আগ্রহশীল। আমরা বলিব, আমরাও "মৌলিক-বাংলার" (Basic Bengali) প্রচলনে বিশেষ আগ্রহান্বিত। এ-বিষয়ে নূতন করিয়া যদি কেহ চেষ্টা পান, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে সমর্থনও সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

এইস্থলে মনে রাখিতে হইবে, Basic English যেমন ইংরাজী-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ সংস্কার নহে, তেমন ইংরাজী-শব্দের উৎকট ও উদ্ভট বানান বা বর্ণমালার সংখ্যা-হ্রাসমূলক সংস্কারও নহে। ইংরাজী ভাষায় I go, you go, he goes হয়। Basic English ইংরাজী-ভাষার সংস্কার হইলেও, তাহাতে he goes-এর স্থলে I go এবং you go-এর ন্যায় he go হয় না। কেননা he goইংরাজী-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাহা হইলে, এই Basic English-এ ইংরাজী-ভাষার সংস্কার কি, সে-বিষয়ে প্রশ্ন হওয়া অতি স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজের কথায় না দিয়া,

১৯৪৩ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখের The Statesman পত্রিকার সম্পাদকীয় বীথিকায়, ঐ-পত্রিকার সম্পাদক Mr. Ivan Melville Stephens সাহেব যাহা এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"Basic English, to which Mr. C. K. Ogden has given many years of his life, is not a pidgin English, nor a substitute for literary English. It is English reduced to simple form for the use of all, so that people of different countries may have at command for international communication a language easily mastered, avoiding subtlety, yet adequate to the need. Those who do not know English can easily master Basic. Those who do know English can easily with a little practice reduce it to Basic. The simplest syntax, a vocabulary of 850 words with additiohal small vocabularies for special topics, a uniform and natural word order, are its characteristics, It avoids sophistication. In English the dog barks, the cow lows, the sheep bleats, the horse neighs, the cock crows. In Basic, they all make a noise.....................It lacks idiom but has simplicity and clarity. It does not puzzle the learner. And it has other virtues."

(অনুবাদ)

যে 'মৌলিক-ইংরাজীর' সাধনায় মিষ্টার সি, কে, ওগ্‌ডেন, তাঁহার জীবনের বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহা বাজারু ইংরাজী নহে ; ইহা পাণ্ডিত্যমূলক ইংরাজীর প্রতিনিধিস্থানীয়ও নয়। ইহা জন-সাধারণের ব্যবহারোপযোগী সরল আকারে পরিণত ইংরাজী। সূক্ষ্মভাবকে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগিতা বজায় রাখিয়া, যাহাতে সহজে আন্তর্জাতিক ভাব-আদান-প্রদানের জন্য জন-সাধারণ কর্তৃক ইচ্ছা মাত্রই ব্যবহৃত হইতে পারে, ইহা এমন এক সহজসাধ্য ভাষা। যাহারা ইংরাজী জানে না, তাহারা সহজেই 'মৌলিক-ইংরাজীকে' আয়ত্ত করিতে পারে।

আর যাঁহারা ইংরাজী জানেনই, তাঁহারা তো যৎকিঞ্চিৎ অভ্যাসের দ্বারাই সহজে ইহাকে 'মৌলিক-ইংরাজীতে' পরিণত করিতে পারেন। সহজতম পদ-বিন্যাস-প্রণালী, বিশিষ্ট প্রসঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট কতিপয় স্বল্পসংখ্যক শব্দ-সমষ্টির অতিরিক্ত ৮৫০টি শব্দ-সমন্বিত একটি শব্দ-কোষ, ব্যতিক্রম-বিহীন স্বাভাবিক শব্দ-বিন্যাস প্রভৃতিই ইহার বৈশিষ্ট্য। কোন প্রকারের অস্পষ্টতা ইহাতে নাই। পাণ্ডিত্যমূলক ইংরাজীতে কুকুর 'ঘেউ-ঘেউ' করে, গাভী 'হাম্বা-রব' করে, মেষ 'ভ্যা-ভ্যা' করে, অশ্ব 'হ্রেষা-ধ্বনি' করে, মোরগ 'বাঙ্' দেয়। 'মৌলিক -ইংরাজীতে' সমস্ত জানোয়ারের জন্যই 'ডাকা' শব্দ ব্যবহৃত হয়।-------এই ইংরাজীতে বাগ্বিধির ব্যবহার নাই, কিন্তু সারল্য ও সুস্পষ্টতা বিদ্যমান। ইহা শিক্ষার্থীকে বিব্রত করিয়া তোলে না। এতদ্ব্যতীত ইহার আরও বহু গুণ আছে।

বলিতে কি, এমন 'মৌলিক-ইংরাজীর' ন্যায় কোন 'মৌলিক-বাংলা' যদি কেহ আবিষ্কার করেন, তাহা বাংলা-দেশে আনন্দের সহিত অভিনন্দিত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় তাকাইয়া রহিয়াছি, যেই দিন এহেন 'মৌলিক-বাংলার' উদ্ভাবনে বাংলা-ভাষা বহুদূর সম্প্রসারী মূর্তি গ্রহণ করিবে। সেই দিন যেন বাংলা-ভাষার ইতিহাসে বিলম্বিত না হয়।

আলোচ্য পুস্তিকার প্রস্তাবগুলিতে ভাষা-সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাবের সংখ্যা দুইটি। প্রস্তাব দুইটির মধ্যে একটিকে পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে (৭ম প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)। অন্যটিকে প্রস্তাবক মহোদয় 'অনুনাসিক স্বর'-সম্বন্ধীয় বক্তব্যের সহিত উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন (নবম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার সপ্তম প্রস্তাব **"লিঙ্গ-বিভ্রাটের"** কথাই ধরা যাক। এই সম্বন্ধে তিনি যে-প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :---

"ভাষা হইতে লিঙ্গভেদ **যথাসম্ভব** উঠাইয়া দিতে হইবে। যথা :—
পাঠক, শিক্ষক, শ্রোতা, সভ্য, সুন্দর বালিকা।"

এইস্থানে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই, উক্ত প্রস্তাবে লিখিত **'যথাসম্ভব'** শব্দের সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং, প্রস্তাবক মহোদয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। উদাহরণ গুলিতেও বিভিন্ন শ্রেণীর লিঙ্গনির্দেশক শব্দ রহিয়াছে বলিয়া তদ্দ্বারাও কোন নির্দিষ্ট ধারণা করা কঠিন।

লিঙ্গভেদ পৃথিবীর সকল ভাষায় বর্তমান; বাংলা-ভাষায়ও আছে। বাংলা-ভাষা হইতে যদি পাঠকের স্ত্রীলিঙ্গ 'পাঠিকা', শিক্ষকের স্ত্রীলিঙ্গ "শিক্ষিকা", শ্রোতার স্ত্রীলিঙ্গ "শ্রোত্রী" এবং সভ্যের স্ত্রীলিঙ্গ "মহিলা-সভ্য" বাদ দেওয়া হয়, তবে ঐ-শ্রেণীর অর্ধেক বাঙালীর কথা কি পুরুষ বাঙালীকে ভুলিয়া যাইতে হইবে? এইসব ব্যাপারে বাঙালী কি তাঁহাদের মনোভাব পূর্ণমাত্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন না? ভাষা হইতে বিশিষ্ট মনোভাবপ্রকাশ শব্দকে এইরূপে নির্বাসিত করিয়া, ভাষাকে পঙ্গু করিয়া দিয়া, ইহার সংস্কার করা চলে না। কেননা, মনোভাবের সম্যক্ অভিব্যক্তির জন্যই ভাষার সৃষ্টি।

বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী, এই চারি প্রকারের শব্দের মধ্যে, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের লিঙ্গ অর্থানুসারে নির্ণীত হয়; কেবল তৎসম শব্দের লিঙ্গ সর্বত্র অর্থানুসারে হয় না, অনেক স্থলে অভিধান অনুসারেই লিঙ্গ স্থির করিতে হয়; কারণ সংস্কৃত-ভাষায় শব্দের লিঙ্গ ঐরূপেই নির্ণীত হয়। আমার মনে হয়, যদি বাংলা-ভাষায় কোন প্রকারের লিঙ্গ-সংস্কার সম্ভবপর হয়, তবে এই তৎসম শব্দের লিঙ্গ-নির্ণয়ের দিক হইতেই সম্ভবপর হইবে। কারণ, "কামার" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ যদি "কামারনী" হয়, তবে "চাতক" শব্দের চালু স্ত্রীলিঙ্গ "চাতকিনী" ব্যতীত সংস্কৃতমূলক "চাতকী" চলিবে না,---এইরূপ কোন কোন নিয়ম করা চলিতে পারে।

শব্দগত লিঙ্গভেদ-সম্বন্ধে ইত্যধিক কিছু বলা চলে না। শব্দগত লিঙ্গভেদ ব্যতীত বাংলা-ভাষায় পদ-বিন্যাস-প্রণালীগত (Syntactical) লিঙ্গভেদও কিছু আছে। আরবী, সংস্কৃত ও আধুনিক উর্দু তথা হিন্দী ভাষায়, এইরূপ লিঙ্গভেদের ব্যাপার উৎকটরূপে রহিয়াছে। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সংখ্যা, কারক প্রভৃতির উপর লিঙ্গের প্রভাবে, এই সমস্ত ভাষা আয়ত্ত করা বিদেশীর পক্ষে সত্যই কষ্টকর। তবে, এই দিক হইতে বাংলা-ভাষার অবস্থা অনেক উন্নত ও সরল। কেননা, বাংলার বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ-বিন্যাসের ব্যাপার ব্যতীত, অন্য কোন ব্যাপারে লিঙ্গের কোন প্রভাব নাই। এই ব্যাপারে বাংলা আপনা হইতেই সুসংস্কৃত হইয়া আসিতেছে। বাংলা-ভাষায় তৎসম শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দের বেলায়, বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ পায় না। এই জন্য খাস বাংলায়---

সুন্দর বৌ, সুন্দর মেম,
সুন্দর খুকী, সুন্দর গাই, সুন্দর ভাষা,
না বলিয়া যদি কেহ পাণ্ডিত্য ফলাইতে গিয়া বলিয়া বসে,
সুন্দরী বৌ, সুন্দরী মেম,
সুন্দরী খুকী, সুন্দরী গাই, সুন্দরী ভাষা,

তবে, সে মানুষের নিকট নিশ্চয় হাস্যাস্পদ হইবে। আজকাল বাংলা-ভাষার সকল ব্যাকরণে আমাদের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে। তৎসম শব্দের বেলাও সর্বত্র বিশেষণ বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসরণ করে না। এই জন্যই কোন বাঙালী এখন "সুন্দর লতা" না বলিয়া বা না লিখিয়া "সুন্দরী লতা" লিখে না বা বলে না। বাংলা-ভাষায় প্রাণিবাচক তৎসম ব্যতীত অপ্রাণিবাচক তৎসম শব্দকে লিঙ্গ-সাধন-ব্যাপারে বাংলা-শব্দের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা প্রবণতা এইদিকেই বেশী। তাই এখন আমরা 'গভীরা নদী" না বলিয়া বা লিখিয়া "গভীর নদীই" বলিয়া থাকি বা লিখিয়া থাকি। এইরূপ ক্ষেত্রে, বিশেষণটিকে যখন বিশেষ্যের পরে বসাই, তখন তো বিশেষণটিকে স্ত্রীলিঙ্গ-রূপে ব্যবহার করিবার কথা ভাবিতেই পারি না। আমরা আজ পর্যন্ত কখনও কোন বাঙালীকে "নদীটি গভীর" না বলিয়া "নদীটি গভীরা" বলিতে শুনি নাই। এইসব দিক হইতেই ভাষাকে সংস্কার করা যাইতে পারে। প্রস্তাবক মহোদয়ের ন্যায় এলোমেলোভাবে লিঙ্গ-সংস্কার করা চলে না।

ভাষা-সংস্কারমূলক দ্বিতীয় প্রস্তাব করিতে গিয়া প্রস্তাবক মহোদয় বলিতেছেন, বাংলা-ভাষা হইতে সম্ভ্রমাত্মক পদ এবং সম্ভ্রমাত্মক অনুনাসিক স্বর উঠাইয়া দিতে হইবে। এই বিষয়ে বক্তব্য তিনি যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :----

"সম্ভ্রমাত্মক" ব্যবহারে আবার আর এক মুশ্‌কিল হইয়াছে। ইংরাজীতে পাপাচারী দুর্বৃত্ত হইতে লইয়া যীশুখ্রীষ্ট, সম্রাট্‌, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ছোট বড় সকলের জন্যই He বা They কথা ব্যবহৃত হয়। আরবী, ফার্‌সীতেও পয়গম্বর ও শয়তান উভয়ের জন্য 'বলে, করে, যায়' ইত্যাদি বলা হয়। অথচ 'তিনি, তাঁহারা, কাঁহারা, যাঁহারা, ইত্যাদির প্রচলনে আমাদের অনাবশ্যক শ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে। সম্ভ্রমের কথা

তুলিলেই উহা বাড়িয়া চলে।-----কর্মব্যস্ত জগতে বাহুল্যের অবকাশ নাই। বাবা, দাদা, বন্ধু সকলেই 'প্রিয়' সম্ভাষণেই সন্তুষ্ট।"

এখানেও প্রস্তাবক মহোদয়ের বক্তব্য একান্তই অস্পষ্ট। কর্মব্যস্ত জগতে বাহুল্যের অবকাশ নাই, স্বীকার করি। তাই বলিয়া কি কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিবার অবকাশও থাকিবে না? না থাকিলে নীরব থাকাই সমীচীন নয় কি? সম্ভ্রমাত্মক অনুনাসিক-স্বর ব্যবহারের অসংগতির উদাহরণ "তাঁহারা, যাঁহারা, কাঁহারা" চলে বটে, কিন্তু "তিনি" শব্দ কি করিয়া দেখানো যায়, তাহাই ভাবিবার বিষয়। ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে হইতেছে, ইংরাজীতে পাপাচারী দুর্বৃত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া যীশুখ্রীস্ট পর্যন্ত ছোট-বড় সকলের জন্য He বা They কথা যখন ব্যবহৃত হয়, তখন বাংলায়ও ছোট-বড় সকলের জন্য "সে" বা "তোমার" চলিবে না কেন, "তিনি" বা "তাঁহার"-এর প্রয়োজন কি? এইরূপ মনোভাবের ফলে, প্রস্তাবক মহোদয় সম্ভ্রমাত্মক অনুনাসিক-স্বর-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সম্ভ্রমাত্মক পদ বা শব্দের কথাও গোলে হরিবোল দেওয়ার মত এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়াছেন। অধিকন্তু, "প্রিয়" সম্ভাষণেই যখন বাঙালী মা-বাপ হইতে বন্ধু পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইবার "বাণী" শুনিতেছি, তখন ধরিয়া লইতে পারা যায়, শুধু সম্ভ্রমাত্মক অনুনাসিক-স্বর নয়, সম্ভ্রমাত্মক পদ বা শব্দ লইয়াও প্রস্তাবক মহোদয় এক মহা-মুশ্‌কিলে পড়িয়াছেন। সুতরাং বাংলা-ভাষা হইতে সম্ভ্রমাত্মক পদ এবং সম্ভ্রমাত্মক, অনুনাসিক-স্বর, এই দুইটিকেই উঠাইয়া না দিতে পারিলে আর কিছুতেই রক্ষা নাই।

এখন, বাংলা-ভাষা হইতে সম্ভ্রমাত্মক পদ (যেমন 'তিনি', 'আপনি', 'আপনার', 'ভবদীয়', 'শ্রীযুক্ত', 'বাবু', 'মৌলবী', 'মহাশয়', 'মহিময়', 'শ্রদ্ধাস্পদ', 'শ্রদ্ধার্ণব', -'এষু-' (পাদপদ্মেষু, চিরজীবিষু), -'সু'-(কল্যাণীয়াসু, নিরাপৎসু, ইত্যাদি, ইত্যাদি) এবং সম্ভ্রমাত্মক অনুনাসিক-স্বর (তাঁহার, কাঁহার, যাঁহার প্রভৃতি শব্দের ঁ চন্দ্রবিন্দু) বাদ দেওয়া যায় কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। প্রস্তাবক মহোদয় সুস্পষ্ট ভাষায় বলুন বা না বলুন, তিনি এইগুলিকেই ভাষা হইতে নির্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

তাঁহার মূল প্রস্তাবটিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, প্রধানতঃ ইংরাজী-ভাষা হইতেই তিনি উক্ত সংস্কারের প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার এই প্রেরণাটি ইংরাজী-ভাষার প্রকৃতির অপরিণত বোধ-

প্রসূত। ইংরাজী-ভাষাকে সমগ্রভাবে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া, সম্ভবতঃ সংস্কার-আগ্রহাতিশয্যে, তিনি এই ভাষার শুধু সর্বনাম পদ ও Dear শব্দ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। সত্য বটে, ইংরাজীতে He অথবা They প্রভৃতি শব্দে যীশুখ্রীস্ট হইতে শয়তান পর্যন্ত বুঝানো যায় ও হয়; সত্য বটে, Dear শব্দ মাতা-পিতা হইতে চাকর পর্যন্ত সঁকলের জন্য ব্যবহৃত হয়; সত্য বটে, সম্ভ্রম জ্ঞাপনের জন্য ইংরাজীতে অনুনাসিক-স্বর ব্যবহৃত হয় না। তাই বলিয়া কি ইংরাজী-ভাষায় সম্ভ্রমাত্মক কিছু নাই? ইংরাজীতে God লিখিতে G টি বড় হাতের অক্ষর হয় কেন, কিংবা God কে He দিয়া বঝাইতে গেলে H বড় হাতের হয় কেন? His Majesty, His Excellency, His Holiness, His Exalted Highness, Honorable, The Right Honourable, Your honour, Mr., Esquire, ইত্যাদি ইত্যাদি কি ইংরেজী-ভাষার সম্ভ্রমাত্মক কথা নয়? ইংরাজীতে সম্ভ্রমাত্মক কথা বা শব্দের এত বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও, সর্বনাম পদে কোন প্রকারের গোল নাই কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই, ইহা ইংরেজী-ভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এইরূপ না হইলে ইংরাজী ভাষা হয় না। মধ্যম পুরুষের যে-কোন সাধারণ লোককে ইংরাজীতে you বলা চলে বটে, কিন্তু রাজাকে Your Majesty এবং লাট-সাহেবকে Your Excellency, এমন কি আমাদের দেশের পুলিস-সাহেবকেও Your honour অন্ততঃ Sir না বলিলে রক্ষা নাই। তবে, ইংরাজীতেও শুধু you দিয়া চলিল কোথায়? He দিয়াও ঠিক তেমনই সর্বত্র চলে না। কেননা, ইংরাজী-ভাষা সম্ভ্রমাত্মক ভাববিবর্জিত ভাষা নহে।

মোটের উপর, ভাষার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসারে যেখানে যাহা চলে, সেখানে তাহা চালাইতে হয়; না চালাইলে ভাষা হয় না। ভাষায় সম্ভ্রমাত্মক কথা বা শব্দের ব্যবহার জাতির সংস্কৃতিগত রুচির পরিচায়ক। জাতীয় জীবনে সামাজিক মর্যাদাজ্ঞাপক ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই, ভাষায় সম্ভ্রমাত্মক পদ বা স্বরের রীতি বর্তমান আছে। যে-জাতির মধ্যে মান-সম্ভ্রম, আদব-কায়দা আছে, সে-জাতির ভাষায় সম্ভ্রমপ্রকাশক উপযুক্ত শব্দ থাকিবেই। জাতীয় জীবনে সামাজিক চিন্তা-ধারার পরিবর্তন না ঘটিলে, ভাষায় সম্ভ্রম-প্রকাশক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন ঘটান সম্ভবপর নয়। মনে রাখিতে হইবে, পৃথিবীর একভাষার ছাঁচে অপর ভাষাকে

চালাই করা যায় না ; ইংরাজী ভাষা ইংরাজীই, আর বাংলা-ভাষা বাংলাই। বাংলা-ভাষাকে জোর করিয়া ইংরাজীর মত করিতে গেলে, বাংলা-ভাষার বাঙালীয়ানাই চলিয়া যাইবে। বাঙালীর জাতীয় জীবনে সমাজ-ব্যবস্থার যে-ধারা চলিয়া আসিয়াছে ও চলিতেছে, তাহার স্তরে-স্তরে মর্যাদাজ্ঞাপক ব্যবস্থা রহিয়াছে ; যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা না ভাঙিয়া যায়, ততদিন অবধি ভাষা হইতে সম্ভ্রমাত্মক পদ ও অনুনাসিক স্বর বর্জন করা যাইবে না বা যাইতে পারে না। এই সত্যটি কয়েকটি সহজ উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যথা :----

আমি ও আমার চাকরের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার বাঁধ বর্তমান। এই বাঁধ না ভাঙিয়া চাকরটি আমার প্রতি মর্যাদা প্রকাশ করিতে গিয়া বলে বা লেখে, "আপনি কখন আসিবেন?" আর আমি তাহাকে বলি বা লিখি, "তুই কখন আসিবি?" এইরূপে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে-সম্ভ্রম প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা এখনও পরিবর্তিত হয় নাই এবং শীঘ্রই পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখিতেছি না। একবার আপনারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন, যদি আপনাদের চাকরগুলি একদিন হঠাৎ নূতন সংস্কার প্রমত্ত হইয়া আপনাদিগকে বলিয়া বসে, "বাইরে যাচ্ছিস্, কিন্তু তুই কখন ফিরে আস্‌বি তা'ত বল্‌লি না"------তবে আপনাদের পরিবারে কেমন একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়া যাইবে। অথবা, প্রস্তাবক মহোদয়ের মতে "তিনি আসিবেন" কথার কিছুটা রাখিয়া কিছুটা ছাড়িয়া যদি কেহ "সে আসিয়াছেন" বলে, তখন দুর্ভাগ্য বশতঃ বক্তার চেহারা না দেখিয়া শুধু গলার আওয়াজ শুনিলে মনে হইবে, নিশ্চয় কোন সাহেবের (বাঙালীর নয়) মুখে বাংলা শুনিতেছি। এইরূপ হয় কেন? কারণ, বাংলা-ভাষা বাঙালীর মুখে অমনটি হয় না----ইহা বাঙালীর ভাষাই নহে। ইংরাজীর বেলায়ও তদ্রূপ। এই ভাষায় He goes না বলিয়া He go বলিলে ভাষাই হয় না। বলাবাহুল্য, "সে আসিয়াছেন" বাক্যটি যেমন বাঙালীর নিকট একটি হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার, ঠিক তেমনই "তাহারা আসিয়াছেন" বাক্যও একটি হাস্যজনক কথা।

এইখানেই বলিয়া দিতে হয় যে, ইংরাজী-ভাষায় সম্ভ্রমাত্মক ব্যাপার বুঝিতে গিয়া প্রস্তাবক মহোদয় যে ভুল করিয়াছেন, আরবী ও ফারসী-ভাষার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে গিয়াও তিনি সেই একই ভুল

করিয়াছেন। আরবী ও ফার্‌সী-ভাষায় সর্বনাম পদে সম্ভ্রমাত্মক পদ নাই বটে, কিন্তু ভাষাদ্বয়ে সম্ভ্রমসূচক পদ ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। 'হজরৎ', 'জনাব', 'হুজুর', 'জাঁহাপনা', 'খোদাওন্দ' প্রভৃতির ন্যায় অতি সাধারণ সম্ভ্রমাত্মক পদের কথা কি করিয়া তিনি ভুলিয়া গেলেন, তাহাই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

মোটের উপর, সম্ভ্রমাত্মক পদাদি-বিবর্জিত ভাষা, কোন সুসভ্য ও সুসংস্কৃত জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কি না, তাহা আমরা আজ পর্যন্ত জানি না। বাংলা-ভাষায়ও যদি সম্ভ্রমাত্মক পদাদি থাকে, তাহাতে মুশ্‌কিলে পড়িবার বা তাহাকে একটি বিভ্রাট বলিয়া মনে করিবার কারণ কি, তাহা বুঝা যায় না। তবে, বর্তমান বাংলায় ব্যবহৃত সম্ভ্রমাত্মক পদাদি অন্যান্য সুসভ্য জাতির ভাষার তুলনায় অধিক কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয় বটে। যে-ইংরেজী ভাষা আমাদের প্রস্তাবক মহোদয়কে বিভ্রান্ত করিয়াছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে যে-আরবী ও ফার্‌সী-ভাষার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের তুলনায় সম্ভ্রমাত্মক বিষয়ে বাংলা-ভাষা যে অত্যন্ত সরল ও সহজ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরাজী-ভাষার কথাই ধরুন না কেন। রাজার জন্য এক প্রকারের, মন্ত্রীর জন্য অন্য প্রকারের, বিচারকদের জন্য আর এক রকমের, পাদ্রী-সাহেবদের জন্য ভিন্ন ধরনের লাট-সাহেব, রাজা, মহারাজা, বিভিন্ন পদের বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের সম্ভ্রমাত্মক পদ এই ভাষায় রহিয়াছে। শতকরা ৯৯ (নিরানব্বই) জনের অদৃষ্টে জীবনে এই সমস্ত সম্ভ্রমাত্মক পদের কয়টি ব্যবহার করিতে হয়, বলা কঠিন। অথচ ইংরাজী-ভাষা শিখিবার বেলায় ইহার কিছু ঘাট্‌তি পড়ে না, লিখিবার বেলাও গৌরব বোধ করা হয়। বাংলা-ভাষার বেলায় এইরূপ একটি বিশিষ্ট শব্দও আছে কি? ইংরাজী-ভাষায় সর্বনাম পদে সম্ভ্রমাত্মক পদ নাই বটে, কিন্তু সম্ভ্রমবাহুল্যে তাহা কণ্টকিত হইয়া, অসংখ্য ধরনের সম্ভ্রমাত্মক পদের সৃষ্টি হওয়ায়, সর্বনাম পদের সারল্য ভাষা হইতে বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়াছে। বাংলা-ভাষায়, মধ্যম পুরুষে 'আপনি' 'আপনাদের' এবং নাম পুরুষে 'তিনি', 'যিনি', 'ইনি', 'উনি,' প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন সম্ভ্রমাত্মক পদ ব্যতীত অন্যান্য বিভক্তিতে পদের আদি, ব্যঞ্জন-বর্ণে একটি চন্দ্রবিন্দুর যোগ হইয়া থাকে। সম্ভ্রমাত্মক পদ কর্তৃ-কারকে ব্যবহৃত হইলে ক্রিয়ায় '-এন' বিভক্তির যোগ হয়। বাংলার ন্যায়

পৃথিবীর সপ্তম স্থানীয় (ভাষাভাষী লোক সংখ্যানুসারে) একটি সুসভ্য পরিমার্জিত, সমুন্নত ভাষায় যদি সম্ভ্রমাত্মক উক্ত কয়েকটি বিভিন্ন সর্বনাম পদ এবং ব্যবহার-বিধি বর্তমান থাকে, তাহাতে বিভ্রাট ঘটিবার কারণ যেখানে ঘটিবে, সেখানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের কাছে না দিয়া, মনো বৈজ্ঞানিকের কাছে পাঠানো যাইতে পারে।

বাংলা-ভাষায় সম্ভ্রমাত্মক সম্ভাষণের সংখ্যা কত অল্প, তাহা বাঙালী মাত্রেই অবগত আছেন। তৎস্থলে, ইংরাজী সম্ভ্রমাত্মক সংখ্যা কত বেশী, তাহা আমার উক্তিতে কাহারও বিশ্বাস না হইলে, আধুনিক সংস্করণের Chambers's Twentieth Century Dictionary-এর পরিশিষ্ট Correct ceremonious forms of address-এর যে-লিষ্টি সংযোজিত হইয়াছে, তাহা তিনি একবার দেখিয়া লইতে পারেন। বাঙালীকে গুরুজনের নিকট পত্র লিখিতে গিয়া কখনও "সম্মান পুরঃসর নিবেদন" বলিয়া পত্র আরম্ভ করিতে হইত, কিংবা বাঙালী বাবা, দাদা, বন্ধু সকলেই আজ "প্রিয়" সম্ভাষণেই সন্তুষ্ট (বাংলা ভাষা সংস্কার পুস্তিকার ১০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এমন কথা স্বপ্নের মত আজ প্রথম শুনা গেল। আমরা জানি, ইংরাজীতে লাট-সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন পদগ্রস্ত ব্যক্তি পর্যন্ত যেমন উচ্চ-নীচ পদনির্বিশেষে চিঠি-পত্রে "I have the honour to— " গৎ গাহিয়া সরকারী চিঠি-পত্র আরম্ভ করেন, বাঙালীও তেমনই নিমন্ত্রিতের সামাজিক পদ-মর্যাদা-নির্বিশেষে বিবাহাদির নিমন্ত্রণ-পত্রে "বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন" নামক গৎ লিখিয়া এখনও বক্তব্য আরম্ভ করেন। কোন গুরুজনের নিকট এই গৎ কখনও লিখিতে হইত বা এখনও লিখিতে হয় বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইংরেজী "Dear friend" জাতীয় সম্ভাষণের অনুকরণে আজকাল বাংলা-অনভিজ্ঞ ইংরেজীনবিস অথবা ইংরাজীনবিস বাংলা লেখকের মধ্যে "প্রিয় ডাক্তার বাবু" "প্রিয় মহাশয়" "প্রিয় বন্ধু" জাতীয় বর্ণসংকর বাংলা-সম্ভাষণ, বর্ণসংকর ইংরাজের ন্যায়, কুত্রাপি দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহা বাংলা-ভাষার অঙ্গীভূত সম্ভাষণরূপে পরিগণিত বলিয়া সর্ববাদিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে কি? কোন ইংরেজী ভাবাপন্ন বাঙালী সন্তান আজ যদি তাহার পিতার নিকট বাংলায় পত্র লিখিতে গিয়া "প্রিয় বাবা" অথবা 'প্রিয় পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করে, তাহার পিতা তাহাকে সন্তান-

বাৎসল্যবশে হয়তো ত্যাজ্যপুত্র করিবেন না, কিন্তু সে-সন্তান যে কুপুত্র বা কুলাঙ্গার, এই কথা ক্ষোভে ও দুঃখে প্রকাশ করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবেন।

তবে, বাংলা-ভাষায় পত্রাদিতে সম্ভাষণাদি ব্যবহারের প্রকৃতি কিরূপ? এ-প্রকৃতির সহিত ইংরেজী-ভাষার প্রকৃতির বিশেষ মিল নাই। চিঠি-পত্রাদি মূলতঃ সামাজিক ব্যাপার বলিয়া, সমাজের মধ্যে যেমন রীতি-নীতির প্রচলন আছে, তাহার অভিব্যক্তি ভাষার মধ্য দিয়া চিঠি-পত্রাদিতেও দেখা দিয়া থাকে। বাংলা-ভাষায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বাঙালীর সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠগণকে কনিষ্ঠগণ কখনও নাম ধরিয়া সম্বোধন করে না, চিঠি-পত্রেও নয়। সেই কারণে, "শ্রদ্ধাস্পদেষু" "ভক্তিভাজনেষু" "পাক জনাবেষু" ইত্যাদি সম্ভাষণ লইয়াই এইরূপ পত্র আরম্ভ হয়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও "My dear Naren" বা "প্রিয়তম নরেন" জাতীয় সম্ভাষণ বাংলা-ভাষার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও, বাঙালী "প্রীতিভাজনেষু", "সুহৃদ্বরেষু", "বন্ধুবরেষু" দিয়া পত্র আরম্ভ করেন। বয়োজ্যেষ্ঠগণও কনিষ্ঠদের কাছে পত্রাদি লিখিতে গিয়া নাম ধরিয়া সম্বোধন করা বাঙালী-ভদ্রতা বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা "কল্যাণীয়েষু", "চিরকল্যাণীয়েষু" অথবা "কল্যাণীয়াসু" প্রভৃতি লিখিতেই ভালবাসেন। বিশ্বকবি স্বর্গত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি দেখিলেই বাংলা-সাহিত্যে পত্র লিখিবার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(খ) বাংলা-শব্দের বানান-সংস্কার

ইতঃপূর্বে বাংলা-শব্দের বানান-সংস্কার-সম্বন্ধে প্রবন্ধের গোড়ায় যে-সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে এই কথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, শব্দের বানান-সংস্কার এক ব্যাপার, আর ভাষা-সংস্কার অন্য ব্যাপার। ভাষায় পদ-বিন্যাস-প্রণালীঘটিত (Syntactical) সংস্কারের নামই 'ভাষা-সংস্কার' এবং শব্দের অক্ষর-বিন্যাস-প্রণালীঘটিত সংস্কারের নাম হইল 'বানান-সংস্কার'। এই দুই প্রকারের সংস্কার পরস্পর অনেকটা স্বাধীন—কোনটি কোনটির একান্ত সাপেক্ষ নহে। একটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্য বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়ার আবশ্যক বোধে নিম্নের উদাহরণটি উদ্ধৃত হইতেছে:—

মূলবাক্য----বিহঙ্গীটি উন্মাদিনীর ন্যায় সর্বসমক্ষে উপস্থিতা হইল।

(ভাষার পরিবর্তন)

১। উন্মাদিনীর ন্যায় বিহঙ্গিনীটি সর্বসমক্ষে উপস্থিত হইল।

২। বিহঙ্গিনীটি র্বসমক্ষে উপস্থিত হইল,— উন্মাদিনীর ন্যায়।

৩। বিহঙ্গিনীটি উপস্থিত হইল, সর্বসমক্ষে উন্মাদিনীর ন্যায়।

৪। সর্বসমক্ষে উন্মাদিনীর ন্যায় বিহঙ্গীটি উপস্থিত হইল।

(বানানের পরিবর্তন)

১। উন্‌মাদিনির নেয়ায় বিহংগিনিটি সর্‌ব সমকক্ষে উপস্‌থিতা হৈল। উপরের চারিটি বাক্যের যে-কোনটিকে যে-কোন প্রকারের পরিবর্তিত বানানে লেখা হউক না কেন, তাহাতে ভাষার কোন অঙ্গহানি হয় না; তবে লোকের পক্ষে বুঝিতে, পড়িতে ও উচ্চারণ করিতে কষ্ট হইতে পারে; বিকৃত উচ্চারণ ও বিকৃত অর্থগ্রহণের আশঙ্কাও যে খুব কম আছে, তাহা নয়। শব্দের বানান-পরিবর্তনে ভাষার কোন বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না বটে, তবে বোধকৃচ্ছ্রতা, পাঠকৃচ্ছ্রতা ও উচ্চারণকৃচ্ছ্রতা ঘটার ফলে, অনেক সময় ভাষা যে দুর্বোধ্য হইয়া উঠে না, তাহা বলিতে যাওয়া নিছক অপোক্তি (miss-statement) বই কি? এই কারণে, শব্দের বানান পরিবর্তন করিতে গেলে, যাহাতে তদ্দ্বারা বোধকৃচ্ছ্রতা, পাঠকৃচ্ছ্রতা ও উচ্চারণকৃচ্ছ্রতা না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। বোধকৃচ্ছ্রতার হাত হইতে বানানকে রক্ষা করিতে হইলে, শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া, তদনুরূপ যথাসম্ভব পরিবর্তন-দ্বারা সংস্কার না করিলে, গায়ের জোরে খেয়ালের বশে কোন সংস্কার করা চলে না। পাঠকৃচ্ছ্রতার হাত হইতে বানানকে রক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় হইল, মন্থরগতিতে বানান-সংস্কার করিতে হইবে। এই বিষয়ে বৈপ্লবিক হইতে গেলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। শুধু বাংলা-ভাষার নহে, পারিপার্শ্বিক আরও বহু ভাষার এবং এমন কি বহু বিদেশীয় ভাষারও ধ্বনি-বিজ্ঞান (Phonetics) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে, উচ্চারণ-কৃচ্ছ্রতার হাত হইতে বানান-সংস্কারকে মুক্ত রাখিতে পারা যায় কি না, সে-বিষয় বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুস্তিকায় বানান-সংস্কারের প্রস্তাবে উক্ত কোন প্রকারের বিচার-আলোচনা

স্থান পায় নাই। পুস্তিকাখানিকে পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক পন্থা সুচিন্তিতভাবে গৃহীত হয় নাই; তৎস্থলে অধিকাংশ ব্যাপারই খেয়ালী ও ভাবালুতাপ্রসূত। আমাদের এ-উক্তি আপ্তবাক্য নহে। নিম্নের আলোচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

কোন প্রকারের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। মাথায় খেয়াল চাপিলেই একটা কিছু করিয়া বসিতে হইবে, এ-ধারণা কবি ও উন্মাদের পক্ষেই শোভমান। আলোচ্য পুস্তিকায় বানান-সংস্কারের জন্য যে-সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে, সোজাসুজিভাবে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, এই প্রস্তাবগুলির পশ্চাতে যে-ধারণা ক্রিয়া করিয়াছে, প্রথমে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাতে প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই যে নিতান্তই খামখেয়ালী, তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

প্রথমতঃ শিক্ষায় গণতান্ত্রিক নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে, আজ বানান-সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পুলিস-সাহেবের নিজের ভাষায় এই কথা এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে,---"বাহন যতই জটিল হউক না কেন, প্রতিভার কাছে বাধা, বিপত্তি, জড়তা, জটিলতা কিছুই নহে। তেমনই মেধাবী বা অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থী শ্রেণীবিশেষের পক্ষেও উহা ততটা দুরায়ত্ত নাও মনে হইতে পারে। কিন্তু, মুশ্‌কিল হইয়াছে আধুনিক শিক্ষার্থী মণ্ডলের সম্প্রসারণ হওয়ায়; অর্থাৎ আজকাল শিক্ষার সংস্পর্শ লাভে সকলেই সমান অধিকারী এই মূলসূত্র গৃহীত হওয়ায় এখন আর বিদ্যালাভ শুধু শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া অধিকার নহে। ধনী, দরিদ্র, মেধাবী, অল্প-বুদ্ধি এবং জাতিবর্ণনির্বিশেষে জনসাধারণ ও মানব-শিশু শিক্ষার আলোকের প্রত্যাশা করে এবং করিবেই। তাই বানান বা ব্যাকরণ-বিভ্রাট উৎকট সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।" যদি গোড়াতেই গলদ থাকে, তবে মুশ্‌কিল আসান করার জন্য 'মুশ্‌কিল-আসানের' আবশ্যক; আমাদের মত আনাড়ীর পরামর্শে কতখানি কাজ হয়, বলা যায় না।

আজকাল রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন গণতান্ত্রিক নীতি স্বীকৃত হইয়াছে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমন গণতান্ত্রিক নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। আমরাও এই নীতির বিশেষ পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, এখানে "শিক্ষা" শব্দের

অর্থ অতি ব্যাপক ; ক্ষুদ্র "পুঁথিগত বিদ্যা" দ্বারা এই শিক্ষার ব্যাপক অর্থ প্রকাশিত হয় না। আলোচ্য পুস্তিকায় "শিক্ষার" অর্থ "বিদ্যালাভ" অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যালাভ (aquisition of literary education)। গণতান্ত্রিক নীতিতে স্বীকৃত যে-শিক্ষা, সে-শিক্ষা সর্বতোমুখী, সর্বসম্প্রসারী শিক্ষা। ইহাতে পুঁথিগত বিদ্যাও (literary education) আছে বটে, কিন্তু এই পুঁথিগত শিক্ষা ইহার সর্বস্ব নহে। পুঁথিগত বিদ্যাকে (literary education) গণতান্ত্রিক নীতির শিক্ষার সর্বস্ব বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে, প্রকারান্তরে ভাষা-শিক্ষাতে সকলের সমান অধিকার বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে, বানান-সংস্কার করিয়া ভাষাকে সোজা ও সরল করিবার কথা উঠানো হইয়াছে। বানান-সংস্কারে ভাষা সংস্কৃত হয় না, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রত্যেককে কোন-না-কোন প্রকারের শিক্ষা দিতে হইবে, এই নীতির স্বীকৃতিই শিক্ষায় গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ। শিক্ষা-বিষয়ক মনোবৈজ্ঞানিকের মতে, সকলের জন্য একই ধরনের পুঁথিগত বিদ্যা উপযোগী নহে ; বিভিন্ন শ্রেণীর মানব-শিশুর জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতে হইবে। যে-শিক্ষার দ্বারা (তাহা পুঁথিগত শিক্ষা হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই) মানব-শিশু সমাজের একজন useful member বা কাজের লোক হয়, তাহাই স্বকীয় বিশিষ্ট ক্ষমতা অনুসারে মানব-শিশুর প্রাপ্য। এই জন্য---

১। উচচ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় শিক্ষা হইবে, মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য।

২। অন্ধ, মূক, বধির প্রভৃতি শারীরিক বিকলতা (organic defect) বিশিষ্ট শিশুর শিক্ষা হইবে, এক প্রকারের।

৩। নির্বোধ, নিরেট-বোকা প্রভৃতির শিক্ষা হইবে, অন্য ধরনের।

মোটের উপর, সকলের জন্য একই সময়ে, একই প্রকারে এক জাতীয় শিক্ষা হইতে পারে না,---ইহাই শিক্ষাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানের সত্য। Literary education বা পুঁথিগত বিদ্যা তো সকলের জন্য নহেই---এই কথা রাজতান্ত্রিক যুগেই হউক আর গণতান্ত্রিক যুগেই হউক, সকল সময়ে সমানভাবে প্রয়োজ্য। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন সকল ছেলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সকল সভ্য দেশে রহিয়াছে। এই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যদৃচ্ছা বানান-সংস্কার করিয়া একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিতে হয়, এমন কথা

পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশের শিক্ষার ইতিহাসে পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তবে, Basic English বা 'মৌলিক-ইংরাজী' জাতীয় কোন প্রকারের সরল-সহজ-সুসংস্কৃত ভাষা, প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হইতে পারে। এইরূপ মৌলিক-ভাষা ভাষার সংস্কার বটে, শব্দের বানানের সংস্কার নহে।

শিক্ষাবিষয়ক মূল-নীতি সম্বন্ধে উক্তরূপ ঘোলাটে-ধারণা না থাকিলে কিংবা না করিয়া লইলে, সকলের শিক্ষার সুবিধা করিতে গিয়া, খেয়ালী উপায়ে বানান-সংস্কার পূর্বক ভাষাকে সহজ করিবার চিন্তা মনে উদিত হইতে পারে না। কেননা ইচ্ছানুরূপ বানান-সংস্কার করিয়া ভাষাকে যতই সহজ করিবার চেষ্টা করা হউক, ভাষা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সহজ হয় না; বাঙালীরা সংস্কৃত-ভাষাকে বাংলা-হরফে লিখিয়া-পড়িয়াও সংস্কৃত-ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, পারিতেছে না, পারিবেও না। আর যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করা হয় যে, বানানকে ইচ্ছামত সংস্কৃত করিয়া লইলে, ভাষাও সংস্কৃত এবং সহজ হইয়া যায়, তথাপি অন্ধ, বধির, মূক, বোকা, নিরেট-বোকা মানব-শিশু কি করিয়া সেই সহজ-করা ভাষা শিখিবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। যে-কোন প্রকারেই হউক, ইহাদের জন্য গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে এবং শিক্ষাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানের আবিস্কৃত সত্যানুসরণে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে, নতুবা ইহারা গণতান্ত্রিক সমাজে কাজের লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিক্ষায় গণতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ করিলে, অর্থাৎ শিক্ষার শুধু বিদ্যার নয়, সর্বতোমুখী শিক্ষার) সংস্পর্শ-লাভে সকলেই সমান অধিকারী এই মূল সূত্র গৃহীত হইলে, বানান-সংস্কার করিতে হইবে, এই ধারণাটি অপচিন্তাপ্রসূত এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিহীন।

দ্বিতীয়তঃ বানান-সংস্কার করিবার পশ্চাতে, যে-প্রেরণা ক্রিয়া করিয়াছে, তাহা এইরূপ :---"ইংরাজী-ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমেরিকায় বানান সমস্যার সমাধান করিবার আন্তরিক ইচ্ছা ও সঙ্কল্প দেখা যাইতেছে,"---সুতরাং বাংলা-ভাষারও বানান-সংস্কার করা দরকার।

এই বিষয়ে আমাদের গোড়ার বক্তব্য এই, ইংরাজী-ভাষায় যাহাই হয় বা ইংরাজেরা যাহাই করে, তাহা বাংলা-ভাষারও হইতে হইবে অথবা আমাদেরও করিতে হইবে (অবশ্য গুণাগুণ বিবেচনা না করিয়া করার

কথাই আমরা বলিতেছি) এমন ধারণা পোষণ করিবার মানসিকতাকে, আমরা খুব সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা বলিয়া মনে করি না। ইংরাজী-ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা চলিছে, এ কথা সত্য। শুধু ইংরাজী কেন, পৃথিবীর সমস্ত চালু ও জীবন্ত ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টা চলিতেছে। পৃথিবীর সপ্তম স্থানীয় একটি জীবন্ত ও জাগ্রত ভাষা হিসাবে বাংলা-ভাষার সংস্কার প্রচেষ্টাও অহরহ চলিয়া আসিতেছে। মনে রাখিতে হইবে, ইহার সহিত বানান-সংস্কারের বিশেষ যোগাযোগ নাই।

তারপর, আমেরিকায় ইংরাজী শব্দের বানান-সংস্কারের কথা। বানান-সংস্কারের সহিত বর্ণ-সমাবেশের সম্বন্ধই ঘনিষ্ট; বর্ণ-সংখ্যা-হ্রাস-বৃদ্ধির সম্বন্ধ খুবই কম। চিরাচরিত ধারার রীতি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া, শব্দের যথোপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাসের নামই শব্দের বানান। মনে রাখিতে হইবে, কোন বস্তুর সমাবেশ বা বিন্যাস এক ব্যাপার এবং সেই বস্তুর সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি অন্য ব্যাপার। এই জন্য, আমেরিকায় 'বানান-সংস্কার' কথার অর্থ, শব্দের অন্তর্গত বর্ণ-সমাবেশের সংস্কার;---বর্ণের সংখ্যা কমাইয়া দিবার ব্যাপার নহে। মূলতঃ এই কারণেই আমেরিকায় honour লিখিত honor লিখিত হয় অর্থাৎ অনুচ্চারিত u বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু, তাই বলিয়া আমেরিকানেরা u বর্ণকে ইংরাজী বর্ণমালা হইতে বাদ দেয় নাই এবং দিতেও পারে নাই। সেই জন্য আমেরিকায় four লিখিতে u বাদ পড়ে না; কারণ u বাদ পড়িলে, four শব্দটি for হইয়া দাঁড়ায়।

বাংলা-ভাষায়ও এইরূপ বানান-সংস্কার হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও আছে। এই বিষয়ে আধুনিক যুগের পূর্ব-সূরিরূপে আমরা রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের নাম করিতে পারি। তারপর এক গোষ্ঠী পণ্ডিতের সমবেত চেষ্টায় (তন্মধ্যে ডক্টর সুনীতিকুমার ও সুপণ্ডিত রাজশেখর বসু মহোদয়-গণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানান ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে সংস্কৃত হয়। এই সমস্ত প্রচেষ্টার কোথাও বাংলা-হরফ কমাইয়া বানান-সংস্কারের চেষ্টা দেখা যায় নাই। ইহার একমাত্র কারণ, ইঁহাদের সকলেই বাংলা বানানের ধারা, গতি ও প্রগতি সম্বন্ধে— বিশেষ করিয়া ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে— সজাগ ছিলেন। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই, যিনিই ভাষার রীতি, প্রকৃতি

ও প্রগতির ধারা বুঝেন, শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন, তিনি অথবা তাঁহার ন্যায় কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কখনও বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার মত দুঃসাহস করিতে পারেন না। ভবিতব্যতার অন্ধ-যবনিকান্তরালে এমন কোন অলৌকিক ক্ষমতাশালী মহাপুরুষের যুগান্তকর আবির্ভাব লুক্কায়িত আছে কিনা, এই যবনিকা উন্মোচন করিয়া তাহাকে দেখাইবার ভার আজ কে গ্রহণ করিবে?

তৃতীয়তঃ বাংলা-ভাষার লিখন-পদ্ধতি ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে অনেক স্থলে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া, 'উচ্চারিত ও লিখিত কথার মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে এবং অনুচ্চারিত বর্ণ লিখিয়া দরকার নাই।' অন্য কথায়, বাংলা-ভাষা উচ্চারণ ও লিখনে "যথাসম্ভব" এক হইবে। এইখানে "যথাসম্ভব" কথাটি একান্তই অস্পষ্ট। সুনির্দিষ্টভাবে এই বিষয়ে কোন সীমা-নির্দেশ করিয়া না দিলে, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলা, বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

এতৎসত্ত্বেও, প্রস্তাবটি পাঠ করিলে মনে স্বতঃই একটি প্রশ্ন জাগে--- "পৃথিবীর কোন্ সুসভ্য জাতির ভাষা লিখন ও পঠনে এক। পৃথিবীর কোন সুউন্নত, সুগঠিত ও সাহিত্য-সম্পদে সম্পৎশালী ভাষাকে এক রকম করা সম্ভবপর কি?"

এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য পৃথিবীর সুসভ্য জাতির ভাষাগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ইউরোপের কথাই ধরা যাউক; কেননা ইউরোপীয় সভ্যতাই পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা। বর্তমান ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ফ্রান্স সংস্কৃতি ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ এবং ফরাসী-ভাষাও ইউরোপের সর্বজনীন ভাষা। এই হিসাবে, ইহা বর্তমান ইউরোপীয় ভাষার প্রতিনিধিমূলক ভাষা। এই ভাষায় উচ্চারণ ও লিখনের অবস্থা কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক। এই ভাষায় শব্দের উচ্চারণ ও লিখনের মধ্যে যেরূপ অসাধারণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনটি পৃথিবীর আর কোন্ ভাষায় আছে, তাহা আমাদের জানা নাই। এই ধরুন না—

	ফরাসী শব্দ		লিখিত উচ্চারণ		উচ্চারিত উচ্চারণ
(i)	Monsieur	—	মন্‌সিইউর্	—	মঁসিয়ে, মঁসে (শ্রীযুক্ত জাতীয় উপাধি)
(ii)	Bourgeois	—	বৌর্‌জেওইস্	—	বুর্জোয়া (মধ্যবিত্ত শ্রেণী)
(iii)	Bourgeois	—	ঐ	—	বর্জেস্ (ঐ নামীয় টাইপ্)
(iv)	Bouquet	—	বৌকেট্	—	বুকে (ফুলের তোড়া)
(v)	Chauffeur	—	চৌফ্‌ফিউর্	—	শোফার (মোটর চালক)

এইরূপ হয় কেন? উচ্চারণ ও লিখনে এত অসমামঞ্জস্য থাকে কেন? শুধু ইউরোপে কেন, পৃথিবীর যে-কোন সভ্য জাতির ভাষাই এইরূপ। ইহার বেশ যুক্তিসংগত কারণ আছে। ভিত্তি ব্যতীত ইমারত হয় না; প্রাচীন ঐতিহ্য ব্যতীত জাতি হয় না; প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি ও উন্নত ভাষা ব্যতীত আধুনিক প্রাদেশিক ভাষা স্ফূর্ত ও মূর্ত হয় না। প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন ভাষা যদি ইউরোপীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে পরিপুষ্ট না করিত, ইউরোপীয় ভাষা ও বিজ্ঞানের অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিত। ইউরোপে এখনও একটি নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইলে, তাহার ভাব-প্রকাশের জন্য গ্রীক-লাটিনের দ্বারস্থ না হইয়া, ইউরোপীয় ভাষাগুলির উপায় নাই। রসায়ন-শাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, ভৈষজ্য-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তো কথাই নাই, বহু অবৈজ্ঞানিক বিষয়েরও গ্রীক-লাটিন ব্যতীত চলে না। কোন প্রাদেশিক বা মানব-গোষ্ঠীর ভাষা কোন-না-কোন উন্নততর ভাষার সহিত সংস্পৃষ্ট না হইলে, সেই ভাষা বড় হইতে পারে না,---অন্ততঃ ভাষার ইতিহাসে তাহার নজীর নাই। বিশেষতঃ যে-আধুনিক ভাষা যে-প্রাচীন ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে-ভাষা হইতে ইহার সংস্রব ছিন্ন হইলে, ইহার অপমৃত্যু অনিবার্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভাষার উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ধারা-সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন বলিয়া, ভাষা-সম্পর্কে এইরূপ মূলনীতিমূলক কথাগুলি বুঝিতে ভুল করেন নাই এবং জননীস্থানীয় ভাষার সহিত কন্যাস্থানীয় ভাষার যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে, উচ্চারণ ও লিখনে কিছু কিছু ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে এবং থাকিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির ভাষার অবস্থা যখন এইরূপ, তখন বাংলা ভাষার কোন কোন শব্দের উচ্চারণ ও লিখনে একটু আধটু অসামঞ্জস্য থাকিলে, তজ্জন্য এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়? ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন, বানান-সংস্কারে আমরা একান্তই রক্ষণশীল। বর্তমান প্রবন্ধের বানান দেখিলেই আমরা যুক্তিসংগত রীতির প্রগতিপন্থী কি না, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ব্যাকরণ বাঁচাইয়া যুক্তিসংগতরূপে বিশ্ববিদ্যালয় যে-বানান-সংস্কার করিয়াছেন, প্রবর্তনের পর হইতে আমাদের লেখায় আমরা তাহা হুবহু গ্রহণ করিয়াছি।

পৃথিবীর কোন ভাষায়, উচ্চারণ ও লিখন ব্যাপারে পুরাপুরি সামঞ্জস্য নাই; বাংলা-ভাষায়ও নাই। এই কারণে, বিশেষজ্ঞগণ Phonetic Script বা ধ্বনি-বিজ্ঞানমূলক বর্ণমালা আবিষ্কার করিয়া, তাহার সাহায্যে ভাষার উচ্চারণ ও লিখন-ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে-চেষ্টা শুধু পণ্ডিত-সমাজেই সীমাবদ্ধ; জনসাধারণের ব্যবহারের পক্ষে ইহা একান্তই অনুপযুক্ত। বাংলা-ভাষায় উচ্চারণ ও লিখনে যদি কৃত্রিম উপায়ে সামঞ্জস্য প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা হয়, তবে এই ভাষার জগতে অরাজকতা উপস্থিত হইবে এবং এই ভাষা মগের মুলুকে পরিণত হইবে। কেন না, বাংলার কোথাও উচ্চারণের সমতা নাই; ইহার আটাশটি জেলার প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ আটাশ রকমের উচ্চারণ বৈচিত্র্য রহিয়াছে। বানানের বালাই যখন থাকিবে না, তখন আপন-আপন উচ্চারণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া, প্রত্যেকে খুশিমত বানানে বাংলা লিখিবে। এইরূপে যে বাংলা-ভাষার উদ্ভব হইবে, তাহাতে এক স্থানের বাঙালীর ভাষা অন্য স্থানের বাঙালীর পক্ষে এক অপূর্ব Tower of Babel বা বুলি-বিভ্রাটে পরিণত হইবে। যদি বলা যায় যে কোন বিশিষ্ট স্থানের উচ্চারণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে আবার সে একই কথা;-----এই নূতন মাপকাঠি বজায় রাখিবার জন্য ইস্কুল বসাইতে হইবে, অভিধান-ব্যাকরণ লিখিতে হইবে, অতি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সকলকে কথায় কথায় অভিধান খুলিতে হইবে। তবে, সহজ হইল কি করিয়া, সুবিধাই বা হইল কোথায়? সমস্ত বাংলায় আর সাহিত্য-সৃষ্টি হইবে না; বানান ও উচ্চারণের দিকে সকলকে মনোযোগ দিতে হইবে। কোন বিশিষ্ট স্থানের শিশু ব্যতীত বাংলার আর সমস্ত মস্তিষ্ক বানান ও উচ্চারণ উভয় বিষয়ে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে।

চতুর্থতঃ, বাংলা-বানান-প্রণালী নাকি এক দুঃসাধ্য ও দুরায়ত্ত ব্যাপার বলিয়া, বিদেশীদের বাংলা-শিক্ষার পরম আগ্রহকেও ব্যর্থ করিয়া দেওয়ায়, বাংলা সর্বভারতীয় ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারিতেছে না। (ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায়-ষষ্ঠ সুবিধা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ ও ব্যর্থোদ্যম ব্যক্তির অনেককেই প্রস্তাবক মহোদয় ব্যক্তিগতভাবে অবগত আছেন বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছেন। বাংলা-ভাষার প্রতি বিদেশীদের আগ্রহ বাড়ানো এবং বাংলা-ভাষাকে অন্ততঃ ভারতে শ্রেষ্ঠ আসন দান করানো, এই দুই

উদ্দেশ্যেই বানান-সংস্কার করিবার আর একটা প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। উদ্দেশ্যদ্বয় মহৎ ও সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বাস্তবতার প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়াই এইরূপ pious wish বা সাধু অভিলাষ পোষণ করিলে, তদ্দ্বারা কোন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

উক্ত ধারণা সম্বন্ধে প্রথম কথা হইল,---কোন ভাষা শিখিবার আগ্রহ থাকিলে এবং আগ্রহশীল ব্যক্তির মধ্যে যদি linguistic . ability বা ভাষা-শিক্ষার সহজাত ক্ষমতা বর্তমান থাকে, তবে সে-আগ্রহ শুধু তথাকথিত বানান-বিভ্রাটের জন্য ব্যর্থ হয় কি না? দ্বিতীয় কথা হইল,---কোন ভাষা ইচ্ছা করিলেই অথবা গায়ের জোরে কি সর্বজনীনত্ব লাভ করিতে পারে, না তাহার জন্য ভাষাটির কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ থাকার প্রয়োজন?

প্রথম প্রশ্নটি শিক্ষা-বিষয়ক মনস্তত্ত্বমূলক। শিক্ষা-বিষয়ক মনস্তত্ত্ব বলে, সকলের মধ্যে linguistic ability বা ভাষা-শিক্ষার সহজাত ক্ষমতা একরূপ নহে সত্য, তবে যে-কোন সাধারণ মানসিক ক্ষমতাবিশিষ্ট বালক বা লোকের কোন ভাষা-শিক্ষার প্রতি প্রকৃত আগ্রহ থাকিলে, তাহা শিক্ষা করা অনেকখানি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে দীর্ঘ-দিনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া, আমরা এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি। বিদেশীদের মধ্যে যদি বাংলা শিখিবার প্রকৃত আগ্রহ থাকে, তাহা কেবল বাংলা-বানান-বিভ্রাটের ফলে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, এই যুক্তি বৈজ্ঞানিক কষ্টি-পাথরে টিকে না; সুতরাং এই কথা একান্তই ভুয়া।

তারপর, এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ লোকের 'বহু দৃষ্টান্ত' সম্বন্ধে বিচার করা যাউক। যে-ভারতে (দেশীয় রাজ্যসহ) শতকরা পাঁচ জনেরও কম লোক অক্ষরজ্ঞ, সে-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের মধ্যে বাংলা শিখিবার আগ্রহ যদি সকলেরই আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবু তাহা শতকরা পাঁচজনের অধিক লোকের মধ্যে ত নহেই। বাংলা-শিক্ষায় আগ্রহশীল ব্যক্তির সহিত যিনিই ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত থাকুন, উক্ত শতকরা পাঁচজনের মধ্য হইতে একজনের সহিতও তাঁহার পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত নিজের মাতৃভাষা ছাড়িয়া, অন্য ভাষা যাঁহারা শিখেন, তাঁহারা হয় গুটিকতক পণ্ডিত ব্যক্তি, না হয় চাকুরে, না হয় ব্যবসায়ী। আপন-আপন কাজের সুবিধার জন্যই তাঁহারা এইরূপ করিয়া

থাকেন। এই শ্রেণীর লোকেরা সহজ হউক আর কঠিন হউক, নিজের গরজে ভাষা শিখিয়া লইবেন ও লইতে বাধ্য। ইঁহাদের জন্য,---এমন কি উক্ত শতকরা ৫ জনের জন্যও ঈপ্সিত ভাষা শিখাইতে গিয়া, ভাষাটিকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়া শিখাইতে হইবে, ইহার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? প্রস্তাবিত উপায়ে ভাষার অঙ্গহানি করিয়া শিখাইলেও, বাংলা-ভাষা সর্ব-ভারতীয় ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হইবে কি না, তাহাই বিচার করা যাউক।

গায়ের জোরে কোন ভাষা কোন দেশে সর্বজনীনত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষার সর্বজনীনত্ব-লাভ, ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট বিষয় ও গুণের উপর নির্ভর করে। সর্বজনীনত্ব-লাভের জন্য ভাষাকে কোন দেশ বা মহাদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত হইতে হয়, এবং যে-দেশ এইরূপ ভাবে অবস্থিত সে-দেশের লোক সংস্কৃতি, সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে উন্নত হইলে নিজের ভাষা ও ক্ষমতার মধ্যস্থতায় চারিদিকে প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া, ঐ জাতির ভাষা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইত্যাকার কারণে, ফরাসী-ভাষা ইউরোপের সর্বজনীন ভাষা এবং হিন্দুস্থানী-ভাষা ভারতের সর্বজনীন ভাষা। বাংলা-ভাষা কোন সময়ে ভারতের সবজনীন ভাষা ছিল না, এখনও নয়, ভবিষ্যতেও হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সংস্কৃতিগত উন্নতি ব্যতীত বাংলা-ভাষার আর কোন দাবী ভারতীয় অন্যান্য ভাষার উপর অচল।

এইবার প্রকৃত বানান-সংস্কারের ব্যাপারেই আসা যাউক। তৎসম শব্দের বানান-সংস্কারে বাংলা-ভাষার কোন অধিকার আছে কি না, তাহা এখনও সাব্যস্ত হয় নাই। কিছু কিছু অধিকার নিশ্চয় আছে; কিন্তু সে অধিকার ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ অধিকার নহে। শব্দের "ধাতু" বা "মূলের" বিকৃতি ঘটাইয়া কোন তৎসম শব্দকে বাংলায় সংস্কৃত করা চলিবে না, চলা উচিতও নহে। এই কারণে 'ক্রমশস্'' শব্দকে বাংলায় 'ক্রমশ' করা চলে, তদ্ভবরূপে 'কোর্‌মেশে' করাও চলিতে পারে, কিন্তু 'কুর্‌মশ' রূপে বিকৃত করা চলিবে না; 'বিদ্যা' শব্দকে 'বিদ্যা'-রূপে না লিখিয়া (বিদ্+ক্যপ্ +আ) 'বিদদা'-রূপে লেখা চলে না। তাহাতে শব্দের উচ্চারণ ও ধাতু-নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটিবে এবং 'বিদ্যমান', 'বিদ্বান', 'বিদ্যাবান', 'বিদ্বত্তম' ইত্যাদি শব্দ গঠন করা যাইবে না; কেননা সবকয়টি শব্দ 'বিদ'-ধাতু হইতে বিভিন্ন প্রত্যয়যোগে গঠিত হইয়াছে।

"অনুচ্চারিত বর্ণ লিখিবার দরকার নাই",—এই প্রস্তাবিত সূত্র বাংলায় চলিতে পারে না। 'উজ্জ্বল' বা 'উচ্ছ্বাস' লিখিতে 'ব' বর্ণ উচ্চারিত হয় না সত্য, কিন্তু ঐ শব্দদ্বয়ে তাহা না লিখিলে চলিবেই না; কারণ ঐ 'ব' ধাতুর "ব', যথা—উৎ+জ্বল+অন্; উৎ+শ্বস্+ঘঞ্। এই 'জ্বল' ধাতু বা 'শ্বস্' ধাতুর 'ব' বাদ দিলে শব্দগুলির অর্থই হইবে না। 'ধর্ম্ম', 'কর্ম্ম', 'কার্য্য' প্রভৃতি শব্দের অনুচ্চারিত 'ম' বা 'য' বাদ দেওয়া চলে,—কিন্তু তাহা অনুচ্চারিত বর্ণ বলিয়া নয়। 'র'-এর পর বিকল্পে যে-বর্ণ দ্বিত্ব হয়, তাহাকে বাংলায় সাধারণ নিয়ম করিয়া লওয়া হইয়াছিল। এখন ঐ বৈকল্পিক নিয়মটি মানা হয় না। বৈকল্পিক নিয়ম না মানিলে ব্যাকরণের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

"ফলা বলিয়া কোন কথা থাকিবে না", এই প্রস্তাবও অচল। ফলাগুলি হয় ধাতুর না হয় প্রত্যয়ের। প্রত্যয় ত্যাগ করিলেও শব্দ গঠিত হয় না, ধাতু ছাড়িলেও শব্দ সৃষ্টি করা যায় না। যেমন, প্রত্যয়ের ফলা—

কুট্+ক্মলন্=কুট্মল; বাচ্+ময়ট্=বাঙ্ময়; বাচ্+মিন্=বাগ্মী

বিদ্+ক্ত=বিত্ত; বি+তৃষ্+নক্+আ=বিতৃষ্ণা।

এই সমস্ত শব্দ হইতে প্রত্যয়গুলিকে বাদ দিলে শব্দই গঠিত হইবে না। ধাতুর ফলা সম্বন্ধে একটু আগেই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং, ফলা বাদ দিলে বাংলা ভাষা কি করিয়া চলিবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলায় না।

"অনুনাসিক স্বর উঠাইয়া দেওয়া যায়" কিন্তু স্থান বিশেষে। বাংলা-ভাষার শব্দ হইতে সর্বত্র সমানতালে এই স্বরটি উঠাইয়া দেওয়া চলিবে না। বাংলা ভাষায়, হয় খাস বাংলা অর্থাৎ দেশী নতুবা তদ্ভব শব্দে অনুনাসিক স্বরের ব্যবহার আছে। তদ্ভব শব্দে যে অনুনাসিক স্বর ব্যবহৃত হয়, তাহা তৎসম শব্দ হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়; অর্থাৎ তৎসম শব্দের "ণ" "ন' "ঞ" "ং" "ঙ" "ম" প্রভৃতি অনুনাসিক বর্ণের আওয়াজ বা স্বরজ্ঞাপক যথা,—

বণ্টন>বাঁটন; পঙ্ক>পাঁক; ঝম্প>ঝাঁপ; হংস>হাঁস; পঞ্চ>পাঁচ, বন্ধন>বাঁধন ইত্যাদি।

এই জাতীয় শব্দের ঁ চন্দ্রবিন্দু বাদ দেওয়া চলিবে না, কারণ, সংস্কৃত ভাষার উত্তরাধিকার ছাড়িলে বহু ক্ষেত্রে গোল বাধিবে, শব্দের বহু মূলও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে খুব বেশী মাথা না ঘামাইয়া, মাত্র "হাস্য" ও "হংস" এই দুইটি শব্দের আলোচনা হইতে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে, যথা---

হাস্য > হাস ; হংস > হাঁস

"হাস" এবং "হাঁস" শব্দ দুইটি কেহ যদি "হাস" রূপে লিখে, তবে বাংলা-ভাষার দুর্দশা---অন্ততঃ দেখিয়া ও শুনিয়া বুঝার দিক হইতে কতটুকু ঘটে, তাহা যে-কেহই একটু দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিতে পারেন। যদি বলা হয়, পূর্বাপর সম্বন্ধ হইতে শব্দটির অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে, তবে আরবী-ভাষায় "ইরাব" বা বিভক্তির চিহ্ন বসাইতে গিয়া যে-বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হয়, বহুক্ষেত্রে বাংলা-ভাষা সেই জাতীয় বিভ্রাটে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তজ্জন্য বাঙালী পাঠককে নিজের ভাষা পড়িয়া বুঝিবার জন্য যে মানসিক কসরৎ করিতে হইবে, তাহার ক্ষতি পূর্ণ করিবার জন্য আর কিছু বাংলা-ভাষায় পাওয়া যাইবে না।

তদ্ভব শব্দের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু বা অনুনাসিক স্বর ব্যবহারের একটি নিয়ম আছে, একটি ধারা আছে। সুতরাং, এইগুলিতে কোন বাঙালীর গোল ঠেকার কারণ নাই। দেশী শব্দের মধ্যে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহারই গোল ঠেকায়। প্রাদেশিকতা দোষই তাহার মূল কারণ। 'পুঁথি,' 'ফাঁক', 'হাঁড়ি,' 'ঠোঁট,' 'খোঁয়াড়', 'খোঁপা' ইত্যাদি বাংলা-শব্দে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের কোন যুক্তি সংগত কারণ নাই। ইহাদের পক্ষে একমাত্র যুক্তি, পশ্চিম-বঙ্গে শব্দগুলি ঐরূপ উচ্চারিত হয়। এইরূপ শব্দ হইতে অনায়াসে অনুনাসিক স্বর উঠাইয়া দেওয়া যায়। কেননা, তাহাতে ভাষার কোন প্রকারের ক্ষতি ঘটিবার সম্ভবানা নাই।

(গ) বাংলা-ভাষার বর্ণমালা সংস্কার বা হরফ-কমানো

বাংলা-বর্ণমালার সংস্কার-সম্বন্ধে গোড়ায় আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। তাহা হইতে দেখা যাইবে, বাংলা-বর্ণমালার কোনটিই কমানো যাইবে না। তবে, স্বরবর্ণের মধ্যে "ঋৃ" এবং "৯' বাংলায় অচল। এতদ্ব্যতীত বাকী স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের একটিকেও বাদ দিলে বাংলা-ভাষা অন্যরূপ ধারণ

করিবে। সংস্কৃত-ভাষার সহিত বাংলা-ভাষার আত্মীয়তা এত ঘনিষ্ঠ যে, সংস্কৃত-ভাষার বর্ণ না কমাইলে, বাংলা-ভাষা হইতে কোন বর্ণ কমানো যাইবে না। প্রস্তাবক মহোদয় স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, ---"সংস্কৃত-ভাষার নিকট বাংলা-ভাষা খুবই ঋণী। উহার-শব্দসম্ভার, বাক্য-বিন্যাস এবং ভাবৈশ্বর্য্য ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাংলা-ভাষায় 'তৎসম" 'ভগ্ন-তৎসম' বা 'তদ্ভব' শব্দ-প্রাচুর্য্যের কথা অস্বীকার করিতে যাওয়া নিছক্ অকৃতজ্ঞতা।" প্রস্তাবক মহোদয় কর্তৃক স্বীকৃত এই যে সংস্কৃত-ভাষার ঋণ, ইহা হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় বাংলা-ভাষার নাই। এই ঋণের প্রভাবেই সংস্কৃত-ভাষার মধ্যস্থতায় বাংলা-ভাষায় ভারতীয় মূললিপি ব্রহ্মী-বর্ণমালা চলিবেই এবং পূর্ণসংখ্যায় চলিতে বাধ্য। নতুবা, সংস্কৃত হইতে কোন শব্দ-সম্পৎ বাংলায় গ্রহণ করা যাইবে না অথবা সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দ-সম্পৎকে বিকৃত করিয়া দিয়া বাংলা-ভাষার রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাব-প্রকাশের ক্ষমতাকেও খর্ব করিয়া দিতে হইবে। ভাষার এবং শব্দের রূপ পাল্টাইলে ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা যে খর্ব হইয়া যায়, তাহা বুঝিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না। শব্দ ও ভাষাকে অনায়াসে আধার বলিয়া ধরা যায় এবং ভাবকে ঐ আধারের আর একরূপে কল্পনা করা সহজ। যে-আধারে আধেয় স্থান পাইবে, আধেয় সেই আধারের রূপই গ্রহণ করিবে। লিখন ও পঠনের দোষে উর্দূ-ভাষার احمد اجمیر گیا "আহ্মদ আজমীর গয়া" কথাটি احمد اج مر گیا "আহ্মদ্ আজ মর্ গয়া" রূপে পরিবর্তিত হইয়া কোন অশিক্ষিত পরিবারে কিরূপ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার গল্প প্রায় লোকেই জানেন্। বাংলায়ও এইরূপ গল্প যে নাই, তাহা নহে। নিম্নের সর্ববিশ্রুত কথাটিই ধরা যাউক:----

"হরেক রকম বারুদের কারখানা"

কথাটি যদি এইরূপভাবে লিখিত হয়---

"হরেকরকমবারুদেরকারখানা"

তবে তাহা এইরূপে পঠিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে,---

"হরে কর কম্বা রুদের কার খানা"

সে যাহা হউক, বাংলা-ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসে ইহার বর্ণমালার রূপ যথেষ্ট সংস্কৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা

কখনও দেখা যায় নাই। প্রস্তাবক মহোদয় 'জ' 'য'; 'শ' 'ষ', 'স' এবং ণ 'ন', প্রভৃতির ব্যবহারে ভয়ানক গোল ঠেকার কথা খুব জোরে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই গোল এড়াইবার জন্য 'জ' 'শ' এবং 'ন', রাখার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি বলেন, প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে এই সমস্ত অক্ষর ব্যবহারের বেলায়, কোন বালাই নাই। প্রাচীন লেখকগণ খুশিমত অক্ষরগুলির ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের ভাষা বা শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে কোন বেগ পাইতে হয় না (পুস্তিকার অষ্টম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, এই সমস্ত অক্ষরের মধ্য হইতে একটির বেশী দুইটি অথবা তিনটি বাংলা-ভাষায় থাকিবে কেন, থাকার আবশ্যকতাই বা কি?

এই প্রস্তাবের মধ্যে একটি আশ্বাসের বিষয় এই, প্রস্তাবক মহোদয় বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি এইবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা-সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসের দিক হইতে প্রস্তাবটির আলোচনা করা যাউক। সংস্কার-আগ্রহাতিশয্যে অথবা ঐতিহাসিক ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত বলিয়া কিংবা তৎসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে প্রস্তাবক মহোদয় ব্যাপারটিকে নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন।

প্রাচীন বাংলায় উক্ত অক্ষরগুলির ব্যবহারে কোন বিশিষ্ট বাঁধা-ধরা নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই, এই কথা এক শ'-বার স্বীকার্য: প্রাচীন বাংলায় লিখিত যে-কোন প্রাচীন পুঁথি দেখিলেই এই বিষয়ে দ্বিমত হইবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু তদ্দ্বারা প্রাচীন বাংলা-ভাষা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না, এই উক্তি নিতান্তই অপোক্তি (mis-statement)। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সহিত যাঁহারই সত্যিকার সংস্রব আছে, যিনি পরের চোখে বাংলা-সাহিত্য দেখেন না, অথবা পরের মুখে ঝাল খাইতে অভ্যস্ত নহেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন প্রাচীন-বাংলা-ভাষা প্রাচীন-পুঁথিতে পাঠ করা কতই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং সেই ভাষার অর্থ গ্রহণ করা কতই দুরূহ ও দুঃসাধ্য। প্রস্তাবক মহোদয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি,---অক্ষরগুলির যদি কোন আবশ্যকতাই না থাকিত, প্রাচীন-বাংলা-ভাষায় যদি এইগুলি অপাংক্তেয় বলিয়া বিবেচিত হইত, তবে বাংলার প্রাচীন লেখা হইতে অক্ষরগুলি বাদ পড়িল না কেন? ইহাদের ব্যবহারে সুসংবদ্ধ প্রণালী অনুসৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রত্যেক যুগের পুঁথিতে সুসংবদ্ধ প্রণালী অনুসরণের প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়।

এতদ্ব্যতীত, প্রাচীন-বাংলা-সাহিত্যে এই অক্ষরগুলিকে বাদ দিবার কোন প্রবণতাই দেখি না, বরং তৎস্থলে সেইগুলিকে জিয়াইয়া রাখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান কবির বাংলা-পুঁথিতে দেখা যায়, বাংলার প্রাচীন কবিদের মধ্যে "চৌতিশা" লিখার একটি সাহিত্যিক রীতি বর্তমান ছিল। এই চৌতিশায় হয় দেব-দেবীর স্তব, নয় নায়ক-নায়িকার বিলাপ বিনাইয়া বিনাইয়া লেখা হইত। বলা বাহুল্য, বাংলা বর্ণমালার 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হ' অবধি চৌত্রিশটি বর্ণের প্রত্যেকটিকে লইয়া, তদ্দ্বারা পৃথক-পৃথকভাবে কবিতার চরণ বাঁধিয়া স্তব অথবা বিলাপ-রচনার নামই "চৌতিশা"। প্রাচীন বাংলায় এইরূপে চৌতিশা লেখার যে-রীতি ছিল, তাহাকে প্রাচীন বাংলাব একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। ইহা যে তাৎকালিক একটি সাহিত্যিক কলা-কৌশল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখনকার খ্যাতনামা কবিগণও এই কলা-কৌশল-প্রদর্শনে গৌরব অর্জন করিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই চৌতিশাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়, 'জ', 'য', 'শ', 'ষ', 'স'; 'ণ', 'ন' প্রভৃতির ব্যবহারে প্রাচীন বাংলা-ভাষা কোন কঠোর নীতির অবলম্বন করুক আর না করুক, বাংলা শব্দের বানানে অক্ষরগুলির আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠিবে, সে আবশ্যকতাটুকু কি? এক কথায় ইহার উত্তর, ভাষার গতি ও প্রকৃতি অনুসরণে যে-বানান লিখিতে হয়, তাহাতে এইরূপ বাদসাদ পোষায় না,---বানানের অঙ্গহানিতে ভাষার অঙ্গহানিও ঘটিতে পারে বলিয়া,—ভাষার অঙ্গহানিতে বোধ-শক্তির অঙ্গহানিও ঘটিয়া থাকে বলিয়া, ঐরূপ যদৃচ্ছা বাদসাদ চলে না। "জাম" এবং "যাম" শব্দদ্বয়কে "জাম" রূপে লিখিলে, দেখা মাত্রই অর্থবোধে কোন বেগ পাইতে হয় না, এই কথা বলা নিছক উক্তি-বিকার ব্যতীত আর কি বলিব? আমাদের মতে তৎসম শব্দে ঐরূপ সংস্কার করা চলে না। তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দে আমরা সুবিধা মত সংস্কার করিয়া লইতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছেন। তাহাকে ছাড়াইয়াও এদিক হইতে বানান সংস্কার করা চলে। কিন্তু, তাহাতে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা কমিবে না।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা বাংলা, তথা সংস্কৃত-ভাষার দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, বাংলা বর্ণমালা কমানো যায় না। শুধু সংস্কৃতের হাঁকডাক ছাড়িলে, প্রস্তাবক মহাশয় হয়ত হঠাৎ বলিয়া বসিবেন, এমন রক্ষণশীল লোক লইয়া কোন কাজ করা চলে না,--প্রগতির পথে আগানো যায় না। এঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বাংলা-ভাষায় সংস্কৃত শব্দ-সম্ভারের সহিত আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী হইতেও শব্দ-সম্ভার আসিয়া মিলিত হইয়াছে (আলোচ্য পুস্তিকার ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক নিঃশ্বাসে এতগুলি ভাষার কথা ছাড়িয়া কেবল আরবীর কথা ধরি না কেন? এই ভাষার বহু শব্দ বাঙালী-মুসলমানের নাম ও ধর্মের আশ্রয়ে বাংলা-ভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। প্রস্তাবক মহোদয়ের প্রস্তাব মত যদি বাংলা-বর্ণ-মালায় একটি 'জ' অথবা একটি 'শ' রাখা হয়, তবে "সিদ্দীক" (صديق), "শেখ," (شيخ,) "সৈয়িদ্" (سيد) অর্থাৎ আরবী 'সাদ' (ص), 'শিন্', (ش), 'সিন্' (س) প্রভৃতি অক্ষর বাংলার মাটিতে একাকার হইয়া যাইবে। আরবীতে অক্ষরের সংখ্যা কম বটে, বাংলায় বর্ণমালার সংখ্যা এতবেশি থাকা সত্ত্বেও, ইহার 'জ' এবং 'য' দ্বারা আরবী 'জে' (ز), 'যোয়্' (ظ), 'জাল্' (ذ), 'যোয়াদ্' বা 'দোয়াদ' (ض) প্রভৃতি অক্ষরকে বাংলায় প্রকাশ করিবার উপায় এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। মোটের উপর, এদিক হইতেও বাংলা-হরফ কমাইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। কোন প্রকারেই বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা হ্রাস করা যায় না---ইহাই আমার বিবেচনায় স্থির মত। বাংলা সংস্কৃত-ভাষা নহে বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে বহু প্রকারে প্রভাবান্বিত বলিয়া পূর্বে সংস্কৃত বর্ণের বা বর্ণ-বিন্যাসের গায়ে হাত না দিয়া, বাংলা-ভাষার বর্ণ-বিন্যাসে, অন্ততঃ তৎসম শব্দের বর্ণ-সমাবেশে হাত দিতে যাওয়া আমার মতে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা, আরবী-ভাষার ন্যায় সংস্কৃত-ব্যাকরণ এমনই আটঘাট বাঁধা নিয়মে আবদ্ধ যে, সহজে ইহাকে কিছু করিয়া উঠিবার উপায় নাই।

বাংলা-বর্ণ-মালার সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভবপর বলিয়া আমার মনে না হইলেও, বর্তমান বর্ণমালা-বিন্যাস ব্যবস্থার কিছু-কিছু সংস্কার করা যায় বলিয়া মনে হয়। এইরূপ সংস্কার উচিত বলিয়াও আমরা মনে করি। বর্তমান

যুগ কল-কারখানার যুগ। যদিও মানুষের জন্যই কল-কারখানার সৃষ্টি, কল-কারখানার জন্য মানুষের সৃষ্টি নহে, তথাপি কাজ-কর্মে মানুষই যেন-কল-কারখানার জন্য সৃষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। এই কথা ভাষার বেলায়ও মানুষের বেলার মতই সত্য। টাইপ্-রাইটার্ বলুন, মুদ্রণ-যন্ত্র বলুন, লাইনো-মেসিন্ বলুন, ভাষার মধ্যস্থতায় লোকের যে-সমস্ত কাজ-কর্ম চলে, তাহার বিশেষ, সুবিধা করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে ভাষার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি লাভ ঘটিয়াছে; কোন প্রকারের অঙ্গহানি-জাতীয় ক্ষতি ঘটে নাই। কোনরূপ অঙ্গহানি না ঘটাইয়া, যদি বর্তমান কল-খারকানার যুগের সহিত বাংলা-ভাষাকে খাপ-খাওয়াইয়া লওয়া যায় এবং তদ্দ্বারা বাংলা-ভাষার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি লাভ ঘটে, তবে তাহাতে কোন সুস্থ মস্তিষ্কবান ব্যক্তির আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। লাইনো মেশিনের সহিত বাংলা-বর্ণমালা-বিন্যাস-ব্যবস্থাকে খাপ-খাওয়াইবার জন্য বাংলার স্বনামখ্যাত "আনন্দ-বাজার-পত্রিকা" যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে বাংলা-ভাষা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দূরের কথা, আমরা বলিব, বাংলা-ভাষার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধির ইতিহাসে, ইহা এক অভূতপূর্ব নবযুগের সূচনা করিয়াছে। "আনন্দ-বাজার-পত্রিকা" বাংলার বর্ণমালা হ্রাস করার ব্যবস্থা ভাবিতেই পারেন নাই,---প্রকৃত পক্ষে ভাবা যায়ও না।

এখন দেখা যাউক, এই যে বাংলা-বর্ণমালা-বিন্যাস-ব্যবস্থা, এই দিক হইতে বাংলা-ভাষার কতটুকু সংস্কার করা চলে। এই বিষয়ে আলোচ্য পুস্তিকার একটি প্রস্তাব আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে; তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :---

আ-কার, ই-কার ইত্যাদি "কার"-গুলির সব কয়টিই একাধিক্রমে অক্ষরের দক্ষিণে বা ডান দিকে বসান উচিত।

এই কার-গুলি বসার বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসৃত হয় না। বর্তমানে ই-কার, এ-কার এবং ঐ-কার অক্ষরের বামে বসে; উ-কার, ঊ-কার এবং ঋ-কার অক্ষরের তলায় বসে; ও-কার এবং ঔ-কারের অর্ধেকটি অক্ষরের ডানে এবং অর্ধেকটি বামে বসে; এতদ্ব্যতীত একমাত্র আ-কারটি অক্ষরের ডানে বসে। এই নয়টি 'কার'-

বিন্যাসে চারিটি ভিন্ন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর পক্ষে কম অসুবিধার কথা নয়। বাংলা ভাষা লেখার গতি বাম হইতে ডান দিকে। এই জন্য, যাহা-লিখিতে হয় অর্থাৎ যাহা-কিছু 'কার' বসাইতে হয়, তাহা অক্ষরের ডান দিকে বসাইলেই লেখার পক্ষে সুবিধা। তাহাতে আর হাতও উঠাইতে হইবে না এবং লিখনের সাথে সাথে ডান দিকে চলমান দৃষ্টি ও মনের গতিকেও পিছনের দিকে ফিরাইয়া লইতে হইবে না। এই ক্ষেত্রে অক্ষরের তলায় যে 'কার'গুলি বসে, তাহাকে ডানের দিকের 'কার' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; কেননা অক্ষর লেখার পরেই 'কার' বসাইতে হয়। বর্ণ-বিশ্লেষণের ধারাও ইহাতে বজায় থাকে। এইরূপ করিলে, এ-কার, ও-কার ঐ এবং ঔ-কারের বর্তমান রূপ (যেমন, 'ে' 'ৈ' 'ো' 'ৌ') এবং অক্ষরের সহিত ইহাদের অবস্থানের ঢঙের পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়িবে; নতুবা এই 'কার' গুলিকে অক্ষরের ডানে বসান চলিবে না। 'ই'-কারকেও ডানে বসাইতে হইলে, হয় ইহার রূপ পরিবর্তন না হয় স্থান পরিবর্তন আবশ্যক। ই-কার এ-কার এবং ঐ-কার----এই তিনটির রূপ পরিবর্তন না করিয়া, শুধু অবস্থানের পরিবর্তনের পর বাম-মুখো করিয়া বসাইয়া দিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। ও-কার এবং ঔ-কারের বেলায় তাহা চলিবে না; এইগুলির বর্তমান রূপে (যেমন 'ো, 'ৌ') পরিবর্তন না ঘটাইলে, এই গুলিকে অক্ষরের ডানে বসান যাইবে না। হিন্দী ভাষার দেব-নাগরী বর্ণমালায় ও-কার এবং ঔ-কার অক্ষরের ডানে বসে। এই দেব-নাগরী বর্ণমালায় সংস্কৃত-ভাষাও লিখা হয়। সুতরাং এই 'কার' দুইটির জন্য বাংলায় নূতন কারের সৃষ্টি না করিয়া আমরা অনায়াসেই বাংলা-ভাষার ভগ্নী হিন্দী-ভাষার কাছ হইতে 'কার'-দুইটিকে গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইলে বাংলা লেখায় 'কার সমাবেশ এইরূপ দাঁড়াইবে:-----

'কা, কী, কী, কু, কূ, কৃ, ক১ ক১, কো, কৌ'

কোথায়=কাথায়; গৌরব=গীরব; কিরূপে=কীরূপ১

কৈলাসে বৈদিক দেবতা পোরবাসিরূপে বাস করিয়া গৌরব বোধ করেন=
ক১লাস১ ব১দীক ব১বতা পীরবাসীরূপ১ বাস করীয়া গীরব বীধ কর১ন।

বাংলা-শব্দের বানানে অক্ষরের সংযোগে বা 'কার'-সংযোগে অক্ষরের যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় (যেমন জ+ঞ=জ্ঞ ; ঞ+চ=ঞ্চ ; শ+উ=শু ; গ+উ=গু ; ক+ত=ক্ত) তাহার অধিকাংশই তুলিয়া দেওয়া যায় ; "আনন্দ বাজার পত্রিকা" তাহাই করিয়াছেন। ইহাতে লাইনো টাইপের সুবিধা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর পক্ষে অক্ষর পরিচয়েও কোন বেগ পাইতে হয় না।

বাংলা-লিখন-পদ্ধতি হইতে দোতালা-অনুরূপ সংযুক্ত বর্ণকে অর্থাৎ দুই বর্ণের সংযোগকে বিশ্লিষ্ট করা যায় কি না, বলিতে পারি না। তবে তিন বর্ণের সংযোগ হইলে, প্রথম বর্ণকে হসন্ত-যোগে পৃথক করা যায় বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ধাতু বা প্রত্যয়ের জন্য গোল বাধিবার কথা নয় ; যেমন :----

যন্ত্র=যন্‌ত্র ; মন্ত্রী=মন্‌ত্রী ; স্বাতন্ত্র্য=স্বাতন্‌ত্র্য ;
প্রস্তুত=প্রস্‌তুত ; শাস্ত্র=শাস্‌ত্র ; উচ্ছ্বাস=উচ্‌ছ্বাস

উপসংহার

বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধুনা যেরূপ অনাচার ও অনাসৃষ্টির লীলা লীলায়মান, তাহা দেখিলে মনে হয়, সত্যই বুঝি বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের মা-বাপ নাই। বাংলা-ভাষার বাঁধুনী বুঝুন আর না-ই বুঝুন ইহার কোন ব্যাকরণের সহিত পরিচয় রাখুন আর না-ই রাখুন, ইহার গতি, প্রকৃতি ও প্রগতির ধারা হৃদয়ংগম করুন আর না-ই করুন, যিনিই বাংলা-ভাষায় শুদ্ধাশুদ্ধ নির্বিচারে একটা-কিছু লিখিতে যান, তিনিই বাংলায় সাহিত্যিক হইয়া উঠেন। তারপর, গোদের উপর বিষফোড়ার ন্যায় আরও বিপৎ হয় তখন, যখন এই জাতীয় লোক কোমর বাঁধিয়া, আদাজল খাইয়া ভাষার সংস্কারে লাগিয়া যান।* এইরূপ ক্ষেত্রে নিরাশ হইবারই কথা। তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

আমরা কিন্তু বরাবরই এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বিকার ও আশ্বস্ত। আমাদের ধারণা, ইহা বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের জীবনী-শক্তির একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। কেননা, এইরূপ অনাচার ও অনাসৃষ্টির মধ্য হইতেই বাংলা-ভাষা ও

---

* বলাবাহুল্য, ইহা অতি সাধারণ উক্তি। সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকের প্রতি এতদ্দ্বারা কোন প্রকারের ইঙ্গিত করা হয় নাই।

সাহিত্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, উঠিতেছে এবং ভবিষ্যতেও উঠিবে। বাঙালী জাতি ও বাঙালীর ভাষা সম্বন্ধে আমরা চিরদিনই শুভবাদী(optimist)। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, কোন প্রকারের ঝড়-ঝঞ্ঝা, (তাহা যতই প্রবল হউক না কেন) বাঙ্গালী জাতি ও তাহার ভাষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল,--আমরা বলিব, প্রোজ্জ্বল। ইহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারিবে না।

কিন্তু, বাঙালী জাতির ভাবালুতা ও বিপরীত বুদ্ধি আজ তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ব্যর্থতা আনয়ন করিয়াছে। তাহার সেই সাময়িক বিলীয়মান বৈশিষ্ট্য যেন তাহার ভাষা ও সাহিত্যের শান্তিময় প্রগতিকে ব্যর্থ ও ব্যাহত না করে; মাতৃ-ভাষার প্রতি তাহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং ইহার প্রতি তাহার নিয়মতান্ত্রিক নিষ্ঠা কোন প্রকারের সাময়িক অনুপ্রেরণা ও অনুচিন্তনে যেন বিনষ্ট না হয়। বাঙালী যদি কোন বিপরীত বুদ্ধিবশে আজ ইহা করিয়া ফেলে বা করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহা সমগ্র জাতির পক্ষে একটি মহাকলঙ্কের বিষয় বৈ কি?

পরিশেষে বক্তব্য এই, আমাদের নূতনের প্রতি যেমন ভয় নাই, ইহার প্রতি তেমন কোন মোহও নাই। জরুরী বলিয়া বিবেচিত হউক বা না হউক, সংস্কারের জন্য সংস্কার করিতে হইবে, কিংবা "একটা নতুন কিছু কর রে ভাই নতুন কিছু কর"--এর নেশায় মাতিতে হইবে, এমন কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ইহার উন্নতির প্রতি নিয়মানুবর্তিতামূলক নিষ্ঠা, ইহার ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষণীয় দৃষ্টি লইয়াই আমরা এই প্রবন্ধে অতি সাবধানে অগ্রসর হইয়াছি। বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে আমাদের জ্ঞানের পরিসর ক্ষুদ্র এবং বিচার-বিবেচনার সীমা নির্দিষ্ট। এই কারণে, দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আমরা সত্যই দৃষ্টি-বিভ্রমের ফলে কোথাও গোলে পড়িয়াছি বলিয়া ধরা পড়িলে, বর্তমান মত পরিবর্তন করিতে প্রস্তুত আছি, আশা করি, আমরা যে-দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভাবী আলোচনাকারিগণ সে-দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়াই বাংলা-ভাষা-সংস্কারে মনোনিবেশ করিবেন। নতুবা, আমাদের মাতৃ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধির পরিবর্তে, ইহার আশু অবনতির আশঙ্কা ঘনাইয়া আসিবে।

রচনাকাল—৩রা জানুয়ারী, ১৯৪৪, জিলা স্কুল, ইংরেজ-বাজার, মালদহ।

মুসলমানী বাঙ্গালা

(ঐতিহাসিক আলোচনা)

বঙ্গের মুস্‌লিম্‌-সেবিত বাঙ্গালা সাহিত্য বহুদিন হইতে 'মুসলমানী বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সর্বপ্রথম যখন এই নামটি শুনিয়াছিলাম, তখন কেমন বোধ করিয়াছিলাম মনে নাই; তবে আজকাল যখন যাবনিকত্বের আমেজ প্রলিপ্ত করিয়া এই মধুর 'নামামৃত' আমাদিগকে পান করানো হয়, তখন আনন্দাতিশয্যে আমাদের ঠিক 'দশা' উপস্থিত না হইলেও, ইহাতে আমরা যেন একটু কেমন-কেমন বোধ করিয়া থাকি। বিগতপ্রায় অর্ধযুগ হইতেই এই চমৎকার নামটির সার্থকতা সম্বন্ধে আমরা নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছি। তাহাতে এই নামের সার্থকতার যে-রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়িয়াছে, তাহাকে সংক্ষিপ্তাদপি সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা।

কোন জাতিবিশেষের গায়ে হিন্দুয়ানী বা মুসলমানী মাকা মারিতে পারা গেলেও, কোন দেশ, বিশেষতঃ কোন দেশের ভাষার গায়ে তেমন কোন মার্কা আদৌ মারা যায় কিনা, সে-বিষয়ে আমাদেব বিস্তর সন্দেহ আছে। বাঙ্গালী মুসলমানরা বাঙ্গালা দেশের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকে। দুনিয়ার সব দেশের ভাষাতেই অল্প-বিস্তর মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ ভাষার মিশ্রণ দিয়াই ,জাতির বৈরাট্য, বিস্তৃতি, কর্ম্ম-তৎপরতা ও ঔদার্য নির্ণীত হইতে পারে। বিরাট অতীতে বাঙ্গালী জাতির ভাষা যে-কাঠামো অবলম্বন করিয়াই বড় হউক, ইহা এই জাতির বৈরাট্য, বিস্তৃতি, কর্ম্মতৎপরতা ও ঔদার্যের পরিচায়ক। এদেশের মুসলমানদের বাঙ্গালাকে "মুসলমানী" নাম দিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবার যে আধুনিক প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা আধুনিক বাঙ্গালী জাতির সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক বই আর কি বলিতে পারা যায়? একটি বিরাট দেশের ভাষার গায়ে এমন ধর্ম্মীয় মার্কা দেওয়া একরূপ নূতন ব্যাপার। হিন্দী ভাষার মুসলিম

ঔরসজাত কন্যা উর্দুভাষার গায়েও উত্তর-ভারতীয়েরা এমন কোন ধর্মীয় মার্কা মারেন নাই। তবে, আমাদের বাঙ্গালা দেশে সবই যখন সম্ভবপর, তখন ভাষার বেলায়ও যদি হঠাৎ কোন নূতন কথা শুনিয়া ফেলি, তাহাতে আশ্চর্য না হইয়া নিজের বাঙ্গালীত্বের কথা স্মরণ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বাঙ্গালী মুসলমানের পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহাদের মাতৃভাষার জন্য তাঁহারা একটি সুন্দর নাম পাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান এ-পর্যন্ত এদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-সেবিত বাঙ্গালাকে "হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা" বলেন নাই। বাঙ্গালার মুসলমান তাঁহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের বাঙ্গালাকে এই মধুর নামটি না দিয়া, এতদিন যাবৎ কেন তাঁহাদিগকে এই পরম সৌভাগ্য-ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? তবে মনে হয়, বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বীয় মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ঔদার্যই কৃপণত্বই ইহার প্রধান কারণ। যদি আমাদের ধারণা সত্য হয়, তবে এইজন্য বাঙ্গালী মুসলমানকে দোষ দেওয়া চলে না।

সে যাহা হউক, "মুসলমানী বাঙ্গালা" বলিয়া একটি কথা প্রায়ই চোখে পড়ে, "হিন্দুয়ানী বাঙ্গালা" বলিয়া কোন কথা এ-পর্যন্ত চোখে পড়ে নাই,---ইহাই আমরা বলিতে চাই। এই "মুসলমানী বাঙ্গালা" কি, সে-সম্বন্ধে বিগত কয়েক বৎসর হইতে আমরা চিন্তা করিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালা ভাষার একটি বিরাট অংশের প্রতি এই নাম আরোপের মূলে যদি কোন শুভ ইচ্ছা দেখিতাম, তবে এ-বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামাইতে হইত কিনা সন্দেহ। ইহাতে তেমন কোন শুভ ইচ্ছা নিহিত আছে বা ছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালার মুসলমানগণ ধর্মে, কর্মে ও বিশ্বাসে বাঙ্গালার হিন্দু হইতে মোটামুটি পৃথক হইলেও, সংস্কৃতিমূলক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া, হিন্দুগণ এদেশের মুসলমানকে চিরদিনই স্বজাতীয় বলিয়া দাবী করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু নিতান্তই আশ্চর্যের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, মুসলমানদের বাঙ্গালাকে হিন্দুগণ তাঁহাদের বলিয়া দাবী করা দূরে থাকুক, ইহাকে চিরঘৃণ্য হরিজনের ন্যায় "দূর দূর" করিয়া তাঁহাদের অপাংক্তেয় করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছেন। ইহার কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিতে যাওয়া বৃথা। সম্ভবতঃ, আধুনিক

যুগের রাজনৈতিক মানসিকতা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া এইরূপ ঘটিতেছে। বঙ্গের মুসলিমসেবিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এইরূপ ঘৃণ্য ছাপ দেওয়ার সার্থকতা কি, তাহাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়। সুতরাং একটু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই বিষয়ের বিচার করিতে পারিলে ভাল হয়।

"মুসলমানী বাঙ্গালা" কথাটির ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। খুব সম্ভব, মাত্র ৮২ (বিরাশী) বৎসর পূর্বে, কথাটি লেখায় সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। লং সাহেব (Rcv. James Long 1814-1887) ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের কোন্ কুক্ষণে তাঁহার বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় (Catalogue of Bengali Books) "মুসলমানী বেঙ্গলী" কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন কে বলিতে পারে? তাঁহার তালিকাটি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতী বাঙ্গালার অনুসরণে ও অনুকরণে লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক হইতে পৃথক্ করিবার জন্য, 'বটতলার" ঊনবিংশ শতকের পুঁথিগুলিকে এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। কেননা পণ্ডিতী বাঙ্গালায় লেখা মুসলমানদের অন্য পুস্তককে তিনি "মুসলমানী বেঙ্গলী" শীর্ষের অন্তর্গত করেন নাই। ইহার পর, যে-সকল উল্লেখযোগ্য পুস্তকে এই কথাটির ব্যবহার দেখা যায়, তাহা রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত "Origin and Developement of Bengali Language" আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এই দুইজন মহারথীও কথাটিকে অতিরিক্ত মাত্রায় অসাবধানভাবে মুসলমানদের সমগ্র পুঁথির অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের জন্যই ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহাদের ব্যবহারে অসাবধানতা ব্যতীত কোন প্রকারের ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধুনা নানাস্থানে কথায় ও লেখায় "মুসলমানী বাঙ্গালা" কথাটি সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনাকে বুঝাইবার জন্য ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। তাহার কোন নজীর উদ্ধৃত করার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি না।

একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায়, যে-বাঙ্গালায় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ফার্‌সী ও উর্দু শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তাহা তো অবিসংবাদিত-ভাবে "মুসলমানী বাঙ্গালা" বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেই, অধিকন্তু মুসলমান নির্বিশেষে যে-প্রকারের সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালাই লিখুন, তাহাও "মুসলমানী

বাঙ্গালা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেবের---"বল ঊষাপতির (শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধের ?)---শরণ লইতেছি"—এর ন্যায় বাঙ্গালা যেমন "মুসলমানী বাঙ্গালা," তেমনই বটতলায় "কেতাব মাফিক বাত হইল তামাম"ও "মুসলমানী বাঙ্গালা"। ফলতঃ, "মুসলমানী বাঙ্গালা" নামক কথাটি যেরূপ অসাবধানভাবে তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালা-ভাষার কোন যুগ-বিশেষের রূপ না বুঝাইয়া, এই ভাষার মুসলিম-সেবকমণ্ডলীর প্রতি এই কথাটির প্রয়োগকারীর আন্তরিক ঘৃণা, অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের ভাবই অধিকমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। এই শ্রেণীর লোকের এহেন ঘৃণ্য মানসিকতাটি অদ্ভুত (?) "মুসলমানী বাঙ্গালার" চেয়েও অত্যধিক অদ্ভুত হইয়া আমাদের চোখে ঠেকে। কারণ, বিচারের নিকট ইহাদের সমস্তই ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়।

প্রথমতঃ, যে-বাঙ্গালায় ফার্সী (প্রকারান্তে আরবী) ও হিন্দী শব্দের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়, তাহাকেই যদি "মুসলমানী বাঙ্গালা" বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ), ভারতচন্দ্র রায় বা রামেশ্বর ভট্টাচার্যের লিখিত সাহিত্যের সবটুকুকে না হউক, অন্ততঃ কতটুকুকে, "মুসলমানী বাঙ্গালা" নাম দিতে হয়। কেননা, ইঁহাদের সাহিত্যের অংশ-বিশেষে ঐরূপ শব্দের প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামেশ্বরের "সত্যপীর" হইতে দুইটি অংশ এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম :

"ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটি,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা করে, জপে পীর পেকাম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ ।।" (চণ্ডীমঙ্গল)

"কাহে কুট্টন গির্দ্দ মৌত লগা তেরা।
ছোর সদানন্দ নাম সেবককো মেরা ।।
নহি ঠৌর মারুঙ্গা রখেগা কৌন চচচা।
ও লোগ ভি চোর ঔর তুলোক ভি সচচা ।।"
(সত্যপীর)

দ্বিতীয়তঃ, যদি ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্য-সেবককে ধর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের সেবিত সাহিত্যকে "মুসলমানী বাঙ্গালা" বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে হ্যালহেড্ সাহেবের "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" বা মার্সম্যান প্রভৃতির বাঙ্গালা-সাহিত্যকে "খ্রীস্টানী বাঙ্গালা" এবং তরুদত্ত, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির ইংরেজী সাহিত্যকে "হিন্দুয়ানী ইংরেজী" বলা উচিত। ফলে তাহা হয় কি? যদি না হয়, তবে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি জৈনুদ্দিন, মোহাম্মদ সগীর, শেখ কবীর, ষোড়শ শতাব্দীর কবি মোহাম্মদ কবীর, সৈয়দ সোলতান, শেখ ফয়জুল্লা এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন, আলাওল, মোহাম্মদ খাঁ প্রভৃতির বাঙ্গালা সাহিত্যকে "মুসলমানী বাঙ্গালা", আখ্যায় আখ্যাত করা হয় কেন? অথচ তাঁহারা যে-ভাষা বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

"আমির হাসন সুতা, রূপে গুণে অদভূতা,
যেহেন স্বর্গের বিদ্যাধরী।
চাঁচর চিকুর খোঁপা, শোভে অতি মনোলোভা
মুক্তা দোলে লহরে লহরী ॥

* * *

নয়ন চঞ্চল দেখি, ধাইল খঞ্জন পাখী,
কটাক্ষে হানিল দ্বিজরাজ।
মৃগমদ পত্রাবলী, মৃগাঙ্ক কলঙ্ক বলি,
ভ্রম হয় মুনিমন মাঝ ॥"

(মকতুল হোসেন---মোহাম্মদ খাঁ)

যেরূপ মনোভাব লইয়া এইরূপ বাঙ্গালাকে "মুসলমানী বাঙ্গালা" বলিয়া ঘৃণাপ্রকাশ করা হয়, সেইরূপ কোন প্রকারের মনোভাব আমাদের নাই বলিয়া, যিনিই ইহাকে "মুসলমানী বাঙ্গালা" বলুন, আমরা তাহা বলিতে পারি না। এইরূপ বাঙ্গালা সপ্তদশ শতাব্দীর সেরা হিন্দুকবিদের কয়জন লিখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা তলাশ করিতে গেলে, "লোম বাছিতে কম্বল উজাড়"-এর দশা ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী।

তবে কি ভাবের দিক হইতে বিচার করিয়াই কতকগুলি বাঙ্গালা কাব্যকে "মুসলমানী বাঙ্গালা"র ঘৃণ্য ছাপ দেওয়া হয়? লেখার মধ্য হইতে কিংবা কথার ভিতর হইতে যতটুকু নজীর সংগ্রহ করা যায়, তদ্দ্বারা এমন কোন ব্যাপার বুঝিতে পারা যায় না। আর যদি বাঙ্গালা কাব্যে ইস্‌লামী ভাবের প্রাধান্য হইলেই, তাহাকে "মুসলমানী বাঙ্গালা" বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়, তবে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-রচিত পদাবলী-সাহিত্যকে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া তাহার গায়ে মুসলমানী বাঙ্গালার ছাপ মারিয়া, সে-গৌরবটুকু বাঙ্গালার মুসলমানকেই দেওয়া উচিত; কেননা পদাবলী সাহিত্যটির আগাগোড়া মুসলমানদের সুফী-সাহিত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত এবং ভাব-সামঞ্জস্যের প্রাচুর্যে পরিপূরিত। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের কোন বাঙ্গালী (অবশ্য বাঙ্গালার মুসলমানকে বাদ দিয়া) তাহা করিতে স্বীকৃত আছেন বলিয়া মনে হয় না। এই হিসাব ধরিতে গেলে, কবি নজরুল ইসলামের "হাফেজের অনুবাদ" এবং নরেন দেবের "ওমর খৈয়াম" সমভাবে "মুসলমানী বাঙ্গালা"। কিন্তু, হিন্দুগণ কান্তি ঘোষ কি নরেন দেবকে "মুসলমানী বাঙ্গালা"র লেখক বলিয়া একঘরে করিয়াছেন কি?

এখন প্রশ্ন হইতেছে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং এই সাহিত্যের সেবকের জাতি এই তিনটির কোনটির দিক হইতে বিচার করিয়া যখন ইহার গায়ে "মুসলমানী বাঙ্গালার" ছাপ দেওয়া যায় না, তখন এই মার্কাটি এক শ্রেণীর বাঙ্গালা-সাহিত্যের গায়ে মারিয়া দেওয়ার সার্থকতা কি কিছুই নাই? প্রকৃত পক্ষে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এই মার্কার কোন বিশেষ সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে একেবারে কোন সার্থকতা নাই, তেমন কথা বলা যায় না। হ্যাঁ, ইহাতে যে-সার্থকতাটুকু রহিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের আরোপিত সার্থকতা নহে, একথা জোর করিয়া বলা যায়। সাহিত্য-সেবকের জাতি এবং ইহার ব্যবহার ভাষা-সংশ্লিষ্ট তথাকথিত কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়াই উপর্যুক্ত সার্থকতা আরোপ করা হয়। এইরূপ সার্থকতা আরোপের মূলে সারবত্তার চেয়ে অসাবধানতাই বেশি বলিয়া আমাদের ধারণা। নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি এ-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আরও পরিস্ফুট করিবে।

মুসলমানী বাঙ্গালা

বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রগতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান-কালের মধ্যে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সেবিত পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালা-সাহিত্যে এমন একযুগ আসিয়াছিল, যাহাকে নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ইচ্ছা করিলে "মুসলমানী বাঙ্গালা" নামে অভিহিত করা চলে। আবার একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, বাঙ্গালার সকল অংশের সাহিত্য সম্বন্ধে এ-উক্তি অচল। এই যুগীয় পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্যকে, পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য-সাধনার বাহিরে রাখা উচিত; কেননা, যে-সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই যুগকে পৃথক নাম দেওয়া যায়, তাহার বিশেষ প্রভাব উত্তর ও পূর্ববঙ্গীয় সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গের যে-অঞ্চলে আধুনিক প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ এবং রাজশাহী বিভাগের মালদহ, রংপুরের দক্ষিণাংশ এবং রাজশাহী জেলার সবখানি অবস্থিত, সে-অঞ্চল বাঙ্গালা সাহিত্যে বরাবরই প্রাধান্যবিস্তার করিয়াছে; এই কারণে এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে, আমরা উপর্যৃক্ত পশ্চিমবঙ্গীয় অঞ্চলের বাঙ্গালা সাহিত্যই বুঝাইতেছি।

যে-যুগের কথা বলা হইতেছে, সে-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভাষায় ও ভাবে মুস্‌লিম প্রভাব প্রচুর। এ-স্থলে এই প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভবপর নহে। আবশ্যক বোধ করিলে, আমরা অন্য প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। বলাবাহুল্য পলাশীক্ষেত্রে মুসলিম রাজশক্তির পতনের (১৭৫৭ খ্রীঃ) পর, বাঙ্গালার হিন্দু-সাহিত্য হইতে এই প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণ মেরুদণ্ডবিহীন হইয়াও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত একরূপ 'খিচুড়ি' বাঙ্গালায় এমন একরূপ 'সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকে, যাহা অধুনা "বট-তলার-সাহিত্য" নামে অভিহিত হয়। এই বটতলার সাহিত্যকেই লঙ্‌ সাহেব "মুসলমানী বেঙ্গলী" নাম দিয়াছিলেন। ভাষার দিক হইতেও ইহাদের মূল্য যেমন নগণ্য, সাহিত্য-সম্পদের দিক হইতেও ইহার মূল্য, তেমন হেয়। বর্তমানে আমাদের এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান-কাল পর্যন্ত বাঙ্গালার সাহিত্যে (হিন্দুরই হউক বা মুসলমানেরই হউক) মুসলিম প্রভাব, ভাব ও ভাষা এই উভয়ই যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ মুস্‌লিম রাজধানীর নিকটবর্তী

ছিল বলিয়া নানাভাবে নানাদিক হইতে মুসলিম প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। এই প্রভাব সাহিত্যে প্রতিফলিত হওয়ায়, এই সময়কার হিন্দু-মুস্লিম-সেবিত বাঙ্গালা-ভাষায় এমন একটি ইস্লামী অর্থাৎ তথাকথিত "মুসলমানী" পারিপাশ্বিকতার সৃষ্টি হইয়াছ, যাহার জন্য ইহার গায়ে ইচ্ছা করিলে নিতান্তই অসাবধান ভাবে "মুসলমানী বাঙ্গালার"র ছাপ দেওয়া যায়। কবিকঙ্কণের "চণ্ডী", বৈষ্ণবদের পদাবলী এবং হিন্দুদের সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর সাহিত্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে এই যুগের ইসলামী পারিপাশ্বিকতার উদাহরণ স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ সদ্ধর্মী ধর্মগ্রন্থ শূন্যপুরাণের অন্তর্গত "নিরঞ্জনের রুষ্মা" হইতে (কেননা এই গ্রন্থের এই অংশ ষোড়শ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী রচনা বলিয়া নির্দেশিত হয়) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহারণ,
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম্ম,
মায়াতে হইল অন্ধকার ॥
ধর্ম্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়ত কাল টুপি,
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্যা ভিস্ত অবতার,
মুখেতে বলেন দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি।
গণেশ হইলা গাজী, কাত্তিক হইল কাজী,
ফকির হইল যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইল্যা শেক,
পুরন্দর হইল মৌলনা।

চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সভে,
সবে মেলি বাজায় বাজনা ।।
আপনে চণ্ডীকা দেবী, তিহঁ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর ।।" ইত্যাদি।
(শূন্যপুরাণ---রামাই পণ্ডিত)

এইস্থলে যে ইস্‌লামী আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই যুগের, বিশেষতঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর, বাঙ্গালা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের খ্যাতনামা হিন্দুকবি ভারতচন্দ্রেও (১৭১২---১৭৬০) দীনেশ বাবুর ন্যায় ফারসী ভাষা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ফারসী-সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন।

এইস্থলে কেহ কেহ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, শূন্য পুরাণের "নিরঞ্জনের রুষ্মায়", অথবা ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত কবিকঙ্কণের "চণ্ডীতে" কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর "সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ" রচকদের মধ্যে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতচন্দ্রে যে-মুস্‌লিম প্রভাব থাকার ফলে ভাষা স্থানে স্থানে "মুসলমানী বাঙ্গালা" হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহাদের প্রকৃত ভাষা নহে। তাঁহারা যে-যে স্থলে মুস্‌লিম জীবনের আলেখ্য কবিত্বের রঙীন তুলিকায় অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন, কেবল সেই সেই স্থলে তাঁহারা মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যেন একরূপ দায়ে পড়িয়া; ইহার দ্বারা তাঁহাদের বর্ণনাকে বাস্তব ও সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। অন্য কোন কূটতর্ক লইয়া এই কূটতর্কটির সম্মুখীন না হইয়া, ইহাকে মানিয়া লইলেও বুঝিতে হয় যে, এই সময়ের মুস্‌লিম জীবনের প্রসার এমন বিস্তৃত ছিল যে, সাহিত্যে এই জীবনের রূপ দিতে হইলে মুস্‌লিম রঙের আশ্রয়গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। যদি তাহাই হয়, তবে এই সময়ে মুস্‌লিম কবিদিগকে "মুসলমানী বাঙ্গালা" ব্যবহারের জন্য হীনতার চক্ষে দেখার কোন কারণ দেখি না, কেননা মুসলমান কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে মুস্‌লিম জীবনের ছবিই আঁকিয়াছেন।

নির্বিকার ও নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, এই সময়ের বাঙ্গালা-সাহিত্যে এইরূপ কোন ব্যাপার নিহিত ছিল না। আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালা-ভাষা মুস্‌লিম রাজধানীর নিকটবর্তী ছিল বলিয়া নানাভাবে মুস্‌লিম প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এই মুস্‌লিম প্রভাবের মধ্যে রাজভাষার একটি প্রবল ভাষাগত প্রভাব ছিল বলিয়া একরূপ নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায়। অধিকন্তু, এই সময়ে বঙ্গের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি সংস্কৃতিগত (cultural) মিলন বা ঐক্যের পথ প্রশস্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময়ে বঙ্গের হিন্দু মুসলানের মধ্যে বাউল মতের বিস্তৃতি ইহার অন্যতম প্রমাণ। মোটামুটি এইরূপ প্রভাবের ফলে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষা তথাকথিত "মুসলমানী বাঙ্গালার" আকার ধারণ করে, এবং এই স্থানেরই সাময়িক সাহিত্যে (হিন্দু-মুসলিম উভয়) তাহার ছাপ অঙ্কিত হয়। ইহার প্রমাণ বিস্তর। পশ্চিম বঙ্গের কবিকঙ্কন চণ্ডীতে প্রায় তিনশতাধিক মুস্‌লিম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; অথচ এই সময়ের একটু পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গীয় কবি মাধবাচার্যের চণ্ডীতে এইরূপ শাব্দিক প্রভাব নগণ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গীয় 'সত্যনারায়ণের বা সত্যপীরের' ভাষা তেমনই সুষ্ঠু ও সাধু, এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গীয় অধিকাংশ সত্যপীরের পুঁথির ভাষা তেমনই অসাধু ও বিকৃত। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গীয় কবি দৌলত কাজী যখন "সতী ময়না" রচনা (১৬২২---১৬৩৮ খ্রীঃ) করিতে গিয়া লিখিতেছিলেন:

"চঞ্চল যুগল আঁখি নীলোৎপল গঞ্জে।
মৃগাঙ্ক শরে মৃগ পলায় নিকুঞ্জে।।
মদন-মঞ্জরী ভুরু কিবা শরাসন।
লুকি গেল পুষ্পধনু লজ্জার কারণ।।"

তখন পশ্চিমবঙ্গের মোহাম্মদ এয়াকুব প্রমুখ খ্যাতনামা কবিগণ "জঙ্গনামা" (রচনাকাল---১৬৯৫) শ্রেণীর পুস্তকে যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছিলেন, তাহা এইরূপ:

"যত মুসলমান ছিল এজিদ লস্করে।
জার জার হৈয়া কান্দে এমাম খাতিরে।।
শোকেতে কাতর হৈল যত মুসলমান।
দেলেতে হইল খুসি যত কুফ্‌রান।।"

এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙ্গালা-ভাষায় একটি বেশ স্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। এই প্রভেদের মূলে অন্য যে-কোন কারণ থাকুক, পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে রাজনৈতিক সম্বন্ধের দূরত্ব ও নৈকট্য যে একটি প্রধান কারণ, সে-বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ নাই। পূর্ববঙ্গের ভাষা রাজধানী গৌড়, রাজমহল বা মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক দূরে অবস্থান করার ফলে, রাজভাষার আশুপ্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাল যাবৎ ঢাকায় মুঘল রাজধানী অবস্থিত থাকিলেও, এই সময়ে মুঘল শাসনকর্তৃগণ আহম, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণের সহিত বিবাদে লিপ্ত থাকায়, পূর্ববঙ্গে রাজভাষার প্রভাব রাজশক্তির ন্যায় শিথিল ছিল। এইজন্যই পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালা-ভাষার রূপ অনেকখানি অবিকৃত। এই অবিকৃতি হিন্দু ও মুসলমান কবির হাতে সমানভাবে স্থান্ পাইয়াছে, ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের বিকৃত ভাষা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের হাতে সমানভাবে স্থান পায় নাই, তাহাও ভাবিবার কথা। এই সময়ের পশ্চিম-বঙ্গীয় মুসলমানদের ভাষা যতটুকু "খিচুড়ি", হিন্দুর ভাষা ততখানি নয়। মুসলমানদের ভাষায় "খিচুড়িত্ব" অধিক মাত্রায়---ইহার কারণ কি? বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-প্রসূত কল্পনার সাহায্যে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে বলিতে হয়, আজকাল যেমন "টেস্সুফিরিঙ্গীরা" বিশ্রী ইংরেজী বলিলেও তাহাদের ইংরেজীপ্রীতি---যে-কারণেই হউক আমাদের চেয়ে একটু অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই আলোচ্যকাল অতিশয় স্বল্পসংখ্যক অভিজাতবংশীয় মুসলমানের কথা বাদ দিলেও, অপরাপর সকলশ্রেণীর পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানের প্রীতি রাজভাষা ফারসী ও রাজকথ্যভাষা উর্দুর প্রতি---যে-কারণেই হউক---পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুর চেয়ে যথেষ্ট অধিক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমানদের এহেন অত্যধিক উর্দু বা ফার্সী-প্রীতির ফলে, এই সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষায় তাঁহারা একটুখানি অধিকমাত্রায় খিচুড়ি প্যাকাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের ভাষা স্থলে স্থলে যে উৎকট মূর্তি ধারণ করে নাই, সে-কথাও ,বলা যায় না। ঊনবিংশ শতকের বটতলার পুঁথিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই ভাষায় লেখকের কৃত্রিমতা যতখানি বেশী, স্বভাবিকতা ততটুকু কম।

কেননা, বাঙ্গালার কোন অংশের মুসলমান বটতলার পুঁথির উৎকট ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া জানি না। কি কারণে এই ভাষা পুঁথিগুলিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার কোন কারণ অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে, মূল হিন্দী ভাষাকে ফারসী অক্ষরে লিখিয়া অতিরিক্ত মাত্রায় ফারসী শব্দ সমাবেশে উত্তর-ভারতীয় মুসলমানেরা ইহা হইতে উর্দুর ন্যায় একটি কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধকালের মধ্যে বাঙ্গালার মুসলমানগণও ফারসী বা আরবী অক্ষরে বাঙ্গালা লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষা হইতে আর একটি কৃত্রিম ভাষা-সৃষ্টির চেষ্টা চালাইয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে মুসলিম শাসনের গৌরবময় যুগ হইতে হিন্দীকে উর্দু করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল বলিয়া তথায় উদুর সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু, বাঙ্গালায় নবাবী আমলের নিতান্তই শোচনীয় অবস্থার সময়, বাঙ্গালা ভাষাতে ফারসী বা আরবী অক্ষর চালাইয়া ইহাকে 'মুসলমানী' করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হওয়ায়, বঙ্গে এ আরবী বা ফারসীকৃতির আন্দোলন বেশী দিন চলিল না। বলা বাহুল্য, বঙ্গের মেরুদণ্ডবিহীন মুস্লিম শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে, এ-আন্দোলন প্রতিহত হয়, এবং ক্রমেই তাহা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়।

বাঙ্গালা-ভাষাকে এইরূপ আরবী বা ফারসী-কৃতির প্রচেষ্টায়ও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালাকে ফারসী অক্ষরে লিখিতেছিলেন, পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম বিভাগে তখন মুসলমানেরা বাঙ্গালাকে আরবী অক্ষরে লিখিতেছিলেন। আমাদের নিকট আরবী ও ফার্সী অক্ষরে লিখিত কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে। আমরা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে কোন হস্তলিপি দেড়শত বৎসরের ঊর্ধ্বকালের নহে। আবার ফারসী হস্তলিপিগুলির কাল আরও আধুনিক। পূর্ববঙ্গীয় পুঁথির ফারসী হস্তলিপির সংখ্যা দুই চারিটি, কিন্তু আরবী হস্তলিপির সংখ্যা বিস্তর। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, পশ্চিমবঙ্গের ফার্সী-প্রীতির ফলে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা (যেমন গরীবুল্লা, হাম্জা প্রভৃতি কবিগণ) মূল বাঙ্গালা-ভাষাকে যেমন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় ফার্সীকৃত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, তেমনই মূল বাঙ্গালা অক্ষরকেও ফারসী অক্ষরে পরিবর্তিত করিয়া

দিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কবি হামজা ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে যখন "আমির হামজার কেচ্ছা" রচনা করিতে গিয়া লিখিতেছিলেন

"কামেল ফাজেল লোগ যত কারিগর।
কেহ না করিল কবি আখেরি কেচ্ছার।।
লোগের খাহেস দেখে ভাবি মনে মনে।
আখেরি শায়েরি পুথি হইবে কেমনে।।"

তখন তাঁহার এই ভাষা লিপিবদ্ধ করার জন্য বাঙ্গালা-হরফের চেয়ে ফারসী হরফ অধিক সুবিধাজনক ছিল, সন্দেহ নাই। এইজন্য তিনি যদি বাঙ্গালা বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া ফারসী বর্ণমালার সাহায্য লইয়া থাকেন, তাহাতে কিছুই অন্যায় হয় নাই।

ঠিক এই সময়ে, পূর্ববঙ্গের, বিশেষতঃ, চট্টগ্রাম বিভাগেব, মুসলমানেরা কবি আলাওলের "পদ্মাবতী' কাব্যে ব্যবহৃত অপূর্ব সৌষ্ঠবশালী সংস্কৃত-প্রধান ভাষাকেও আরবী হরফে লিখিবার প্রয়াস পান। পদ্মাবতী কাব্যের—

"আজানুলম্বিত কেশ কস্তুরি সৌরভ।
মহা অন্ধকারে যেন দৃষ্টি-পরাভব।।
স্বর্গ হইতে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহা শুদ্ধ পথ।।"

প্রভৃতির ন্যায় ভাষাকে স্বল্প-সংখ্যক আরবী হরফে প্রকাশ করিতে হইলে তাহাতে লেখক, পাঠক ও ভাষার যে-দুর্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার ষোল আনা আরবী হরফে লেখা এই বাঙ্গালা পুঁথিগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই সময়ে অনেকেই এই পুঁথিগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়াছিলেন; নতুবা এই পুঁথিগুলির ভাল পাঠোদ্ধার হইত কি-না সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস, মুস্লিম রাজশক্তির পতন, ব্যাপক চেষ্টার অভাব, ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধতা প্রভৃতি নানাকারণে বাঙ্গালা-ভাষাকে ফার্সীকৃত করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা এদেশে হয় নাই।

এইরূপ নানা সাময়িক ব্যাপার "মুসলমানী বাঙ্গালা" কথার সৃষ্টির মূলে ক্রিয়া করিয়া থাকিবে। বাঙ্গালার মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার

এক নগণ্য ও তুচ্ছ অংশবিশেষকে "মুসলমানী বাঙ্গালা" নাম দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহাও খুব সাবধান উক্তি নহে; কেননা, উপর্যুক্ত কারণে এই সময়ের হিন্দু সাহিত্যও 'মুসলমানী' সাহিত্যে জড়াইয়া যায়। এই বাঙ্গালাকে "মুসলমানী বাঙ্গালা না বলিয়া যদি "উর্দুকৃত বাঙ্গালা বলা যায়, তবে কতকটা সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। আমাদের মতে এইরূপ কোন নাম দেওয়াই সমীচীন নহে। বাঙ্গালা ভাষার প্রগতির ইতিহাসে ইহা একটি স্তর মাত্র। যদি একান্তই এই স্তরটির নাম দিতে হয়, ইহাকে উর্দু স্তর' ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না; কেননা উর্দুর সঙ্গে ফারসী, আরবী ও হিন্দী মিশ্রিত আছে।*

* রচনাকাল—নভেম্বর, ১৯৪৭ ইং

চট্টগ্রামী বাংলায় বৌদ্ধ-প্রভাব

চট্টগ্রামের কথ্য ভাষাটি সাধারণ লোকের মতে বাংলা ভাষারই বিকার বা বিকৃতি মাত্র। এই ধারণা চট্টগ্রামবাসীর মনেও এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা অনেক সময় তাহাদের স্থানীয় বুলিতে (dialect) কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে আমার ধারণা একটু অন্যরূপ; এই জন্য আমার এই বিষয়ে জ্ঞানও একটু স্বতন্ত্র। আমার মতে চট্টগ্রামী বুলি বাংলা ভাষার বিকার বা বিকৃতি নহে, ইহা এই ভাষারই চট্টগ্রামী বিকাশ। চট্টগ্রামী বুলি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি,---এই অঞ্চলের "মঘ্" হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং নানা পার্বত্য জাতির পারিপার্শ্বিকতায় বাস-হেতু, বাংলা ভাষা স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলে বর্তমান আকারে বিকশিত হইয়াছে। ইহার বিকাশের ধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষারই অনুরূপ, তবে ইহা শব্দ-সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ প্রভৃতি কতকগুলি কথ্য বুলিসংক্রান্ত ব্যাপারে বাংলা ভাষাকে বেশ একটু ছাড়াইয়া গিয়াছে; যথা :----

(১) সংস্কৃত "তঙ্কা", বাংলায় "টাকা", এবং চট্টগ্রামে "টেয়া" বা "টেয়াঁ"।

(২) সংস্কৃত "উচ্ছেদ" + বাংলা "ইয়া" = "উচ্ছেদিয়া", চট্টগ্রামে "উচ্ছাইদ্যা"।

(৩) বাংলা "কাকা", চট্টগ্রামে "কা" বা "কাউ"।

(৪) বাংলা "সেইস্থান দিয়া" = "সেখানদি" = "হিয়ান্দি", "হিন্দি"।

(৫) বাংলা "ও বাবা" চট্টগ্রামী "ওবা"।

আর অধিক উদাহরণের আবশ্যক কি? চট্টগ্রামী বুলি বাংলা-ভাষার বিকাশ বা বিকার যাহাই হউক না কেন, ইহাতে বাংলা কথারই প্রাধান্য। বাংলা ছাড়িয়া ইহাতে যদি "পালি" অর্থাৎ "মাগধী প্রাকৃতের" শব্দ পাওয়া যায়, তবে ইহার কারণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়।

"পালি" বৌদ্ধ ধর্মের বাহনমূলক ভাষা। প্রাচীন এবং তৎসূত্রে আধুনিক বৌদ্ধদের অস্থিমজ্জার সহিত এই ভাষা জড়িত। সুতরাং চট্টগ্রামী বুলিতে "পালি" ভাষার শব্দ পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে, এ-দেশের সহিত বৌদ্ধদের প্রভাব এক সময়ে জড়িত ছিল। চট্টগ্রামী বুলির ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া, অনেক সময় এই বুলিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ছাপ আমার নজরে পড়িয়াছে। সাময়িকভাবে অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও চট্টগ্রামে বৌদ্ধ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির পোষকতায় কোন লিখিত পুস্তকপুস্তিকা এ যাবৎ আমার হস্তগত হয় নাই। চট্টগ্রামের স্বনামখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের নিকট এ-হেন একখানা পুস্তক আছে বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ইহা দেখিবার সৌভাগ্য এখনও আমাদের হয় নাই।

চট্টগ্রাম বর্তমান বাংলা দেশের একটি প্রধান বৌদ্ধকেন্দ্র। বাংলার যে জেলায় সর্বাধিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাস করিয়া আসিতেছে, তথায় বৌদ্ধ-প্রভাব থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। এই পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নাই বলিয়া, আমরা চট্টগ্রামে বৌদ্ধ-প্রাধান্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত নহি। তথাপি এ-জেলায় বৌদ্ধ-প্রাধান্য সংস্থাপনের একটি ধারা নির্দেশ করিতে নিম্নে চেষ্টা করিলাম।

"রাজোয়াং" (রাজবংশ) প্রমুখ আরাকানের জাতীয় ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়, খ্রীস্টীয় অষ্টম, এমন কি তাহারও এক শতাব্দী পূর্বে মগধ (বর্তমান পাটনা, প্রাচীন পাটলিপুত্রের সমীপবর্তী বিহার অঞ্চল) হইতে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুর দ্বারা আরাকানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের অধিবাসীরা আরাকানকে "রোসাং" নামে পরিচয় দিয়া থাকে। দেশের এই নাম বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা প্রদত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; ইহার অর্থ নাকি রক্ষঃপুরী। এই যে আরাকানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা খ্রীস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে ধর্ম প্রচার করিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জলপথে আরকানে গমন করেন নাই। স্থলপথে চট্টগ্রাম না হইয়া আরকানে যাইবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে খ্রীস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতেই চট্টগ্রামের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম ও প্রভাব সংশ্লিষ্ট ছিল।

ইহার পর চট্টগ্রামে কিভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি (Religion and Culture) ক্রিয়া করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অতীতের অন্ধ-যবনিকান্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই সময়ে চট্টগ্রাম আরাকান-অধিকারে ছিল কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে ; তবে ইহার পরে অর্থাৎ খ্রী'টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বহু শতাব্দী পর্যন্ত, চট্টগ্রাম বার বার আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের অধিকারে আসিয়াছে। সুতরাং চট্টগ্রাম বৌদ্ধপ্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না,---এ কথা বুঝিতে পারা যায়।

আরাকানী বৌদ্ধদের প্রভাবে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি আজও দেশে "কেয়াং" নামে পরিচিত হইতেছে। এই "কেয়াং", শব্দটি খাঁটি আরাকানী শব্দ। চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা কাগজে-পত্রে "বড়ুয়া" আখ্যায় পরিচিত হইলেও, সাধারণতঃ "মঘ্" নামে খ্যাত। তাহাদের এই "মঘ্"-খ্যাতি তাহাদের উপর আরাকানী প্রভাবেরই ফল। চট্টগ্রামের লোকেরা আরা-কানের অধিবাসীকে 'মঘ্' নামে অভিহিত করে। মঘেরা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিল। চট্টগ্রামে আরাকান অধিকারকালে চট্টল-বৌদ্ধেরা নিশ্চয়ই স্বধর্মা-বলম্বী আরাকানীদের কাছ হইতে সুযোগ সুবিধা লাভ করিত। চট্টল-বৌদ্ধদের স্বার্থের সহিত আরাকানী বৌদ্ধদের স্বার্থ এক হইয়া পড়ায়, চট্টল-বৌদ্ধেরাও 'মঘ্' নামে পরিচিত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে আর্য বংশজাত চট্টল-বৌদ্ধদের রক্তের সহিত মঙ্গলয়েড্ গোত্রভুক্ত আরাকানী বৌদ্ধদের রক্তের বিস্তর সংমিশ্রণ ঘটে। তাহার ফলে, এখনও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের অনেকের অনুন্নত নাসিকা ও গোলাকৃতিবিশিষ্ট চেপ্টা মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, চট্টগ্রামে প্রথমতঃ পশ্চিম দেশের (অর্থাৎ বিহার অঞ্চলের) পূর্বগামী (অর্থাৎ আরাকানগামী) বৌদ্ধ-প্রভাব অনুভূত হইয়া ছিল। তারপর পূর্বদেশের (অর্থাৎ আরাকানের) পশ্চিমমুখী (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গমুখী) বৌদ্ধ-প্রভাব চট্টগ্রামে অনুভূত হয়। এই সময়ে পশ্চিম দেশ হইতে আর একটি বৌদ্ধ-প্রভাবের ধারা চট্টগ্রামে আসিয়াছিল ; খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজাদের পতনের পর, শক্তি ও তান্ত্রিকতাপন্থী হিন্দু সেন রাজারা যখন বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন বঙ্গ ও বিহারে বৌদ্ধদের দুর্গতি চরমে উঠিয়াছিল। এই সময়ে সেন রাজাদের অত্যাচারে দেশ হইতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হয় নির্বাসিত হইয়া, নয় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিল। এই সময়ে অনেক

বৌদ্ধ সুদূর তিব্বতে এবং বাংলার সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, এই সময়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 'মঘ' রাজাদের অধীনে থাকায়, বঙ্গ ও বিহারের অনেক বৌদ্ধ চট্টগ্রামে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে। এইরূপ বৌদ্ধ-প্রভাব-ধারার আবর্তে চট্টল-ভূমি পরিপূর্ণ ছিল। এই জেলার বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইতিহাস এই আবর্তেরই ইতিহাস।

উপর্যুক্ত সাধারণ আলোচনা হইতে বেশ অনুমিত হইবে,---চট্টগ্রামে বৌদ্ধপ্রভাব কত প্রাচীন ও দীর্ঘস্থায়ী; সুতরাং ইহা যে ব্যাপক হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহার ব্যাপকত্ব এত অধিক যে, ইহা চট্টল জীবনের গণ্ডী ছাড়াইয়া জেলার কথ্য বুলিতেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু পালি-ভাষাকে সঙ্গে লইয়াই এই জেলায় আগমন করেন। বিহারের পলাতক বৌদ্ধেরাও পালি-ভাষা বলিত এবং বাংলার বৌদ্ধেরা এই ভাষাকে ধর্মভাষারূপে ব্যবহার করিত। ইহার ফলে চট্টগ্রামের কথ্য বুলিতে আজও পালিভাষার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

সচরাচর দেখা যায়, চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সকলেই সোজা, সরল, ঋজু অর্থে "উজু" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে, "কন্ পঁথে যাইয়ুম্?" = কোন্ পথে যাইব? 'উজু পঁথে যাইছ্" =-সোজা পথে যাইস্। তাহারা যখন এই "উজু" শব্দ ব্যবহার করে, তখন তাহাতে কোন বৌদ্ধ গন্ধ পায় কি না জানি না, তবে ইহা বৌদ্ধ ধর্মের বাহন পালি ভাষারই শব্দ। এই শব্দ বাংলা দেশের কুত্রাপি প্রচলিত নাই।

চট্টগ্রামের মুসলমানেরা যখন "দুতীয়া বিয়া" বা দ্বিতীয় বিবাহ করে, কিংবা হিন্দুরা যখন প্রতিপদের পরবর্তী চাঁদকে "দুতীয়ার চান্" বলিয়া উল্লেখ করে, তখন ভুলেও মনে করে না যে, তাহারা নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধদের পালিভাষার কথাই ব্যবহার করিতেছে। "দুতীয়" ছাড়িয়া "তিতীয়" পর্যায়ে পেঁৗছিয়াও তাহারা বৌদ্ধপ্রভাবকে ছাড়াইতে পারে না।

চট্টগ্রামের অধিবাসীরা, বিশেষতঃ মুসলমানগণ, যখন "মেঝো ভাই"কে "মাইজ্ঝা" বলে, এবং অন্যান্য বস্তুর জন্য সংস্কৃত "মধ্যম" শব্দের পরিবর্তে "মাঝিলা" শব্দ ব্যবহার করে, তখন আমার মনে হয়, বৌদ্ধদের "মজ্ঝিম নিকায়" নামক ধর্মগ্রন্থের "মজ্ঝিম" অর্থাৎ 'মধ্যম' শব্দ হইতে

কি "মাইজ্ঝা" বা তৎসঙ্গে স্বার্থে "ল"-প্রত্যয় যোগে "মাঝিলা" শব্দ গঠিত হয় নাই?

চট্টগ্রামী মঙ্গলকামী ব্যক্তি যখন মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তিকে কোন কাজ করিতে বলিবার পর, মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মঙ্গলকামী ব্যক্তির ইচ্ছায় সায় দিতে না পারিয়া নানা তর্কের দ্বারা মঙ্গলকামী ব্যক্তির ইচ্ছায় ভুল প্রতিপন্ন করিতে চাহে, তখন মঙ্গলকামী ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া মঙ্গলপ্রার্থীকে "উজ্ঝতি" অর্থাৎ উল্টা তর্কবিতর্ক, বা বাদ-প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করে। তাই দেখিতে পাই,---

প্রভু---"ঔডা, আজুয়া বা আজিয়া ভাত্ ন খাইছ্;--- তোর জ্বর উডিব।"
ও বেটা, আজ ভাত খাইস্ না;---তোর জ্বর আস্‌বে।

চাকর---"না, কডে আজুয়া জ্বর উডের্; বঅ-র্ ভোগ্ লাইগ্ গে; কি হইব, চার্‌গুয়া ভাত্ খাই এনা।"

না, কোথায় আজ্‌কে জ্বর আস্‌ছে; খুব খিধা পেয়েছে; কি হবে, চারটে ভাত খাই না।

প্রভু---"ঔডা, 'উজ্ঝতি' ন করিছ্. ত; আঁই কইর্' জ্বর্ উডিব।
ও বেটা, প্রতিবাদ করিস্ না ত; আমি বলছি জ্বর্ আস্‌বে।

এই "উজ্ঝতি" শব্দটি, পালি "উজ্ঝত্তি" শব্দ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। অন্ত্যসংযুক্ত "ত" বর্ণ চট্টগ্রামী উচচারণে লোপ পাইবার কারণ আছে।

আর অধিক উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ কণ্টকিত করার কোন কারণ নাই। চট্টগ্রামী বাংলা-বুলিতে এবংবিধ অনেক পালি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে বৌদ্ধপ্রভাব প্রাচীন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলে, পালি ভাষার এত প্রভাব চট্টগ্রামী বুলিতে কোথা হইতে আসিল? বিশেষতঃ বাংলার অন্যত্র এই শব্দগুলির প্রচলন নাই।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা চট্টগ্রামে বৌদ্ধপ্রভাবের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিলাম মাত্র। এ-বিষয়ে চট্টলার বৌদ্ধ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদের সহযোগিতা ও সাহচর্য পাইলে, আমরা এই কাজে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত আছি।

পাকিস্তানী ভাষার জন্য রোমান হরফের ব্যবহার

(পাকিস্তানী ভাষার জন্যে রোমান অক্ষর গ্রহণ করা সম্পর্কে পাকিস্তান জাতীয় কমিশন কর্তৃক সংকলিত প্রশ্নমালার জবাবে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রশ্নাবলী এবং তার জবাব ইংরেজী ভাষাতেই লেখা। এখানে মূল প্রশ্নসহ ডক্টর হকের জবাবগুলির তর্জমা প্রকাশ করা হ'ল।— সম্পাদক)

প্রশ্ন : ১৮৬।। পাকিস্তানে রোমান হরফ গ্রহণ আপনি অনুমোদন করেন কি ?

জবাব।। না। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এ-প্রস্তাব অযৌক্তিক এবং জাতি হিসেবে পাকিস্তানীদের জন্যে এ আত্মঘাতী। এ-প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা লাভবান হব যৎসামান্য; কিন্তু জাতির উন্নতির সহায়ক এমন অনেক কিছুই আমরা হারাব। সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করছি :

(ক) পাকিস্তানের মত রাষ্ট্র যেখানে বহুসংখ্যক ধর্ম, ভাষা এবং হরফ বিদ্যমান, তার জাতীয় ঐক্যের কথা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তা' অবাস্তব। বর্তমান পৃথিবীর বহু ধর্মাবলম্বী এবং বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলি আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সমন্বয়েও এক রাষ্ট্র বা এক জাতি গ'ড়ে তোলা সম্ভব। পক্ষান্তরে এক ধর্মাবলম্বী এবং এক ভাষাভাষী লোকেরাও পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের নাগরিক।

(খ) কোন বিশেষ হরফ বহু ভাষাভাষী কোনো রাষ্ট্রে ভাষাগত ঐক্য আনতে পারে না। ভাষা না জানলে শুধু শুনে অথবা কোন বিশেষ হরফে প'ড়ে তা' কারো বোধগম্য হয় না। একই হরফে দু'টি বা তারও বেশী ভাষা লেখা হ'লে, তা' পড়তে পারলেও, ভাষাজ্ঞান না থাকলে কারও ভাষাগত ব্যুৎপত্তি কিছুমাত্র বাড়বে না। 'ইউরোপের সব জাতিই' তাদের ভাষার জন্যে রোমান হরফ ব্যবহার করে; কিন্তু তার ফলে এমন ঐক্য গ'ড়ে ওঠেনি যাতে গোটা ইউরোপ একটা মাত্র জাতিতে

পরিণত হতে পারে। আরব জাতিগুলির ভাষা এবং হরফ এক, ইংরেজ এবং আমেরিকানদেরও ভাষা ইংরেজী এবং হরফ রোমান, কিন্তু তারা এক জাতি নয়।

(গ) ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে রোমান হরফ পাকিস্তানী ভাষাগুলির সমস্ত ধ্বনি উৎপাদন করতে পারে না। পাকিস্তানী ভাষার যাবতীয় ধ্বনি সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে গেলে রোমান হরফে আরও অনেক সংযোজন আবশ্যক। ফলে রোমান হরফের ধ্বনিতাত্ত্বিক আকৃতির আমূল পরিবর্তন হ'য়ে তা' একটি নতুন ধরনের পাকিস্তানী হরফে পরিণত হবে এবং হরফ-সমস্যা আরও জটিল হ'য়ে উঠবে। কাজেই পাকিস্তানী ভাষা-গুলির জন্যে রোমান হরফের প্রবর্তন ক'রে আমরা আমাদের হরফের তালিকায় আর একটি নতুন হরফ যোগ করব মাত্র; তাতে জাতীয় লাভ হবে না কিছুই।

(ঘ) পক্ষান্তরে রোমান হরফ গ্রহণ করলে পাকিস্তানী হরফে লেখা আমাদের যাবতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য ভবিষ্যৎ-কালের জন্যে একটি নিষিদ্ধ পুস্তকের মতই গণ্য হবে। কারণ, আমাদের যাবতীয় সাহিত্য সম্পৎ রোমান হরফে পুনর্লিখনের বিপুল ব্যয়ভার বহন করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই হিসেবে রোমান হরফ গ্রহণ করার নীতি আমাদের জাতির পক্ষে আত্মহত্যার শামিল হবে।

(ঙ) মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি রোমান হরফ গ্রহণ না করলে, ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান তা করতে পারে না, করা উচিতও নয়। কারণ, তা হ'লে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মুহূর্তে ছিন্ন হ'য়ে যাবে! আমার মনে হয় আগামী বহু শতাব্দী পর্যন্ত আমরা তেমন ঝুঁকি নিতে পারি নে।

প্রশ্ন: ১৮৭-ক।। আপনি কি মনে করেন এই পন্থায় জনশিক্ষা ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে?

জবাব।। না। যে-দেশে প্রচলিত হরফেই তার সবগুলো ভাষা মিলিয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৫ জনের বেশী নয়, বুঝতে হবে গলদ সেখানে হরফে নয়, আসল গলদ শিক্ষা-পদ্ধতিতে। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষা দেবার মত উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক বা প্রয়োজনীয় উপাদান কোথায়?

দেশের তেমন আর্থিক সামর্থ্যই বা কোথায়? বৃহত্তর পরিসরে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে কোনো রকম পরীক্ষা না করেই ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা কি ভাবে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে, সে সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের উচিত নয়। তেমন সিদ্ধান্ত নির্ভুল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক হবে না, তা হবে কল্পনা-ভিত্তিক।

এ ছাড়া, পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনি যথার্থ ভাবে প্রকাশ করতে গেলে রোমান হরফের যে নতুন চেহারা দাঁড় করাতে হবে, তাতে পাকিস্তানী হরফের ধ্বনিতাত্ত্বিক জটিলতার সব কিছুই থাকবে। প্রত্যেকটি ধ্বনির যাথার্থ্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হ'লে পাকিস্তানী শব্দ অনুসারে রোমান হরফেও পড়া, লেখা এবং বানানের জটিলতার সবই থেকে যাবে এবং ছাত্রদের তা পড়তে হবে শিখতে হবে এবং লিখতে হবে। কাজেই জনশিক্ষার জন্যে প্রচলিত হরফে যে-সময় লাগে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হবে না।

প্রঃ ১৮৭-খ।। আপনি কি মনে করেন, এই পন্থা স্কুলের ছাত্রদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা শিখবার ভার লাঘব করবে?

জবাব।। ছাত্র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে কোন্ ভাষা শিখবে তার ওপরেই এ-প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে। মাতৃভাষা ছাড়াও কোন ছাত্র যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা হিসেবে একটি পাকিস্তানী এবং একটি ইউরোপীয় ভাষা শিখতে চায় তা হ'লে তার হরফ শিখবার সময় হয়ত কিছুটা বাঁচবে। তা হ'লেও তাকে ইউরোপীয় ভাষার অক্ষর বহু ক্ষেত্রেই নতুন ক'রে শিখতে হবে।

যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষা ইংরেজী এবং আরবী অথবা ফারসী হয় তা হ'লে পাকিস্তানী ভাষার ধ্বনি-ভিত্তিক পাকিস্তানী রোমান হরফ তার বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না। কারণ, আরবী এবং ফারসীর ক্ষেত্রে ছাত্রটিকে আরবী ও ফারসী হরফ আবার নতুন ক'রে শিখতে হবে।

প্রঃ ১৮৭-গ।। আপনি কি মনে করেন, এই ব্যবস্থায় একটি জাতীয় ভাষা গ'ড়ে উঠবে এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে?

জবাব।। ভাষা-বিজ্ঞানের দিক থেকে এই ধারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন। এ-বিষয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি। কোন বিদেশী হরফকে যদি একটি ভাষার মৌলিক শব্দ উৎপাদনের উপযোগী ক'রে গ্রহণ করা

হয়, তা হ'লে সে-হরফ উক্ত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক চরিত্র কিছুমাত্র বদলাতে পারে না। উদাহরণতঃ আরবী-ভাষা আরবী হরফে লিখলে বা বাংলা, সাঁওতালী অথবা তুর্কী ভাষা রোমান হরফে লিখলে মূল ভাষা বদলে যায় না। কাজেই বাংলা, উর্দু, পাশ্‌তু, সিন্ধী, বেলুচী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার জন্যে হরফ গ্রহণ করলে তা'তে পাকিস্তানের একটি জাতীয় ভাষা গড়ে উঠবে না। কাজেই কোন 'হরফ' জাতীয় ঐক্য বিধানের সহায়ক হবে না। জাতীয় ঐক্য গ'ড়ে তোলার উপকরণ আমাদের অন্যত্র খুঁজতে হবে---'হরফে' তা পাওয়া যাবে না।

প্রঃ ১৮৭-ঘ।। এই ব্যবস্থা মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের অধিকতর সহায়ক হবে কি?

জবাব।। আমি মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ নই। তবে আমার মনে হয় মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের সুবিধা অসুবিধা মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রকাশকদের ওপরই নির্ভর করে। এখানে হরফের প্রশ্ন নিতান্ত গৌণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে আমরা উন্নততর মুদ্রাযন্ত্র তৈরি করতে পারি। তা ছাড়া বহু সংখ্যক লেখক এবং পাঠক গ'ড়ে তুলতে পারলে, আমার মনে হয়, আমাদের হরফের যান্ত্রিক আকৃতি দ্রুত এবং ব্যাপক মুদ্রণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না।

প্রঃ ১৮৭-ঙ।। এই ব্যবস্থায় আর কোন সুদূর-প্রসারী সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

জবাব।। ১৮৬-চ অনুচ্ছেদে আমি এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছি।

বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অভিধান

[প্রস্তুতি-নীতি]

১। **এই অভিধানের লক্ষ্য**:—নামই এই অভিধানের লক্ষ্যের পরিচায়ক। বিগত পচিশ বৎসর যাবৎ বাংলাদেশে বাংলা-ভাষার যে-বিবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে, তাহার শব্দ-সম্পৎকে (vocabulary) বাংলা অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়াই বর্তমান পরিকল্পনাভুক্ত অভিধানের মূল লক্ষ্য। তাই বলিয়া ইহাতে যে শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট শব্দ-সম্পৎ স্থান পাইবে এমন নহে; ইহাতে বৃটিশ আমলের বাংলার যাবতীয় শব্দ-সম্পৎ-ও স্থান লাভ করিবে। কারণ, বাংলাদেশের ও পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা বৃটিশ যুগের বাংলার বর্ধিত সংস্করণ মাত্র। এই কথা একান্ত সত্য যে, বাংলাদেশী বাংলার পনের আনী শব্দ বৃটিশ আমলেরই উত্তরাধিকার। তথাপি, এই এক আনী পরিমাণ বাংলাদেশী শব্দের জন্য এই স্থানের যাবতীয় খ্যাতনামা লেখকের সর্ববিধ লেখা তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া এই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। (এই কাজটি সর্বাগ্রে একদল উপযুক্ত লোক দ্বারা করাইয়া লইয়া 'সংসদ অভিধানে'র শব্দাবলীর অঙ্গীভূত করিয়া লইলেই, কাজটি সহজেই সমাধা হইতে পারে। কারণ, 'সংসদ অভিধানে' ইংরেজ আমলের বাংলার যাবতীয় প্রচলিত শব্দ, বিধৃত ও সাজানো আছে।) অতএব, এই অভিধানে কি-কি জিনিস স্থান পাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। নিম্নে সংক্ষেপে তাহার একটা ধারণা দেওয়া যাইতেছে:—

(ক) আধুনিক বাংলা-ভাষার অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী কালে ব্যবহৃত বাংলা-ভাষার যাবতীয় তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ, বাগ্‌ধারা, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি এই অভিধানে থাকিবে।

(ক) ভাষার ‘সাধু’ও ‘চলিত’—এই দুই রূপের শব্দ এই অভিধানে স্থান পাইবে। কেননা, সাহিত্যে ব্যবহৃত ‘চলিত-ভাষা’ সাহিত্যে ব্যবহৃত ‘সাধু-ভাষা’র ন্যায় বাংলা-ভাষার একটি লিখিত রূপ।

(গ) বাংলাদেশের নামজাদা লেখকেরা তাঁহাদের লেখায় যে-সমস্ত বিশিষ্ট স্থানীয় শব্দ, বাক্যাংশ (phrases), বাগধারা (idoms) ব্যবহার করিয়াছেন, এই অভিধানে উদাহরণসহ তাহার স্থান দিতে হইবে।

(ঘ) যে-সমস্ত ইংরেজী শব্দের নূতন বাংলা প্রতিশব্দ তৈয়ার করিয়া সাংবাদিকেরা বাংলা খবরের কাগজে ব্যবহার করিতেছেন, যেমন ‘বিমান-বালা’ (air-hostess), ‘প্রমোদ-বালা’ (gay girls) ‘হাওয়াই জাহাজ’ (airoplane), ‘কাঁদুনে গ্যাস’ (tear gass) ‘হাওয়াই আড্ডা’ (airodrome), ‘মহাশূন্য’ (space) ইত্যাদি ইত্যাদি, এইগুলিকে এই অভিধানে গ্রহণ করিতে, হইবে।

(ঙ) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবহৃত কোন-কোন বিশিষ্ট শব্দ ; সাহিত্যে খ্যাতনামা লেখক কর্তৃক গৃহীত হয় নাই এমন অপ্রচলিত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত শব্দ ; এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যে, ব্যবহারের অনুপযুক্ত বলিয়া খ্যাতনামা লেখকদের লেখা হইতে বাদ পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, এমন শব্দ ইহাতে সাধারণতঃ রাখা হইবে না।

(চ) বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখকদের লেখায়, বিশেষ করিয়া তাঁহাদেব উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্পে, স্বাভাবিকতার রূপ দেওয়াব জন্য এখানকার স্থানীয় উপভাষাও অধুনা ব্যবহৃত হইতেছে। এই ঔপভাষিক শব্দ-সম্পৎ হইতে যেগুলির সাহিত্যিক-যোগ্যতা আছে, অথবা এমন কোন বিশিষ্ট অর্থ রহিয়াছে, যাহার সমভাবপ্রকাশক সাহিত্যিক শব্দ নাই, সেই-গুলিকে বাছিয়া অভিধানে গ্রহণ করা হইবে।

২। **এই অভিধানের বানান-পদ্ধতি ঃ**—এই অভিধানে কিরূপ বানান-পদ্ধতি অনুসৃত হইবে, সে-বিষয়েও পূর্বাহ্ণেই ঠিক করিয়া লইতে হইবে। অন্য কোন কথা চিন্তা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, এই বানান-পদ্ধতি বাংলাদেশে ব্যবহৃত **আধুনিক বানান-পদ্ধতি** হইতেই

হইবে। নতুবা, এই অভিধান রচনার সার্থকতা কি? বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাংলা-বানানের রীতি, নীতি ও বিশেষ-প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই অভিধানে **নিম্ন-লিখিত বানান-পদ্ধতি** গৃহীত হইবে। তবে, যে-সমস্ত শব্দের বানানে সকলেই একটা শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের বানানে কোন প্রকারের সংস্কার অথবা গ্রহণ - বর্জনের প্রশ্ন উঠানো হইবে না। যে-সমস্ত শব্দের বানানে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সাহিত্যিক দের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, সেগুলিতে এমন একটা পদ্ধতি বা শৃঙ্খলা অনুসৃত হইবে, যাহাতে ভাষার সঞ্জীবনী-শক্তির মূলে আঘাত হানা হইবে না, এবং তদ্দ্বারা কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনও সাধিত হইবে না।

বানান-পদ্ধতি

(আধুনিকতম)

(ক) বাংলাদেশের বাংলা-সাহিত্যে ব্যবহৃত বানানের ক্ষেত্রে বর্তমানে (১৯৭৬) যে-সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার শৃঙ্খলা বিধান করিতে হইলে, শব্দগুলিকে এই কয়টি ভাগে ভাগ করিতে হইবে:---

অ। তৎসম (=সংস্কৃত) —সংক্ষেপ (তৎ)
আ। অর্ধ-তৎসম — ,, (অর্ধ)
ই। তদ্ভব (=সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত)— ,, (তদ)
ঈ। দেশী (=অজ্ঞাতমূল) — ,, (দেশী)
উ। বিদেশী* — ,, (বিদে)

*{ইহার অন্তর্গত: আরবী (আ); ফারসী (ফা); উর্দূ (উ); হিন্দী (হি); পর্তুগীজ (পর্তু); ইংরেজী (ইং); ফরাসী (ফ); জর্মন (জ); ওলন্দাজ (ওল); চীনা (চী); বর্মী (ব); রুশীয় (রু)}

দ্রষ্টব্য :---মনে রাখা উচিত যে, 'বাংলা' শব্দ বলিলে 'অর্ধ-তৎসম', 'তদ্ভব' ও 'দেশী'----এই তিনটি বিভাগের শব্দকে এক সঙ্গে বুঝায়। স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (Naturalised) বিদেশী শব্দও ইহার অন্তর্গত। কেননা, এইগুলিও বাংলাই।

(খ) বাংলাদেশের বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী কোন প্রকারের শব্দে 'রেফের' পর ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হইবে না ; যথা—

তৎসম---কর্তা ; সূর্য ; কার্তিক ; আশ্চর্য ; ঊর্ধ্ব ; ইত্যাদি

অর্ধ-তৎসম---ফুর্তি ; আস্পর্ধা ; সর্বেসর্বা ; ইত্যাদি।

তদ্ভব---দেরকো---দের্কো ; তর্শু < তরশু < তিরঃশ্বঃ ; শাঁখচুর্নী=শাঁখচুন্নী: ইত্যাদি

দেশী----ফর্সা ; ভর্তি ; ধর্‌ণা=ধর্না ; ঝর্না ইত্যাদি

বিদেশী---পর্দা ; জর্মন ; শর্ত ; কোর্তা ; ছুর্রা ; বার্লি ; সুর্কি ; সুর্মা ;

(গ) ঙ্‌=ং:---বাংলাদেশের বাংলা-বানানে নগণ্য-সংখ্যক হুশিয়ার লেখক ব্যতীত অপর সকলেই বর্তমানে হসন্তান্ত্য 'ঙ্‌'-স্থলে নির্বিচারে ং-অনুস্বর লিখিতে শুরু করিয়াছেন। ইহাকে স্বীকার করিয়া না লইয়া অন্য উপায় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্বে পদান্তিক 'ম্‌'-বর্ণের সহিত পরপদের 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' আদ্য বর্ণবিশিষ্ট পদের সন্ধি হইলে 'ম'-স্থনে 'ঙ' না হইয়া 'ং' অনুস্বরের প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়াছিল ; যেমন, অহম্‌+কার='অহঙ্কার' স্থলে 'অহংকার' ; সম্‌+গীত='সঙ্গীত' স্থলে 'সংগীত' ; ভয়ম্‌+কর='ভয়ঙ্কর' স্থলে 'ভয়ংকর' ইত্যাদি। এই জাতীয় শব্দে ঙ্গ, ঙ্ক, প্রভৃতিতে 'ঙ্‌'+গ ; 'ঙ্‌'+ঘ ; 'ঙ্‌'+ক ইত্যাদির 'ঙ্‌' হসন্তান্ত্য। যে-সমস্ত শব্দে সন্ধির প্রশ্ন জড়িত নহে, যেমন অঙ্গ [তৎ√অন্‌গ্‌ (গমনকরা)+অল্‌ (র্ম)=অঙ্গ (যাহা সঙ্গে যায় অর্থাৎ 'শরীর)] ; অঙ্ক [তৎ√অন্‌ক্‌ (চিহ্ন দেওয়া, আঁকা)+অল্‌ (ণ)=অঙ্ক (যাহা দ্বারা চিহ্ন দেওয়া হয় অর্থাৎ 'এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা'] ; গঙ্গা [তৎ √গম্‌ (যাওয়া)+ড (ক)+স্ত্রী ং আপ্‌=গঙ্গা (যাহা ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতে গমন করিয়াছে) ইত্যাদি, সেই সমস্ত শব্দে 'ঙ্গ' অর্থাৎ 'ঙ্‌' +'গ' রক্ষিত হইয়াছিল। কারণ, ইহাতে শব্দের মূল বা ধাতু নির্ণয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। এতৎসত্ত্বেও, আমরা লিখন ও মুদ্রণের সুবিধার অজুহাতে যাবতীয় 'ঙ্গ'-সংযুক্ত বর্ণকে 'ংগ'-রূপে লিখিবাব প্রবণতা ও আধুনিকতম রীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারি। অবশিষ্ট কাজ বৈয়াকরণ ও ভাষাতাত্ত্বিকেরাই স্থির করিবেন। ইহা তাঁহাদেরই কাজ। তথাপি, এই অভিধানে বন্ধনীর মধ্যে পুরানো বানান লেখা হইবে, যথা—

অংক (অঙ্ক) ; সংগ (সঙ্গ) ; অহংকার (অহঙ্কার) ; ঠেং (ঠ্যাঙ্) ; জাইংগা (জাঙ্গিয়া) ; বেং (ব্যাঙ্) ; সং (সঙ্) ; গাঙ্, গাং (গঙ্গা) ; সংগীত (সঙ্গীত) ; সংঘ (সঙ্ঘ) ; সংখ্যা (সঙখ্যা) ; সংঘাত (সঙ্ঘাত) ; পংক্তি (পঙ্ক্তি) ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য :—সমস্ত স্বরান্ত-'ঙ' বানানে ঠিক থাকিবে ; যথা বাঙালী ; আঙুল ; আঙিনা ; বাঙাল ; ভাঙা ; ভাঙন ; আঙোট ; গাঙ্গেয় ; ইত্যাদি।

(ঘ) বাংলা শব্দে ই, ঈ, উ, ঊ এর ব্যবহার :

(অ) মূলে যাহাই থাকুক কেবল স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দ ব্যতীত অন্য যাবতীয় বাংলা শব্দে 'ঈ' বা 'ঊ' বর্জিত হইবে ; কারণ বাংলায় দীর্ঘ-স্বর নাই। যথা :—

অর্ধ—পংখি < পক্ষী ; পাংগাশ < পিঙ্গশ ; পাংখা < পক্ষ ;

তদ্—পাখি < পক্ষী ; কুয়ো < কূপ ; উনিশ < ঊনবিংশ ; কুমির < কুম্ভীর ; হাতি < হস্তী ; হিরা < হিরক ; ঘড়ি < ঘটী ; বাড়ি < বাটী ; গাড়ি < গন্ত্রী ;

দেশী—বঁটি ; ছড়ি ; ঢিবি ; কচি, কড়ি ইত্যাদি।

বি—ফন্দি ; বেশাতি ; মিনতি ; উকিল ; ফিস ; কবুল ;

(আ) স্ত্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা ও বিশেষণ-বোধক বাংলা শব্দের শেষে 'ঈ' ব্যবহার করিতে হইবে :—

স্ত্রী-বোধক শব্দ :—রানী ; বাঘিনী ; মেছুনী ; হরিনী, সাপিনী ; মেথরানী ; চামারনী ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম :—ঝি. দিদি, বিবি। (এই বানানে বহুল প্রচলিত)

জাতিবোধক শব্দ :—বাঙালী, কাবুলী, পাঞ্জাবী, ইরানী, মিশরী, জাপানী ইত্যাদি।

ভাষাবোধক শব্দ :—আরবী, ফার্সী, ইংরেজী ইত্যাদি।

বিশেষণ-শব্দ :—দামী, বেশী ; সুতী : রেশমী, বিলাতী, দাগী ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম :—কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি।

(ঙ) ঋ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দ :

তৎসম শব্দের বেলায় 'ঋ-কারান্ত' ও 'ব্যঞ্জনান্ত' শব্দের প্রমথার এক বচনে যেইরূপ হয়, বাংলাভাষায় তাহাই চলিত, এবং এখন তাহাব অসংখ্য

ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে; অথচ সমাস-সন্ধির বেলায় অজ্ঞতাসূচক ব্যতিক্রম ব্যতীত সজ্ঞানে ব্যতিক্রমের প্রশ্রয় দিতে বড় একটা দেখা যায় না। ভাষা বিকাশের পথে কোন প্রকারের বাধার সৃষ্টি না করিয়া, এইগুলিকে নিম্ন লিখিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়ঃ---

(অ) তৎসম 'ঋ-কারান্ত শব্দ প্রথমার একবচনে 'আ'-কারান্ত হয় এবং বাংলায় এই রূপগুলিই চলে। তবে, সন্ধি-সমাসে 'ঋ-কারান্ত মূল রূপ প্রযুক্ত হয়। এই অভিধানে প্রথমার এক বচনের রূপের সহিত বন্ধনীতে 'ঋ'-কারান্ত মূল রূপগুলিকে দেখাইয়া দিতে হইবে, যেন শব্দগুলির সাহায্যে সন্ধি-সমাস গঠন করিতে হইলে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয়ঃ-
কর্তা (কর্তৃ)---কর্মকর্তা, কর্তৃকারক; সৃষ্টিকর্তা, কর্তৃপক্ষ;

বাং—**কর্তা**ভজা

(আ) তৎসম 'হস্'-যুক্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রথমার এক বচনের রূপগুলি বাংলায় 'হস্'যুক্ত হইয়া পণ্ডিত-সমাজে এতকাল চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণ লেখক এই নিয়ম বড় একটা মানেন নাই। এখন আর কেহ এই রীতি মানিতেই চাহেন না। সুতরাং 'হস্'-চিহ্ন ছাড়াই এইগুলিকে অভিধানে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে, বন্ধনীতে মূলরূপগুলিকে দেখাইয়া দিতে হইবে। নতুবা, সন্ধি-সমাস গঠনে গোলযোগের সৃষ্টি হইবে; যেমন---
দিক (দিক্ < দিশ্)---দশদিক, কোন্ দিক, দিক্চক্রবাল, দিগন্ত, দিগ্দর্শন, দিগম্বর;
ত্বক (ত্বক্ < ত্বচ্)---ত্বক্সর্বস্ব, তগ্দোষ;
বিদ্বান (বিদ্বান্ < বিদ্বস্)---মহাবিদ্বান, বিদ্বজ্জন;
বণিক (বণিক্ < বণিজ্)---বণিক্কুল, বণিগ্বৃত্তি।

(চ) **শব্দান্ত্য খণ্ড-ৎঃ**

খণ্ড-ৎ স্বরান্ত-ত বর্ণের স্বরবর্জিত হসন্ত-রূপ হইলেও, যে-সমস্ত তৎসম শব্দের শেষে মূলে খণ্ড-ৎ রহিয়াছে, বাংলায় সে-শব্দগুলির ব্যবহারে বহুক্ষেত্রে 'দ-বর্ণ দিয়া লেখা হইয়াছে ও হইতেছে। এই অভিধানে এই

শব্দগুলিকে 'দ-বর্ণে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বন্ধনীর মধ্যে খণ্ড-'ৎ'-যুক্ত মূলরূপ দেখাইতে হইবে; নতুবা সমাস-সন্ধিতে গোল বাধিবে ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। উদাহরণ---

হৃদ (হৃৎ)---হৃৎপিণ্ড, হৃৎকম্প, হৃদ্‌রোগ, হৃদয় ইত্যাদি

বিপদ (বিপৎ)---বিপৎপাত, বিপজ্জনক, বিপদগ্রস্ত, বিপজ্জাল, বিপৎ-সংকুল ইত্যাদি

সম্পদ (সম্পৎ)---সম্পৎশালী, সম্পৎকাল, ইত্যাদি

সুহৃদ (সুহৃৎ)---সুহৃদ্বরেষু, সুহৃৎসুলভ ইত্যাদি

পরিষদ (পরিষৎ)---পরিষৎ-পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ, ইতিহাস-পরিষৎ, পরিষদ্‌-ভবন, পরিষৎপতি (Speaker) ইত্যাদি।

(জ) 'জ' বর্গীয় ও 'য' অন্তঃস্থ ঃ

মূলে বর্গীয়-'জ' অথবা অন্তঃস্থ-'য' যাহাই থাকুক, সমস্ত বাংলা শব্দে কেবল বর্গীয় -'জ' ব্যবহৃত হইবে। কারণ, বাংলা-ভাষায় উচ্চারণে এবং প্রায় ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লেখায়, দুই ধ্বনির উচ্চারণ ও লিখন-রীতি এক। সুতরাং, বাংলায় দুই ধ্বনিকে বর্গীয় করার পক্ষে কোন সংগত কারণে আপত্তি উঠিতে পারে না। উদাহরণ:---

কাজ<কার্য ; জুঁই<যুথিকা : জাঁতি<যন্ত্রী ;
জাউ<যবাগু ; জোত<যোত্র ; জৌঘর<জতুগৃহ ;
সুরুজ<সূর্য ; শেজ<শয্যা ;
জমি ; বাজার ; হজম ; রাজী ; হাজার ; জেল ;
জু (Zoo) ; জিনিয়া ইত্যাদি

(ঝ) 'ণ' মূর্ধন্য ও 'ন' দন্ত্য ঃ

তৎসম ব্যতীত বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত যাবতীয় শব্দে কেবল দন্ত্য-'ন ব্যবহৃত হইবে। তৎসম-শব্দে তাহার নিজস্ব নিয়ম অনুসারে দন্ত্য-'ন' অথবা মূর্ধন্য-'ণ' ব্যবহৃত হইবে। উদাহরণ,---নুন<লবণ ; বামুন<ব্রাহ্মণ কান<কর্ণ ; রানী<রাজ্ঞী ; কাঁকন<কঙ্কণ ; ফেশান ; বিরানা ; কোরান ; জানালা ; জর্মন ;

(ঞ) শ, ষ, স-ধ্বনির ব্যবহার ঃ

এই তিনটি শিসধ্বনি বাংলায় এক হইয়া তালব্য রূপে উচ্চারিত হয় সত্য, কিন্তু তদ্ভব শব্দের লেখার বেলায় তিনটিরই বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়। এইগুলির ব্যবহারে এ-যাবৎ একটা শৃঙ্খলাও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই শৃঙ্খলাটি প্রায় পূর্ণমাত্রায় মূলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং, তদ্ভব শব্দে শিসধ্বনিগুলি মূলের সহিত যথাসাধ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে ; যথা—

(অ) মহিষ > মোষ ; উনবিংশ > উনিশ ; বিংশ > বিশ ; সর্ষপ > সরিষা ; আশু > আউশ ; মশক > মশা ; শীর্ষ > শিষ ; সপ্ত > সাত; ষণ্ড > ষাঁড়; কৃষ্ণ > কেষ্ট।

ব্যতিক্রম ঃ---শ্রদ্ধা > সাধ ; মনুষ্য > মিন্‌সে

(আ) দেশী শব্দে সর্বত্র দন্ত্য-'স' ব্যবহার বিধেয়। কারণ এযাবৎ এই শ্রেণীর শব্দ-লিখনে দন্ত্য-'স' এর ব্যবহার অধিক মাত্রায় দেখা যায়। উদাহরণ,---ফর্সা ; উস্‌খুস্‌ ; ডাঁসা ; ঘুস্‌ঘুসে (ঘুষঘুষে ?), ঘুস (ঘুষ ?) ; ভুস্‌ ; ঠেস্‌ ইত্যাদি

(ই) বিদেশী শব্দে মূর্ধন্য-'ষ' ধ্বনি নাই। সুতরাং মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তালব্য-'শ' বা দন্ত্য-'স' লিখিতে হইবে ; যথা---জিনিস ; শহীদ ; চশমা ; মুসলমান ; পেন্সন ; ফেশান ; খ্রীস্টাব্দ ইত্যাদি। এতৎসত্ত্বেও, নূতন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভয়ে স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (Naturalised) শব্দের বহুল প্রচলিত বানানে হস্তক্ষেপ করা হইবে না ; যেমন---পছন্দ ; ছয়লাপ ; ইস্তাহার ; গোমস্তা ; কেচ্ছা ; ইত্যাদি।

(ট) 'র' ও 'স'-জাত এবং -'শস্‌' ও -'তস্‌' প্রত্যয়ান্ত বিসর্গ ঃ

বাংলায় এই সমস্ত বিসর্গের ব্যবহারে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া, সন্ধি-সমাসের ক্ষেত্রেই এই বিশৃঙ্খলা বেশী প্রকট হইয়া উঠে। 'সদ্যোজাত' (সদ্যঃ+জাত) স্থলে 'সদ্যজাত'; 'ইতঃপূর্বে' (ইতঃ+পূর্বে) স্থলে 'ইতিপূর্বে'; 'ততোধিক (ততঃ+অধিক) স্থলে 'ততধিক' যেন লেখায় ও বলায় স্থায়ী হইয়া যাইতেছে। পরিবর্তনের বর্তমান প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই ক্ষেত্রে যে-সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, তাহাকে নিম্ন উপায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল ঃ---

'স'-জাত বিসর্গঃ---অধঃ (অধস্) ; সদ্যঃ ('সদ্যস্) ; পয়ঃ (পয়স্) চক্ষুঃ (চক্ষুস্) ; মনঃ (মনস্) ; যশঃ (যশস্) ; শিরঃ (শিরস্); বহিঃ (বহিস্) ; প্রাদুঃ (প্রাদুস্) ; আয়ুঃ (আয়ুস্) ; ধনুঃ (ধনুস্) ; জ্যোতিঃ (জ্যোতিস্) ; পুরঃ (পুরস্) ; ভাঃ (ভাস্) ; অতঃ (অতস্) ; ইতঃ (ইতস্) ; ততঃ (ততস্) ; বয়ঃ (বয়স্) ; উরঃ (উরস্) ; আশিঃ (আশিস্)

'র'-জাত বিসর্গঃ---পুনঃ (পুনর্) ; প্রাতঃ (প্রাতর্) ; অন্তঃ (অন্তর্) ; চতুঃ (চতুর্) ; নিঃ(নির) ; দুঃ (দুর্) ;

'--তস্-প্রত্যয়ান্ত বিসর্গঃ---অন্ততঃ (অন্ততস্) ; বিশেষতঃ (বিশেষতস্); সাধারণতঃ (সাধারণতস্) ; ফলতঃ (ফলতস্) ; কার্যতঃ (কার্যতস্) ;

-শস্-প্রত্যয়ান্ত বিসর্গঃ---ক্রমশঃ (ক্রমশস্) ; প্রায়শঃ (প্রায়শস্) ; বহুশঃ (বহুশস্) ;

(অ) উক্ত 'স'-জাত ও 'র'-জাত বিসর্গান্ত্য শব্দাবলীর মধ্য হইতে অনেক শব্দের স্বতন্ত্র (অর্থাৎ সন্ধি-সমাস ব্যতীত একক) ব্যবহার বাংলা ভাষায় দেখা যায় ; যেমন---মন ; অত ; তত ; সদ্য ; চক্ষু ; যশ ; শির ; জ্যোতি ; পয় ; ধনু ; আয়ু ; প্রাত ইত্যাদি। এই জাতীয় শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র ব্যবহার কালে অন্ত্য-বিসর্গ বাদ দিয়া লিখিতে হইবে। অভিধানেও অন্ত্য-বিসর্গ বাদ দিয়া গ্রহণ করা হইবে ; তবে সমাস-সন্ধির খাতিরে শব্দের পরে বন্ধনীর মধ্যে মূলরূপ দেখাইয়া দিতে হইবে ; যথা---

প্রাত (প্রাতঃ < প্রাতর) সকাল, প্রভাত (প্রাতে ; প্রাতঃকালে ; প্রাতরাশ ; প্রাতঃস্মরণীয় প্রভৃতির ব্যবহার বন্ধনীর মধ্যে দেখাইতে হইবে)

মন (মনঃ < মনস্) চিত্ত, হৃদয়, (মনঃপুত ; মনোযোগ ; মনস্তাপ ; মনোরম ; মনঃকষ্ট ইত্যাদি)

(আ) উক্ত 'স'-জাত ও 'র'-জাত বিসর্গান্ত্য শব্দাবলীর মধ্য হইতে যে-সমস্ত শব্দের স্বতন্ত্র ব্যবহার বাংলা-ভাষায় নাই, সে-সমস্ত শব্দকে অভিধানে পৃথক্ শব্দরূপে দেখানো অনাবশ্যক হইলেও, এই পর্যায়ের শব্দের পূর্বে বিসর্গসহ দেখাইতে হইবে ; যেমন---প্রাদুঃ (প্রাদুস্) ; নিঃ (নির) ; দুঃ (দুর্) ইত্যাদি। নতুবা পরবর্তী শব্দের অর্থ বুঝিতে অযথা অসুবিধার সৃষ্টি হইবে।

দ্রষ্টব্য :--- 'স-জাত বিসর্গের তিনটি শব্দ, যথা, আশিঃ (আশিস্); উরঃ (উরস্);, বয়ঃ (বয়স্) বাংলায় 'আশিস্'; 'উরস্' 'বয়স'---এই মূলরূপেই হসন্ত বাদ দিয়াও ব্যবহৃত হয়। শব্দের শেষে এইগুলিতে হসন্ত ব্যবহার অনাবশ্যক।

(ই)-'শস্' ও 'তস্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য-বিসর্গ বাদ দিলে চলিবে না; যদিও কেহ কেহ বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী। বাংলা শব্দের অধিকাংশ অন্ত্য-ব্যঞ্জন অ-স্বরান্ত্য ধ্বনিরূপে উচ্চারিত না হওয়ায়, এই দুই ক্ষেত্রে অন্ত্য-বিসর্গ বাদ দিলে, শব্দগুলি হসন্তান্ত্য রূপে উচ্চারিত হইবে। আমরা এখন যেরূপ 'লোমশ' শব্দকে 'লোমশ্' রূপে, 'সবিশেষ' শব্দকে 'সবিশেষ্' রূপে বাংলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম অনুসারে 'হসন্ত' চিহ্ন না দিয়াও 'হসন্তান্ত্য' ধ্বনিরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি, তখন 'ক্রমশ' শব্দকে 'ক্রমশ্', 'প্রায়শ' শব্দকে 'প্রায়শ্' রূপে হসন্তান্ত্য করিয়া উচ্চারণ করিয়া ফেলিব অথবা উচ্চারণ করিতে প্রলুব্ধ হইব। সুতরাং, এই প্রত্যয় দুইটির বিসর্গকে রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়।

(ঠ) **'ইন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দ** :—তৎসম 'ইন্'-প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দগুলি প্রথমার এক বচনে 'ঈ' - কারান্ত হইয়া থাকে। বাংলায় এই প্রথমার এক বচনের রূপগুলিই গৃহীত হইয়াছে। যেমন,

মন্ত্রিন্---প্রঃ এক বচনে মন্ত্রী
যাত্রিন্--- ,, ,, যাত্রী
ধনিন্--- ,, ,, ধনী
হস্তিন্--- ,, ,, হস্তী
প্রাণিন্--- ,, ,, প্রাণী ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের নিয়ম অনুসারে এই জাতীয় শব্দ সমাস বদ্ধ হইলে শব্দগুলির মূলরূপের অন্ত্য-ন্' বাদ যায় এবং সমাসবদ্ধ পদগুলি এইরূপ দাঁড়ায়; যথা--- মন্ত্রিসভা; যাত্রিদল; ধনিগৃহ; ধনিবৃন্দ; হস্তিযূথ; প্রাণিতত্ত্ব; প্রাণিবিদ্যা; ইত্যাদি। কেহ কেহ এই নিয়ম মানিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বাংলায় গৃহীত রূপের সহিত সমাসবদ্ধ পদ তৈয়ার করিতে ইচ্ছুক। ইহাতে 'মন্ত্রিত্ব', 'মন্ত্রিসভা' ধনিষ্ঠ, ধনিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য শব্দের লিখায় বিভ্রান্তি ঘটাইবে। এই অভিধানের উদ্দেশ্য হইল, যাহা আছে বা বহুল পরিমাণে হইয়া গিয়াছে, তাহার স্বীকৃতি দান, নূতন করিয়া বিভ্রান্তি

ঘটানো নহে। সুতরাং, এই অভিধানে শব্দগুলির ব্যবহৃত রূপের সহিত বন্ধনীতে মূলরূপও দেখাইয়া দিতে হইবে। নতুবা, সমাসবদ্ধ নূতন পদ তৈয়ার করিতে গিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।

৩। বর্ণানুক্রম ঃ

এই, অভিধানে নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রম অনুসৃত হইবে। শব্দাদ্য, শব্দ মধ্য অথবা শব্দান্ত্য স্বর, ব্যঞ্জন, স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জন অথবা সংযুক্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ব্যবহারের বেলায়ও এই বর্ণানুক্রম অনুসৃত হইবে।

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ, ঁ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, (ড়), ঢ (ঢ়), ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য (য়) র, ল, ব, শ, ষ, স, হ

বাংলা-ভাষায় বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব আকৃতিতে ও উচ্চারণে এক বলিয়া, এই দুই 'ব'-য়ের শব্দগুলিকে একত্রে বর্গীয়-'ব' পর্যায়ে সাজানো হইবে। এতৎসত্ত্বেও, এই দুই 'ব'-কে চিনিয়া রাখা আবশ্যক। নতুবা, সন্ধিতে ও প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনে (যেমন, 'সম্বাদ,' না 'সংবাদ', 'বশংবদ' না 'বশম্বদ', 'বিদ্যান' না 'বিদ্বান' ইত্যাদি) বিস্তর গোলযোগ সৃষ্টি হইবে। এখন এই সব বিষয়ে একরূপ মতভেদ নাই বলিলেই চলে; লেখার ভেদও বিরল। দুই 'ব'-কে পৃথক করিয়া লইবার জন্য কয়েকটি সূত্র নিম্নে দেওয়া হইল ঃ---

(অ) সমস্ত অ-তৎসম শব্দের আদ্য-'ব' বর্গীয়।

(আ) ফলার, প্রত্যয়ের ও উপসর্গের 'ব' অন্তঃস্থ-ব।

(ই) যে-সমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য-'ব' এর পর 'ত'-বর্গীয় বর্ণের সংযুক্ত ধ্বনি (বর্ণ) এবং 'ধ', 'ভ', 'ল', 'হ'-ধ্বনি (বর্ণ) উচ্চারিত হয়, সে-সমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য-'ব' বর্গীয়। তবে, যে-সমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য-ব এর পর 'ধ', 'ন্দ', এবং 'ল'-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সে-সমস্ত শব্দের আদ্য-'ব' বিকল্পে অন্তঃস্থ-'ব' হইতে পারে।

(ঈ) তৎসম শব্দের (অবশ্য বাংলা-ভাষায় ব্যবহৃত) আদ্য-'ব'এর শতকরা প্রায় ৮০ আশীটিই অন্তঃস্থ -'ব'। অবশিষ্টগুলি হয় অন্তঃস্থ, না হয় বর্গীয়-'ব'। প্রকৃত পক্ষে, খাস বাংলা-ভাষায় দুই,-'ব' এক হইয়া গেলেও, অন্তঃস্থ-'ব' এখনও বহু শব্দে গা-ঢাকা দিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে;

যেমন—গোয়ামি<স্বামী; দো-আঁশলা<দ্বি-অংশ+ল+আ; দোতলা<দ্বি-স্তল+আ; বার<বাড়স<দ্বাদশ; ইত্যাদি।

এই অভিধানে পূর্বোক্ত কারণে দুই 'ব' এর পরিচয় সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতে হইবে। যে-তৎসম শব্দের পূর্বে কোন চিহ্ন থাকিবে না, সেগুলির আদ্য-'ব' অন্তঃস্থ, যে-তৎসম শব্দের পূর্বে তারকা * চিহ্ন থাকিবে, তাহাদের আদ্য-'ব' বর্গীয় এবং যে-তৎসম শব্দের পূর্বে ফুল-চিহ্ন † থাকিবে, তাহার আদ্য-'ব' বিকল্পে অন্তঃস্থ বলিয়া ধরিতে হইবে।

৪। শব্দ-বিন্যাস-ধারা :

(অ) এই অভিধানের শব্দ-বিন্যাস-ধারা সর্বাধুনিক পদ্ধতিনির্ভর হইবে। The Advanced Learner's Dictionary of Current English (Second Edition, 1963) by A. S. Hornby, E. V. Gatenby, H. Wakefield এই অভিধানের আদর্শ রূপে গণ্য হইবে। প্রধানতঃ শব্দ-নির্বাচন ও ইহাদের সহিত অন্য শব্দাদির যোগ দ্বারা অর্থের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, বাকরীতি প্রভৃতির বিন্যাস ব্যাপারে এই অভিধানের আদর্শ অনুসৃত হইবে।

(আ) একই শব্দের একাধিক শুদ্ধ বানান থাকিলে, শব্দটির প্রচলন যোগ্যতা অনুসারে 'যোগ্যতম', 'যোগ্যতর' ও 'যোগ্য' এই হিসাবে অভিধানে স্থান দিতে হইবে, যেমন---বিকাশ, বিকাস; ঊষা, উষা; হুলস্থূল, হুলুস্থুল; ফেল্‌ফেল্, ফ্যালফ্যাল, ফেলফেল; ভুসি, ভুষি; সেরফ, সেরেফ; লোকসান, নোকসান; বীথি, বীথিকা, বীথী; ইত্যাদি।

(ই) একই শব্দের সাধু ও চলিত রূপ থাকিলে, প্রথমে শব্দটির 'সাধুরূপ', তাহার পরেই 'চলিত রূপ' দেখাইতে হইবে। অবশ্য দুই শব্দের মাঝখানে একটি তীর্যক রেখা টানিয়া দিতে হইবে; যথা—কুয়া/কুয়ো; টিপা/টেপা; জাঁকাল/জাঁকালো; অবশ্য/অবিশ্যি; উঠান/উঠন; চিঁড়া, চিড়া/চিঁড়ে; বহেড়া/বয়ড়া; বাড়ই, বাড়ুই/বড়ুই; ইত্যাদি।

(ঈ) যে-সমস্ত তৎসম শব্দের ব্যাকরণ দুষ্ট রূপ অধিক প্রচলনের ফলে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিও বাংলা শব্দরূপে এই অভিধানে স্থান লাভ করিবে। তবে, এইগুলিকে ব্যাকরণ দুষ্ট (সংক্ষেপে

ব্যাঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়া, শুদ্ধ (সংক্ষেপে—শুঃ) রূপগুলি বন্ধনীর, মধ্যে দেখাইয়া দিতে হইবে ; যথা—

ইতিপূর্বে (ব্যাঃ){শুঃ ইতঃপূর্বে (ক্রিঃবিণ)}
উপরোক্ত (ব্যাঃ){শুঃ উপর্যুক্ত (বিণ)}
জাগ্রত (ব্যাঃ){শুঃ জাগ্রৎ (বিণ)} ইত্যাদি

(ঙ) বিদেশী শব্দের বেলায়, স্বাভাবিকতাপ্রাপ্ত (naturalised) বাংলা বানানই এই অভিধানে গৃহীত হইবে এবং বন্ধনীর মধ্যে তাহার মূলরূপ এবং বাংলায় ব্যবহৃত রূপ হইতে মূল ভাষায় শব্দটির ভিন্ন অর্থ থাকিলে সেই অর্থও লিখিয়া দেওয়া হইবে ; যথা :—

আস্তানা {বিঃ ফাঃ আস্‌তানহ্ (آستانہ)=গোবরাট ; দরবেশের বাসগৃহ বা আশ্রম}=আড্ডা, বাসস্থান, ফকিরের আস্তানা বা বসত বাটি।

গেঞ্জি {বিঃ ফঃ গ্রেন্‌সে (Guernsey)=ফ্রান্স দেশের পশ্চিমে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত গ্রেন্‌সে দ্বীপে তৈয়ারী জামা}=ফ্রক্ জাতীয় জামা।

লিচু {বিঃ চীঃ লিচি (Lichi)=এই নামের চীনা ফল}= জ্যৈষ্ঠমাসে পাকে এই নামের ফল।

(ঊ) সমবানানে লিখিত শব্দ একই মূলোদ্ভূত বা ভিন্ন মূলোদ্ভূত হইতে পারে। সমবানানের ভিন্ন মূলোদ্ভূত শব্দের অর্থও ভিন্ন হয়। একই মূলোদ্ভূত শব্দেরও বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে। সুতরাং, ভিন্ন মূলোদ্ভূত শব্দের সমবানান হইলে, শব্দটিকে মূল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া লিখিয়া শব্দের তলায় ১, ২, ৩, সংখ্যা বসাইতে হইবে ; যেমন—

কলাই$_{১}$, কড়াই—বিঃ মাস কলাই

কলাই$_{২}$—{বি. আ. কল‘ঈ (قلعی)=টিন গলাইয়া জোড়া বা প্রলেপ দেওয়া}=রাঙের প্রলেপ।

সমবানানের একই মূলোদ্ভূত শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিলে, শব্দটি লিখিয়া পরপর ১, ২, ৩ বসাইয়া অর্থও তাহার প্রয়োগ দেখাইতে হইবে, যেমন—

ধাঁধা---বিঃ দৃষ্টিভ্রম (চোখে ধাঁধা লাগা) ; ২। সন্দেহ, ধোঁকা (ধাঁধায় পড়া) ; ৩। জটিল সমস্যা (গোলক ধাঁধা)।

বানান এক হইলেও, বিভিন্ন মূলোদ্ভূত শব্দের প্রত্যেকটি কয়েক রকমের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে। তখন তাহাকে মূল হিসাবে ১, ২, ৩ করিয়া সাজাইয়া তাহার প্রত্যেকটির সহিত একাধিক অর্থ ও প্রয়োগ দিতে হইবে, যেমন---

জাত$_{১}$ (তৎ)--- (বিণ) উৎপন্ন, উদ্ভূত (নবজাত, সদ্যোজাত) ; ২। (বিঃ) সমূহ (দ্রব্যজাত) ; ৩। শিশুর জন্মহেতু পালনীয় সংস্কার (জাতকর্ম)।

জাত$_{২}$ (অর্ধ)--- (বিঃ) বর্ণ বা শ্রেণী (উচুঁ জাতের লোক) ; ২। প্রকার (নানা জাতের আম) ; (বিণ) জাতি বা শ্রেণীগত (জাত বোষ্টম)।

জাত$_{৩}$ (তদ)--- (বিণ) (জাত্য>জাত্ত>জাত) আসল (জাত কেউটে) ২। বিষধর (জাত সাপ)

জাত$_{৪}$ (বিঃ ফা)---(বিণ) (جات— বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ) রক্ষিত, সঞ্চিত (গোলাজাত)।

(ঋ) প্র, পরা, অপ, প্রতি, পরি, অধা, অজ, পাতি>পাত, রাম প্রভৃতি তৎসম বা বাংলা উপসর্গগুলির সাহায্যে গঠিত শব্দগুলি পৃথক্ পৃথক্ দিয়া সেগুলির অন্তর্গত যাবতীয় বাক্‌রীতি বা বিশিষ্টার্থক শব্দ সংশ্লিষ্ট শব্দের সহিত দিতে হইবে। এমন কি, উপসর্গগুলির কোন নিজস্ব অর্থ না থাকিলেও, এইগুলিকে পৃথক পৃথক স্থান দিয়া, ধাতু বা শব্দের সহিত যুক্ত করিয়া এইগুলি যত প্রকারের অর্থ প্রকাশ করে, তাহাও দেখানো আবশ্যক ; যথা----

প্রতি (অব্য)--- উপায় (প্রতিকার) ; ২। অভিমুখে (শিশুর প্রতি আকর্ষণ) ; ৩। সমস্ত (প্রতিক্ষণ) ; ৪। অনুরূপ (প্রতিমূর্তি) ; ৫। ঐশ্বরিক, স্বর্গীয় (প্রত্যাদেশ) ; ৬। পরিবর্ত (প্রতিনিধি) ; ৭। বিরোধ (প্রতিপক্ষ) ইত্যাদি

প্রতিকর্ম (বিঃ)--- ... ...*প্রসাধন, প্রতিকার

প্রতিকায় (বিঃ) ... ...*প্রতিমূর্তি

৫। শব্দের ব্যাকরণ :

এই অভিধানে যে-সমস্ত শব্দ গৃহীত হইবে, তাহার ব্যাকরণ-ব্যাখ্যা একটি বিশেষ সমস্যা। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত বাংলা একাডেমী হইতে প্রকাশিত অভিধানের সার্থকতা অনেকখানি কমিয়া যাইবে, বিশেষ করিয়া, পণ্ডিত-মহলে ও বিদেশে। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান নিম্নলিখিত উপায়ে করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি :---

(ক) তৎসম ও তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি ও বুৎপত্তি দেখাইয়া দিতে হইবে। উৎপত্তি নির্ণয়ের বেলায় শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ ধাতুর সহিত বন্ধনীর মধ্যে ধাতুর অর্থ, প্রত্যয়, বাচ্য ও লিঙ্গ আবশ্যক মত দেখাইতে হইবে। অর্থ দেওয়ার সময়, সর্বপ্রথমে মৌলিক অর্থটিই দেওয়া উচিত; তাহার পর গৌণ বা আলঙ্কারিক বা ব্যবহারিক অর্থ দেওয়া আবশ্যক। উদাহরণ---

অভিধান---(তৎ, বিঃ) যাহাতে শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে ধৃত হয়, অথবা যাহা দ্বারা শব্দের অর্থের সম্যক্ প্রকাশ হয়। [অভি (সম্যক্ অর্থে)+√ধা (ধারণ কিংবা পোষণ করা)+অধি. অথবা করণ (ণ) বাচ্যে] শব্দকোষ (dictionary)।

বিদ্যুদ্দীপ্ত--[(তৎ. বিণ) বিদ্যুৎ+দীপ্ত] বিজলির আলোকে আলোকিত; বিঃ বিদ্যুদ্দীপ্তি, বিদ্যুদ্দীপক।

বাউরী-----[(তদ্. বিণ.) তৎ. বাতুল>বাউল>বাউর (র=ল) +ঈ (বিণ)] পাগলের মত; উন্মত্ত ('কলাবনের বাউরী বাতাস'---জসীম); ২। নিম্নশ্রেণীর বাঙালী হিন্দু।

বাছনী-----[(দেশী) বাং √বাছ (বাছিয়া লওয়া)+অন (ণ.) =বাছন,+ঈ (বিণ)] যাহার দ্বারা বাছিয়া লওয়া হয় (বাছনী পরীক্ষা)।

(খ) যাবতীয় শব্দের শ্রেণী নির্দেশ করিতে হইবে,---অবশ্য অতি সংক্ষেপে। এই শ্রেণীগুলি এইরূপ:---তৎসম (তৎ.) অর্ধ-তৎসম (অর্ধ,) তদ্ভব (তদ্,), দেশী (দেশী), বিদেশী (বিদে,)।

দেশী শব্দ অজ্ঞাতমূল। সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তির কথা উঠে না। তবে, তাহাদের ব্যবহার অর্থের পরে-পরেই দেখাইয়া দিতে হইবে; যেমন---**কচি**---(দেশী) (বিণ) অতি কাঁচা (কচি ঘাস, কচি পাতা); ২। অল্পবয়স্ক (কচি ছেলে); ৩। নবীন (কচি বয়স)।

বিদেশী শব্দে; যে-ভাষা হইতে শব্দ গৃহীত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার নাম, তাহার বাংলা প্রতিবর্ণায়ন এবং সম্ভব হইলে মূল ভাষার লিপিতে লিখিত রূপ দিতে হইবে; যেমন---**কুস্তি**---[বিদে. ফা. কুশ্‌তী (کشتی) হাতাহাতি শক্তি পরীক্ষা] মল্লক্রীড়া (কুস্তিগীর, কুস্তিবাজ)।

(গ) অভিধানে ব্যবহৃত মূল শব্দের সংক্ষেপে পদ-পরিচয় দিতে হইবে। মূলশব্দ অন্য শব্দের সহিত সন্ধি বা সমাসবদ্ধ হইয়া নূতন শব্দ গঠন করিলে, তাহার বিশিষ্ট পদ-পরিচয় বা অর্থ থাকিলে, তাহাও অভিধানে ধরিতে হইবে; যেমন---**নাম**---বিঃ, ...কিন্তু বিণ---নামকরা (নামকরা লোক)।

পদগুলি এইরূপ হইবে :---

বিশেষ্য---বি.	কর্তৃবাচ্য---কৃ.
সর্বনাম---সর্ব.	কর্মবাচ্য---র্ম.
বিশেষণ---বিণ.	করণবাচ্য---ণ.
অব্যয়---অব্য.	সম্প্রদান স.
ক্রিয়া---ক্রি.	অপাদান বাচ্য---অপা.
ক্রিয়াবিশেষ--ক্রি.বিণ.	অনুসর্গ অব্যয়---অনু.
অসমাপিকা ক্রিয়া-অস.ক্রি.	পুংলিঙ্গ---পুং.
	স্ত্রীলিঙ্গ---স্ত্রী.
	ক্লীবলিঙ্গ---ক্লী.

(ঘ) বাংলা ক্রিয়াপদগুলিকে রাজশেখর বসু কুড়িটি 'গণ' বা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই কাজটি বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে রাজশেখর বসুর একটি অবিস্মরণীয় অবদান। আজ পর্যন্ত

বাংলা ক্রিয়াপদ এমনটি সুশৃঙ্খলভাবে অনুশীলিত হয় নাই। যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়া ইহাকে এই অভিধানের পরিশিষ্টে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অভিধানের মধ্যে ক্রিয়ার উল্লেখকালে ধাতুটি কোন্ 'গণীয়' উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে। ধাতুর সহিত বিভিন্ন 'তিঙ্' (ক্রিয়াবিভক্তি) যোগে যে ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়, তাহা অভিধানে না দেখাইয়া পরিশিষ্টের বরাত দিলেই চলিবে। এই বিষয়ে 'চলন্তিকাকে' সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে এদিক ওদিক করিতে গেলে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে। কারণ, ইহা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক।

(ঙ) বাংলা-ভাষায় 'বিশেষ্য' শব্দের 'বিশেষণ' এবং 'বিশেষণ' শব্দের 'বিশেষ্য' রূপ সহজে ঠিক করা যায় না। অন্ততঃ বেশীর ভাগ লোক ঠিক করিতে পারেন না। তাই, 'উৎকর্ষতা', 'প্রেমিকতা', 'সততা', 'সত্যতা', 'সৃজন' প্রভৃতি শব্দ 'উৎকর্ষ', 'প্রেম', 'সাধুতা', 'সত্তা', সৃষ্টি (সর্জন) প্রভৃতির স্থলে বলা বা লেখা হইতেছে। প্রধানতঃ, এই কারণেই অভিধানে বিশেষ্য শব্দের ব্যাখ্যার পর ইহার বিশেষণের সুপ্রচলিত রূপ দিতে হইবে। বিশেষণ শব্দের বেলায়ও 'বিশেষ্যরূপ' দেখাইতে হইবে।

উদাহরণ—

বিচিত্র---- (বিণ) বহু চিত্র বিশিষ্ট (বিচিত্র কাহিনী) ; ২। বিস্ময়কর (বিচিত্র লীলা) ; ৩ সুন্দর, সুরম্য (বিচিত্র দৃশ্য) ; স্ত্রী, বিচিত্রা ; (বি) বৈচিত্র্য, বিচিত্রতা, (বহুবর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে, এই অর্থে) বিণ---বিচিত্রিত, বৈচিত্র্যপূর্ণ।

শাস্ত্র- -- (বি.) ধর্মগ্রন্থ (মসলমান শাস্ত্র) ; ২। বিধান সম্বলিত গ্রন্থ (যোগশাস্ত্র) ; ৩। জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ (চিকিৎসা শাস্ত্র ; কবিরাজী শাস্ত্র ; গণিতশাস্ত্র ; রসায়ন শাস্ত্র) ; (বিণ)—শাস্ত্রী, শাস্ত্রকার, শাস্ত্রজ্ঞ। (বি) শাস্ত্রী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি (হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী)।

৬। উচ্চারণ সংকেত :

বাংলা-ভাষায় ফরাসী বা ইংরেজীর ন্যায় উচ্চারণ বিভ্রাট নাই। কারণ, বাংলা লিখন প্রণালী ও উচ্চারণ পদ্ধতি পরস্পর যথাসাধ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতৎসত্ত্বেও, বাংলা-ভাষায় শব্দমধ্য ও শব্দান্ত্য কিছু সংখ্যক সংযুক্ত বা বিযুক্ত বর্ণ ইহাদের মৌলিক ধ্বনির আংশিক বা পূর্ণ রূপান্তর ঘটাইয়া থাকে। বিদেশীয়দের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাংলা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদেরও কিছু সংখ্যক শব্দের উচ্চারণে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই, দেখা যায়,—'মহাত্মা' না 'মহাত্তাঁ'; 'ভব' না 'ভব্'; 'বাগ্মী' (বাগ্মী) না বাগ্গীঁ; 'বাগ্বিধি (বাগ্গিধি)' না 'বাগবিধি; 'উদ্বিগ্ন (উদ্বিগ্ন)' না 'উদ্দিগ্ন' ইত্যাদি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিশু, শিক্ষার্থী ও বিদেশী শিক্ষানবীসের উচ্চারণে গোলযোগ ঘটিতেছে। এতদ্ব্যতীত শব্দান্ত্য 'অ'-কারান্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বড় গোলমেলে; কোথাও এই 'অ'-স্বর উচ্চারিত, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুচ্চারিত : 'ফল, 'ফিক, 'ধন প্রভৃতি শব্দের অন্ত্যধ্বনি হসন্তযক্ত, অথচ 'তিত', 'মত', 'কাল', (বর্ণের অর্থে), 'এত' শব্দের অন্ত্যধ্বনি 'অ'-কারান্ত উচ্চারিত হয়; আর প্রশ্ন উঠে 'নিশ্চিত্' না 'নিশ্চিত', 'চিন্তিত্' না 'চিন্তিত', 'বীরদর্প' না বীর্দর্প'। এই সমস্ত বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য অভিধানে উচ্চারণ সংকেত দিতে হইবে। কিভাবে তাহা সহজে করা যায়, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) বাংলায় স্বরধ্বনির হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ শব্দের প্রথমে, মধ্যে বা অন্তে কোথাও সাধারণতঃ রক্ষিত হয় না। তবে, নানা কারণে ভাব প্রকাশের জন্য আবশ্যক হইলে দীর্ঘ ধ্বনি তো দীর্ঘ উচ্চারণ ধারণ করেই, এমন কি হ্রস্বধ্বনিও দীর্ঘ হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে। এইগুলি সাধারণতঃ নাটকের সংলাপেই চরিত্রের মুখে মঞ্চে ভাব ফুটাইয়া তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ অনাবশ্যক। সুতরাং শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরধ্বনি দেখাইবার জন্য কোন বিশিষ্ট চিহ্নের ব্যবহারও অনাবশ্যক।

(খ) শব্দান্ত্য 'অ'-স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জন-বর্ণগুলির 'অ'-স্বর বাংলায় সচরাচর অবলুপ্ত। তাই এইগুলির উচ্চারণ হসন্তান্ত্য। অতএব, 'অ'-স্বরাশ্রিত শব্দের অন্ত্য বর্ণে হসন্ত প্রয়োগ করিয়া এই 'অ স্বর লোপ অভিধানে দেখানোর প্রয়োজন নাই। এমন কি যে-সমস্ত তৎসম শব্দ হসন্তান্ত্য

সেইগুলিতেও বাংলায় হস্-চিহ্ন দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ, বাংলা উচ্চারণের নিয়মে এইগুলির হসন্ত্যন্ত্য উচ্চারণ স্বাভাবিকভাবেই পাওয়া যাইবে। উদাহরণ,—কল, কমল, শতদল, রজক, রস, উচিত, ছোঁয়াচ, ফসল, শরবত প্রভৃতি শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন বসাইয়া হসন্ত উচ্চারণ দেখাইতে হইবে না। স্বাভাবিকভাবেই এইগুলি হসন্তান্ত্য উচ্চারিত হয়। এমন কি, হসন্ত্যান্ত্য তৎসম শব্দ 'বয়স্', 'উরস্', 'সম্পৎ'='সম্পদ'', 'পরিষদ'='পরিষৎ', 'সুহৃদ'=সুহৃৎ প্রভৃতিতেও হসন্ত ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

(গ) বাংলা-ভাষায় যে-সমস্ত শব্দের 'অ'-স্বরাশ্রিত শেষ ব্যঞ্জন 'অ'কারান্ত উচ্চারিত হয়, তাহার উচ্চারণ সংকেত অভিধানে দিতে হইবে। শেষ ব্যঞ্জনের পরে একটি বড় আকারের ফুট্‌কি দিয়া শেষ ব্যঞ্জনটি যে অকারান্ত উচ্চারিত, তাহার নির্দেশ থাকিবে। যথা—

(i) 'অ' স্বরাশ্রিত শব্দান্ত্য 'হ' 'অ'-কারান্ত উচ্চারিত হয়, যেমন—
কহ, দহ, লৌহ, পড়হ, নিরীহ, বিগ্রহ।

(ii) সংযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত্য শব্দের 'অ' কারগ্রস্ত দ্বিতীয় ব্যঞ্জনের 'অ'-কার পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়, যেমন—

ভক্ত, নিশ্চেষ্ট, স্বায়ত্ত, পরাক্রান্ত, প্রসঙ্গ।

(iii) 'অ'-স্বরাশ্রিত শব্দান্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী বঞ্জন-বর্ণ 'ঋ'-কারযুক্ত হইলে, ঐ 'অ'-স্বরাশ্রিত শব্দান্ত্য ব্যঞ্জনের 'অ'-স্বর উচ্চারিত হয়, যেমন—

তৃণ., দৃঢ়., ধৃত., বৃষ., মৃগ., বিস্তৃত., সুদৃঢ়.।

(iv) শব্দান্ত্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্তঃস্থ-বর্ণ (য, র, ল, ব) ফলারূপে যুক্ত হইলে (এবং 'র'-বর্ণ 'রেফ',-রূপে যুক্ত হইলেও), অন্তঃস্থ বর্ণের 'অ' পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয়, যথা—

'্য'-ফলা—বৈদ্য., বৈশ্য., প্রাপ্য., প্রামাণ্য., সাফল্য.,

'্র'-ফলা—তীব্র., শীঘ্র., সহস্র., দরিদ্র., মিত্র.,

র্-রেফ্—খর্ব., সর্ব., বিদর্ভ., বিচূর্ণ.,

্ল-ফলা—মল্ল., অম্ল., প্রফুল্ল., বিশুক্ল.,

্ব-ফলা—বিল্ব., পক্ব., নূতনত্ব., তত্ত্ব., বিশেষত্ব.,

(v)-'ক্ত' প্রত্যয়ান্ত যাবতীয় তৎসম শব্দের 'ইৎ'-অন্তে রক্ষিত 'ত' 'অ'-কারান্ত উচ্চারিত হয় এবং তাহার অনুকরণে অন্যান্য শব্দান্তিক 'ত'-বর্ণ 'ক্ত'-প্রত্যয়ান্ত না হইয়াও 'অ'-কারান্ত উচ্চারিত হয়, যথা---

'ক্ত'-প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দ :---ভীত., চলিত., গৃহীত., জ্ঞাত., দ্যূত., রত., ধূমায়িত., দয়িত.,

তদনুকরণে অন্যান্য শব্দ :---অত., যত., তত., এত, মত., (অনুরূপ অর্থে), রাগত.

ব্যতিক্রম :---করিত্ (কর্ম্মা), চলিত্ (ভাষা)

(ঘ) সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনি শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে বসিতে পারে। এই ধ্বনিগুলির মধ্যে কতকগুলি উচ্চারণে মূলধ্বনি হারাইয়া ফেলে। অভিধানে তাহারও নির্দেশ দিতে হইবে। কতকগুলি সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ নিম্নে দেখানো গেল :

সংযুক্ত ধ্বনি	আদ্য উচ্চারণ	মধ্য উচ্চারণ ও অন্ত্য উচ্চারণ	উদাহরণ
ঙ্গ	নাই	ংগ	সঙ্গ (সংগ), আঙ্গিক (আংগিক)
ঙ্ক	নাই	ংক	কঙ্কণ (কংকণ), অঙ্ক (অংক),
ক্ষ	খ	ক্খ	ক্ষমা (খমা), ক্ষোভ (খোভ) অক্ষম (অক্খম), সমক্ষ (সমক্খ)
জ্ঞ	গ্যঁ	গ্গ্যঁ	জ্ঞান (গ্যাঁন), বিজ্ঞ (বিগগ্যঁ), বিজ্ঞান (বিগ্গ্যাঁন)
ঞ্চ	নাই	ন্চ	চঞ্চল (চন্চল্) বরঞ্চ (বরন্চ)
ঞ্ছ	নাই	ন্ছ	বাঞ্ছা (বান্ছা), লাঞ্ছনা (লান্ছনা)
ঞ্জ	নাই	ন্জ	রঞ্জিত (রন্জিত), গঞ্জনা (গন্জনা)
ঞ্ঝ	নাই	ন্ঝ	ঝঞ্ঝা (ঝন্ঝা)
হ্য	নাই	জ্ঝ	বাহ্য (বাজ্ঝ), উহ্য (উজ্ঝ) বাহ্যিক (বাজ্ঝিক্)

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিশিষ্ট উচ্চারণ কিংবা সংযুক্ত ধ্বনির উচ্চারণও যথাসম্ভব দেখানো হইবে।

বর্ণচোরা-শব্দ

পৃথিবীর নানা ভাষার ন্যায় বাংলা-ভাষায়ও কিছু-কিছু বর্ণচোরা শব্দ রহিয়াছে। 'বর্ণচোরা-শব্দ' বলিতে আমরা ঐ-সমস্ত শব্দকে বুঝাইতেছি, যে-সমস্ত শব্দকে সচরাচর 'অজ্ঞাতমূল শব্দ' নামে অভিহিত করা হয়; অথবা যে-সমস্ত শব্দ ভাষার কোন অজ্ঞাত পথে তাহাতে প্রবেশ করিয়া নীরবে ভাষার সহিত মিশিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, প্রচলিত অভিধানসমূহে এই সমস্ত শব্দকে 'অজ্ঞাতমূল-শব্দ' নতুবা 'দেশী-শব্দ' বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। আমার ধারণা সম্যক্ ও সুদীর্ঘ অনুসন্ধান কার্য চালাইলে এই শব্দগুলির একটা সুরাহা হইতে পারে। এমন দুই একটি শব্দ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল:—

(১) ভোগা=ফাঁকি

শব্দটির অর্থ 'প্রতারণা' বা 'ফাঁকি', যেমন—"ছেলের হাতের নাড়ু নয় যে **ভোগা** দিয়ে কে'ড়ে খাবে।" (বাংলা গান)। এই 'ভোগা দেওয়া' বাংলা-ভাষার একটা বাগ্বিধান (idiom) সম্মত কথা, যাহার অর্থ 'ফাঁকি দেওয়া'। চট্টগ্রাম জেলায় এই অর্থেই বাগ্বিধানটির বহুল প্রচলন আছে। অন্য জেলায়ও ইহার প্রচলন থাকার কথা। তবে, পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্র ইহা প্রচলিত। কারণ, উপর্যুদ্ধৃত বাংলা গানের চরণটি পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় রচিত ও প্রচলিত।

এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েক রকমের রূপ লইয়া শব্দটি আমাদের ভাষায় আজও চালু আছে। তন্মধ্যে আমি এই কয়টি লক্ষ্য করিয়াছি:—

শব্দের রূপ বা আকৃতি	জিলার নাম	ব্যবহার
ভগা	খুলনার পশ্চিমাংশ এবং বরিশাল	সে ভগা মারছে (প্রতারিত করছে)
ভগ্গা	বরিশাল ও বাখরগঞ্জ	পরে দ্রষ্টব্য বিশিষ্ট অর্থে বোগা মারা বা দেওয়া
বোগা	নানা স্থানে	প্রতারণা করার অর্থে

বরিশাল ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে, 'ভগ্‌গা' বা 'ভগা' শব্দটি যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতদঞ্চলে ইহা মাঠের শস্য-রক্ষার জন্য একটা সনাতন উপায়ের (device) নাম। মাঠের ফলন্ত শস্যে যাহাতে কাহারও কুদৃষ্টি (বা বদ-নজর) পড়িয়া শস্যের ক্ষতি সাধন করিতে না পারে, অধিকন্তু যাহাতে পশু-পক্ষী, বিশেষ করিয়া পক্ষী, মাঠের ফলন্ত শস্য নষ্ট করিতে আসিলে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়, তজ্জন্য মানবাকৃতির যে কৃত্রিম কুশ অথবা জীর্ণ বস্ত্র পুত্তলিকা একটি বংশ দণ্ডের বেশ উচেচ ঝুলাইয়া দিয়া শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে পুঁতিয়া রাখা হয়, তাহাকেই বরিশাল অঞ্চলে 'ভগ্‌গা' অথবা 'ভগা' বলা হইয়া থাকে।

বরিশাল অঞ্চলের ভয় দেখাইয়া মাঠ হইতে পক্ষী তাড়াইবার উপায়-টিকেই চট্টগ্রামে 'ধুক্কা' বা 'ধোক্কা' বলা হয়। 'ধুক্কা' উচচারণ-বিকৃতিতে 'ধোক্কা' একটি হিন্দী শব্দের বিকৃতি ; ইহার মৌলিক রূপ 'ধোকা' এবং হিন্দী 'ধোকা' উৎপন্ন হইয়াছে তৎসম 'ধূক' শব্দ হইতে। এই স্থানে হিন্দী বাগ্‌বিধি (idiom) সম্মত কথা 'ধোকা দেনা' বা 'ধোকা খানা' যথাক্রমে প্রতারিত করা' বা 'প্রতারিত হওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কথাও স্মর্তব্য। সুতরাং, চট্টগ্রামে ব্যবহৃত শব্দটি সোজা হিন্দী হইতে বিকৃত আকারে, অথচ একই অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ 'ভোগ্‌গা' বা 'ভগা' বস্তুটিকে বলা হয় 'কাক-তাড়ুয়া'। ফলন্ত শস্য ক্ষেত্রের উৎপাত স্বরূপ কাককে তাড়ায় বলিয়া, ইহার নাম যে "কাক-তাড়ুয়া', তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 'কাক-তাড়ুয়া' বস্তুটি কাক তাড়ায় প্রতারণার সাহায্যে ; কেননা কাকেরা মনে করে, ক্ষেত্রের মাঝখানে কাকগুলিকে তাড়াইবার জন্য নীরবে একটা জীবন্ত-মনুষ্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা আবার বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া উঠে বলিয়া কাক মনে করে লোকটি নিশ্চয় ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই শস্য খাওয়া চলিবে না। এমনভাবে প্রতারিত হইয়া কাক-গুলি ক্ষেত্র ত্যাগ করে। শস্য-ক্ষেত্রে 'কাক-তাড়ুয়া' ব্যবহার করার রীতি বিলাতেও ছিল এবং এখনও আছে। ইংরেজেরা ইহাকে 'Scare-crow' বলিয়া থাকেন। এইখানেও সেই প্রতারণার কথা স্মরণ করিতে হইবে। কি করিয়া আমাদের 'কাক তাড়ুয়া' পশ্চিম-মুলুকে গেল, অথবা তাঁহাদের 'Scarc-crow' আমাদের দেশে আসিল এবং মূল রীতিটা কি করিয়া

দুইটি মহাদেশে এইরূপে রহিয়া গেল, তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় নয় কি?

উক্ত আলোচনা হইতে এই বোধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, 'ভোগা, 'বোগা', 'ভগা', 'ভগগা' একই শব্দের বিভিন্নরূপ মাত্র। 'ধুক্কা' শব্দ হিন্দী 'ধোকা' <সং ধূক (Dhūka) হইতে আমাদের বুলিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং 'কাক তাড়ুয়া' আমরা নিজেদের ভাষায় কোন একটা বিশিষ্ট বস্তুর বর্ণনার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। শব্দগুলি যে কোন ভাষা হইতে আসুক বা উৎপন্ন হউক না কেন, সমস্তগুলির মধ্যে একটা বিষয়ে পুরাপুরি মিল রহিয়াছে এবং তাহা হইল, মানুষের বদ নজর ও পাখির অত্যাচার হইতে ফলন্ত ফসল রক্ষা করার উপায়রূপে শস্যক্ষেত্রে মানুষের কুশপুত্তলিকা স্থাপন। ইহাতে একদিকে যেমন মানুষের কুসংস্কারের পরিচয় আছে (যেমন, 'বদ্ নজর পড়া') অন্যদিক তেমন তাহার ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রকাশও (যেমন, কুশপুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া কাক বা পাখি তাড়াইবার প্রতারণা মূলক ব্যবস্থা) সুস্পষ্ট। এই জন্য 'ভোগা' শব্দে 'প্রতারণা'র অর্থই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এখন শব্দটির অর্থাৎ 'ভোগা', 'ভগ্গা' প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি বা মূল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাউক। ইহার উৎপত্তি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। '**ভজনার যোগ্য দেব**' অর্থে ঋগ্বেদের '**ভগ**'-শব্দ এবং আবেস্তার '**বঘ**'-শব্দ আর্য-ভাষায় দেখা যায়। শব্দ দুইটি অকারান্ত অর্থাৎ শব্দ দুইটির রূপ রোমান-হরফে প্রতিবর্ণায়িত (transliterated) হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে:— **Bhaga** এবং **Bagha**। লক্ষণীয় এই যে, প্রথম শব্দের প্রথম-বর্ণের মহাপ্রাণতা দ্বিতীয়-শব্দের দ্বিতীয়-বর্ণে আশ্রয় লইয়াছে। ফলে শব্দ দুইটি পৃথক বলিয়া মনে হইতেছে। নতুবা শব্দদ্বয় অর্থে ও ধ্বনিতে সমান ও এক।

আরও দেয়া যায়, খ্রীস্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'কস্সাইত' নামক এক জাতি 'বাবিলোন' নগরী জয় করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত 'বুগস-কুই' (Bugas Kui) নামক শিলালিপিতে এই জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই জাতি আর্য গোত্রীয় ছিলেন। কারণ, তাঁহারা যে-সমস্ত 'বুগস্' (Bugas) বা অলৌকিক শক্তির পূজা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে 'সুরিঅস্', (তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ

'সূর্য') ও 'মরুত্তস্' (তুল, সং, মরুৎ) প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এই 'বুগস্' শব্দের অর্থ 'পূজনীয় দেবতা'। এই দেবতার অর্থ যে 'দেবযোনি' বা ভয়ের আধার অপদেবতাও ছিল না, তাহাই বা কে বলিবে? যেরূপই হউক, 'বুগস্' শব্দের অর্থ হইল God, দেবতা বা অপ-দেবতা। ইহার সহিত বাংলা 'ভোগা', 'ভগা , 'ভগ্‌গা 'বোগা প্রভৃতি শব্দের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'বুগস্' (=বুগ, বোগ) শব্দটি প্রচলিত, ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ইউরোপের কয়েক স্থানে ইহার অনুরূপ শব্দ দেখা যাইতেছে, যেমন-- মধ্যযুগের ইংলণ্ডে Bugge='বুগেগ', 'বাগেগ' শব্দের অর্থ হইল 'a hobgoblin' বা 'জুজু' (=দুষ্টভূত) ঠিক এই অর্থে (অর্থাৎ 'জুজু' অর্থে) ইংলণ্ডের ওয়েল্‌শ প্রদেশে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা হইল 'বোগ্'=bwg। এতদ্ব্যতীত Bogy (Bogey) ও Bogus='বোগি' ও 'বোগাস্' অত্যন্ত পরিচিত ইংরেজী শব্দ। Bogy-এর অর্থ হইল,---Special object of dread ; the devil ; অর্থাৎ বিশিষ্ট ভয়ের বস্তু ; ভূত। এই প্রসঙ্গে স্কটিশ-ভাষায় ব্যবহৃত Bogle= Boggle='বোগ্ল্' শব্দের কথাও ভুলা যায় না। ইহার অর্থ a spectra, a goblin বা প্রেতযোনি। অধিকন্তু, শব্দটি গৌণ অর্থে Scare-crow বা ভয় দেখাইয়া পক্ষী প্রভৃতিকে তাড়াইবার জন্য শস্যক্ষেত্রে যে বিকট কুশ পুত্তলিকা স্থাপন করা হয়, তাহাও বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং, ইহার সহিত আমাদের দেশের 'কাক-তাড়ুয়া' বস্তুটির কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কথা কে জোর করিয়া বলিবে? ইউরোপের স্লাবনিক ভাষায় 'ঈশ্বর' অথবা 'দেবতা' অর্থে যে Bogu (বোগু) শব্দ প্রচলিত (এইখানে বুলগেরিয়ার কথাও চিন্তা করা যাইতে পারে), তাহার কথাও ভুলা উচিত নহে।

এখন দেখা যাইবে, আর্য **'ভগ'**, আবেস্তার (তাহাও আর্য) **'বঘ'**, স্লাবনিক **'বোগু'** মধ্যযুগীয় ইংরেজীর **'বাগেগ'**. বর্তমান ইংরেজীর **'বগী'**, স্কটল্যাণ্ডের **'বোগ্ল'**, ওয়েল্‌স্ প্রদেশের ?**বোগ্**' (bwg) প্রভৃতি শব্দ দেবতা বা প্রেতযোনি বুঝায়। 'কৃত্রিম', 'জাল', 'প্রতারণামূলক' অর্থে বহু ব্যবহৃত ইংরেজী 'বোগাস্' (bogus) শব্দটি এই ভাষার 'বগী' (bogey) শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত, অন্ততঃপক্ষে অর্থের দিক হইতে। কেননা, 'বগী' শব্দের অর্থ 'প্রেতযোনি'। প্রেতযোনির

অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ চিরকালই সন্দিহান। মানুষ তাহার দেখা পায়না, অথচ তাহাকে জুজুর মতো ভয় করে। জুজুর মতো অস্তিত্বহীন বলিয়াই 'বগী' শেষ পর্যন্ত 'বোগাস' { তুল. 'ভুগ'-(বান) } হইয়া ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিবে।

'কাক-তাড়ুয়া' অর্থে বরিশালের 'ভগ্‌গা' বা 'ভগা' এবং স্কটল্যাণ্ডের 'বোগ্ল্' একই অর্থে ব্যবহৃত ধারণার বহিঃপ্রকাশ, অর্থাৎ প্রেতযোনি বা দুষ্ট ভূতপ্রেতের নির্মিত মূর্তি। ইহা ক্ষেত্রে টাঙাইয়া দিলে, পক্ষী প্রভৃতি ভয় পাইয়া চলিয়া যাইবে,---এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই প্রাচীন, অতি প্রাচীন কালে যেমন শস্য-ক্ষেত্রে মানুষ 'কাক-তাড়ুয়া', 'ভগা', 'ধোক্কা' ইত্যাদি ব্যবহার করিত, এখনও তাহারা তাহা করিয়া থাকে। দেবতা, দেবযোনি প্রভৃতির নামে পশু পক্ষীকে প্রতারিত করাই উক্ত বস্তুগুলি উদ্ভাবনের মূল কারণ। সুতরাং, বাংলা 'ভোগা' শব্দের 'প্রতারণা'-অর্থে ব্যবহারে মূল আর্য ভাষার 'ভগ' বা 'দেবতা'।

(২) পেট=উদর

'পেট' শব্দটি এত সাধারণ যে, ইহার সম্বন্ধে কেহ কোনদিন চিন্তাও করে না। ইহা যে একটি অজ্ঞাত মূল শব্দ, তাহা বাংলা-ভাষার যে-কোন প্রামাণ্য অভিধান খুলিলেই দেখা যায়। অভিধান প্রণেতা পণ্ডিতগণ এই শব্দের মূল নির্ণয় করিতে গিয়া কতখানি হেস্তনেস্ত হইয়াছেন, তাহা বলিবার নয়। "**পেটে** খে'লে পিঠে সয়", "**পেটের** ধান্ধায় মানুষ ঘু'রে বেড়ায়"; "বড় বড় বানরের বড় বড় **পেট**। লঙ্কায় যাবার তরে মাথা করে হেঁট।"--- প্রভৃতিতে 'পেটের' ব্যবহার চমৎকার। কিন্তু, সং. সহোদর>সোদর, সোদ্দর প্রভৃতির স্থলে 'স-পেট' (-ভাই) কল্পানাতীত। এমন কি, 'মাসতুত' 'খুড়তুত', 'পিসতুত' প্রভৃতি যেমন গঠিত হয়, তেমন 'পেটতুত'--(ভাই) হয়না।

মানুষের শরীরের প্রায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম বাংলায় তদ্ভব শব্দে প্রকাশ করা হয়, যেমন---

মাথা<মস্তক; চোখ<চক্ষু; হাত<হস্ত
কনুই<কফোণি; বুক<বক্ষ; পিঠ<পৃষ্ঠ
মাজা<মধ্য ('মাজা' অর্থে 'কোমর' শব্দ ফারসী);
উরু (সংস্কৃত) (এই অর্থে 'রান শব্দ ফারসী);
পাঁজর<পঞ্জর; মাই<মাতৃ (স্তন্য); পা<পাদ
আঙুল<অঙ্গুলি; ঘাড়<ঘাট; পাছা<পশ্চাৎ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এতৎসত্ত্বেও, এই তালিকা হইতে **'পেট'** শব্দ বাদ পড়িয়াছে। কারণ, 'পেট' শব্দ তদ্ভব নহে। ইহা ফার্‌সীর ন্যায় কোন বিদেশী ভাষার শব্দ বলিয়াও এ-যাবৎ জানা যায় নাই। তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দেশী শব্দ অর্থাৎ কি না ইহা ভব্য, শালীন আর্য শব্দ নহে; বরং ইহা অনার্য শব্দ। বাংলাদেশে আর্য-বসতির পূর্বে যে-সমস্ত অনার্য বাস করিত, তাহারা 'দ্রাবিড়' বংশীয়। বর্তমানে তাহাদের বংশধরেরা দক্ষিণ ভারতে বাস করে ও তামিল, তেলেগু, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষা বলে। **'পেট'** এই সমস্ত ভাষার কোন একটির শব্দ কিনা খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।

দেখা যায়, তামিল-ভাষায় 'উদর' অর্থে 'পেট্টু' নামক একটি শব্দ আছে। এই তামিল 'পেট্টু' হইতে বাংলা 'পেট' শব্দ উদ্ভূত বলিয়া মনে করা যায়। অন্ততঃ অন্য শব্দ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই শব্দের মূল হিসাবে তামিল 'পেট্টু শব্দকে ধরিয়া লওয়া উচিত।

বাংলা-ভাষায় 'পেট' শব্দটির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও, শব্দটিকে ভব্য ও শালীন আর্যভাষা-প্রভাবিত বাংলা-ভাষায় একটি অশালীন শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় 'পেট শব্দের শালীন ব্যবহার উপরে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাষাকে সামাজিক দিক হইতে শালীন করিতে হইলে, আমরা তৎসম শব্দের ব্যবহার করি; যেমন,---তিনি এখন **'গর্ভবতী'** অথবা তিনি সম্প্রতি **'অন্তঃসত্ত্বা** হইয়াছেন; এই দুইটি বাক্যকে যদি এইভাবে ব্যবহার করি,---"তাঁহার **পেট** হইয়াছে", বাক্যটি কেমন খারাপ অর্থ দ্যোতিত করে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয়না। ইহার মূল কারণ হইল,---'পেট' শব্দটি অনার্য এবং সেই কারণে আর্যভাষা প্রভাবিত বাংলা-ভাষী মানুষ শব্দটিকে 'ইতর' বলিয়া মনে করে এবং ইতর-কাজের জন্য (যেমন, **পেটে** খেলে পিঠে সয়) ব্যবহার করে।

(৩) হোঁত্‌কা, হোঁৎকা

এ-যাবৎ 'হোঁত্‌কা' বা 'হোঁৎকা' শব্দটির উৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই। সমস্ত প্রচলিত বাংলা অভিধানে শব্দটিকে 'দেশী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দটি অনার্য-ভাষার বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। এই নির্দেশ সত্য নহে। সম্প্রতি আমাদের পুনরানুসন্ধানে শব্দটির প্রকৃত রূপ ধরা পড়িয়াছে এবং দেখা যাইতেছে, শব্দটি খাঁটি 'তদ্ভব'। তবে, ইহার বিবর্তনধারা কিঞ্চিৎ জটিল। নিম্নে ইহার জটিলতা উন্মোচিত হইল।

সংস্কৃত অর্থাৎ আর্যভাষায় 'ষণ্ড' বা 'ষাঁড়ের' অর্থে 'হন্তু' নামে একটি শব্দ আছে। এই 'হন্তু' শব্দ হইতেই বাংলা 'হোঁত্‌কা' বা 'হোঁৎকা' শব্দটি বিবর্তিত হইয়াছে; বিবর্তন-ধারা এইরূপ:---

সং. হন্তু=হন্‌তু>হঁউত্‌, হঁউৎ ('ন'-এর সংকোচনে চন্দ্রবিন্দু 'ঁ'-এর রূপ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 'ত'-আশ্রিত 'উ'-স্বরের পূর্বনিপাত ঘটিয়া শব্দটি রূপ গ্রহণ করিল 'হঁউৎ'-এর) > 'হোঁৎ'+বাংলা সদৃশার্থে-'কা'=হোঁৎকা অর্থাৎ ষাঁড়ের মতো পেটমোটা।

(৪) আছাড়

আমরা চা, পান, থামাক, সিগারেট, ফল-মূল, ভাত প্রভৃতি যেমন খাই, তেমন 'আছাড়'-ও খাই। 'আছাড় খাওয়া' বাংলায় একটি বাগ্বিধান-সম্মত উক্তি। অথচ, এই 'আছাড়' শব্দটিকে বাংলা অভিধানগুলিতে 'দেশী' বা অজ্ঞাত-মূল শব্দ নামে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, শব্দটি এমন প্রাত্যহিক যে, ইহার শ্রেণী নির্ণয় করাই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, শব্দটি বিদেশী এবং খাঁটি আরবী।

বাং. 'আছাড়' শব্দের 'ড়'-বর্ণটি ভাষাতাত্ত্বিককে প্রতারিত করার সম্ভাবনা অত্যধিক। বলাবাহুল্য, বাংলা-ভাষায়,—বিশেষ করিয়া, বাংলা-দেশের বাংলা-ভাষায় 'র'='ড়' বলিয়া ইহার প্রতি মাত্রারিক্ত জোর দেওয়া চলে না।

শব্দটি যে খাঁটি আরবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'আছাড়' আরবী عثر=আসঁর, যাহার অর্থ হইল 'পা ফস্‌কাইয়া পড়া', 'পা পিছলাইয়া পড়া'। ধ্বনিতে ও অর্থে উভয় শব্দ প্রায় এক। আরবী 'ث' ধ্বনির মূল উচ্চারণ 'থঁ', হইলেও, বাংলায় ث এবং س হয় 'স', না হয় 'ছ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। আলোচ্য শব্দ তাহার ব্যতিক্রম নহে।

(৫) বাথান=গো-মহিষাদির স্থান বা চারণক্ষেত্র

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর (?) জেলায় একটি স্থান আছে; ইহার নাম 'মহিষবাথান। গরু-মহিষাদির পালকেও 'বাথান' বলে। কোন-কোন অভিধান প্রণেতা ইহাকে সংস্কৃত (আর্য) 'বাসস্থান' হইতে বিবর্তিত 'তদ্ভব' শব্দ বলিয়া মনে করিয়াছেন। আসলে ইহা 'বিদেশী' শব্দ; ইহার মূল 'ৱতন (وطن) শব্দটি আরবী, যাহার অর্থ 'জন্মভূমি', 'বাসস্থান 'নিবাস'। বাংলায় আরবীর 'ওয়াও' (و=w=ৱ) বর্ণ 'ব'-বর্ণে পরিণত হয়; এখানেও হইয়াছে।

(৬) ব্যাদড়া=বেয়াড়া, দুষ্ট

ইহা 'দেশী' শব্দ নহে। ইহা খাঁটি 'তদ্ভব' শব্দ। ইহার বিবর্তন ধারা এইরূপ:—

ব্যাদড়া=সং. বি+আদর=ব্যাদর+বাং. ইয়া=ব্যাদরিয়া > ব্যাদইর্‌যা > ব্যাদরা > ব্যাদড়া (র=ড়)।

—